বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীকালিদাস রায়

—প্রাপ্তিস্থান—
দি বুক হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ কথাসাহিত্যরথী

শ্রীমান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রাতৃবরেষু

ভূমিকা

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস নয়। সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনাও নয়। ইহা বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে কতকগুলি আলোচনামূলক নিবন্ধের একত্র গুম্ফন। আমি ইহাতে অপ্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের শিখরগুলি স্পর্শ করিয়া গিয়াছি। নিবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত এবং বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত। তন্মধ্যে 'বঙ্গশ্রী' ও 'বর্ত্তমান' পত্রিকাতেই অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। বহুদিন পূর্ব্বে এইগ্রন্থের বঙ্কিমপ্রসঙ্গ ছদ্মনামে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হইয়া ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যৎসামান্যই এই খণ্ডে উপনিবদ্ধ হইল। অবশিষ্ট বক্তব্য দ্বিতীয় খণ্ডে থাকিবে। নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বাকি থাকিল, দ্বিতীয় খণ্ডে যাইবে। তাহা ছাড়া, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও শরৎচন্দ্র ইত্যাদি সম্বন্ধে এই খণ্ডে কিছুই বলা হয় নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড সত্বরই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। স্বাধীন বাংলায় আমরা বহু যন্ত্রের অধীন। তন্মধ্যে, মুদ্রাযন্ত্র একটি। তাহা ছাড়া, কাগজ-ওয়ালারা এখন মগজ-ওয়ালাদের প্রভু। কাজেই কতদিনে দ্বিতীয় খণ্ড ছাপাখানা হইতে দপ্তরীখানায় পৌছিতে পারিবে বলা শক্ত।

ছাত্রদের আগ্রহেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল—তাহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এ গ্রন্থ লিখিত হইল। তাহারা ছাড়া অন্য কেহ পড়িবে এ ভরসা অল্প। এক হিসাবে ইহা আমার অনধিকার চর্চ্চা। এ কাজ বঙ্গভাষার অধ্যাপকদের। আমি কবিতা লিখি—কবিতালেখক বলিয়াই আমার কিছু খ্যাতি আছে। কবিতার উৎস যদি যৌবনান্তে শুকাইয়া যায় অথচ লেখনীর মসীউৎস না শুকায় তাহা হইলে কবিরা সমালোচক হইয়া পড়েন। যৎসামান্য সাহিত্য আমি যাহা রচনা করিয়াছি তাহার জন্য যাঁহাদের কাছে ঋণী এই গ্রন্থে তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই আমার উদ্দেশ্য। উপভোগ্য যোগাইবার পালা শেষ করিয়া তাই উপভোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছি।

আমার পুত্র এবং এম-এ ক্লাসের ছাত্র শ্রীমান জয়দেব রায় বি-কম এই গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষতঃ প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করিয়াছে, প্রয়োজন না থাকিলেও এখানে উল্লেখ করিলাম। আমার পরম স্নেহাস্পদ সোদর-কল্প-সাহিত্যিক শ্রীমান্ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিদ্বজ্জন সমাদৃত বৃহত্তম উপন্যাস হাঁসলী বাঁকের উপকথা আমার নামে উৎসর্গ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমার যাহা সম্বল তাহাই তাঁহাকে দিলাম। মুকুতার বদলে শুকুতা হইলেও ইহা অগ্রজের স্নেহের দান। ইতি—

সন্ধ্যার কুলায়, টালিগঞ্জ
১লা বৈশাখ ১৩৫৬

শ্রীকালিদাস রায়

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়

প্রথম খণ্ড

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়

প্রারম্ভিকা

ইংরাজ শাসনের আগে বঙ্গভাষার প্রতি সংস্কৃত পণ্ডিতদের একটা অবজ্ঞা ছিল। তাঁহারা ত রীতিমত ফতোয়া দিয়াছিলেন—শাস্ত্রের কথা ভাষায় অর্থাৎ বঙ্গভাষায় লিখিলে রৌরব নরকে যাইতে হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ কিন্তু সে কথা কবিরা শোনেন নাই। ইংরাজ শাসনে ইংরাজী সাহিত্যের আস্বাদ পাইয়া—সেকালের ইংরাজি-শিক্ষিত লোকেরাও বঙ্গভাষাকে অবহেলা করিত। নিধুবাবুর বিখ্যাত গানটিতে এই অবহেলার চমৎকার প্রতিবাদ আছে। বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা? হ্রদনদে এত নীর কিবা বল চাতকীর ধারাজল বিনা তার মিটে কি পিয়াসা?” ঈশ্বরগুপ্ত বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য প্রভাকরে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার দুর্দ্দশা গুপ্ত-কবিকে কিরূপ ব্যথিত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার লিখিত এই কয় ছত্র পড়িলেই বুঝা যায়—

“হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ। দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা। কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা ॥
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা। বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা ॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে। কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে ॥”

শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও বাঙ্গালীকে তিনি বুঝাইয়া বলেন,—‘সম্প্রতি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ যত্ন করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের উচ্চ গৌরব কোন মতেই রক্ষা হইতে পারে না। অধুনা আমরা অন্য কোন বিষয়ের অধিক আন্দোলন না করিয়া দেশীয় মহাশয়দিগের কেবল দেশের ভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিতে অধিক অনুরোধ করিতেছি, কারণ, ভাষাই সকল বিষয়ের মূলাধার, ভাষা ভিন্ন কিছুই হয় না, আমরা শুদ্ধ ভাষার পরিচয়েই পরস্পর পরিচিত হইতেছি, সাংসারিক তাবৎ কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং এমত মহোপকারিণী যে জাতীয় ভাষা তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করাতে কিরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে, তাহা কি কেহই বিবেচনা করেন না?

আমাদিগের ভাষা অতি সুশ্রাব্য ও সুকোমল এবং মাধুর্য্য-রসে পরিপূরিত। এই ভাষার বাক্য দ্বারা ও লেখনী দ্বারা উত্তমরূপে নানা কৌশলে ও সংক্ষেপে মনের অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করা যায়, অতএব ইহার প্রতি বাবুদিগের এত আন্তরিক দ্বেষ হইল কেন? কেবল আপনারা দ্বেষ করিলেও হানি ছিল না, যাঁহারা মনের সহিত অনুরাগ করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়াও জ্ঞান করেন না। হায় কি আক্ষেপ। নব্য বেঙ্গাল বাবুসাহেবরা যে জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারা সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহারা দেশের ভাষার প্রতি কিরূপ যত্ন করেন, তাহা কি দেখিতে পান না? * * কয়েকজন যুবা ব্যক্তি এ বৎসর টাউনহলে অতিশয় সুবক্তৃতাপূর্ব্বক বড় বড় ইংরাজদিগকে হতগর্ব্ব করিয়াছেন, তাহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বাবুসাহেবরা যদি দেশস্থ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিবর্গের দুষ্প্রবৃত্তির নিমিত্ত বঙ্গভাষায় এইরূপ সুবক্তৃতা করিতে পারিতেন, তবে অস্মৎপক্ষে কি এক আশ্চর্য্য সুখের ব্যাপার হইত। ফলে তাহার চেষ্টা নাই, বাঙ্গালা দুইটি কথা এক করিয়া কহিতে হইলে মাথায় অমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

অতি সম্ভ্রান্ত কোন আত্মীয় ব্যক্তি যিনি ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত নহেন, অথচ জাতীয় ভাষায় অতি নিপুণ, তাঁহার সহিত কোনও নবীন বেঙ্গলের সাক্ষাৎ হইলে কথোপকথনকালীন শুনিতে বড় কৌতুক হয়। যথা,—'কেমন ভাই, বাড়ীর সকল মঙ্গল তো,'—'মশয়, আসুন, লাষ্ট নাইটে বড় ডেঞ্জারে পড়েছি, আঙ্কেলের কলেরা হয়েছে, পল্‌স্ বড উইক হোয়েছিল, আজ মর্ণিংয়ে ডাক্তার এসে অনেক রিকভার করেছে, এখন লাইফের হোপ্ হয়েছে।'—সে ভাল মানুষ—বাবুজির উত্তর শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না। ভ্যাভ্যা রামের ন্যায় অবাক হইয়া খাড়া থাকে। এইরূপ কত আছে, যাহা লিখিতে লেখনীর মুখে হাস্য আইসে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা বুঝিতে পারি একথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছেন যাঁহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করেন। যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করেন এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজিনবিস বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা করেন।"

গুপ্তকবির শিষ্যদলের মধ্যে দ্বারকানাথ অধিকারী সুধীরঞ্জন নামক কাব্যে বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজী ভাষার কথোপকথনে—বঙ্গভাষার মুখ দিয়া বঙ্গভাষার জন্য যে ওকালতি করিয়াছেন তাহাতে সেকালের মনোভাব বেশ ভাল করিয়াই বোঝা যায়।

স্বদেশীয় ভাষ শিখিতে উল্লাস—না হয় অন্তরে যার,
বিধাতার ভুলে মানবের কুলে জনম হয়েছে তার।

এই বলিয়া তিনি বিদ্বেষীদের গালাগালি দিয়াছেন।

ঢাকার কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র তাঁহার মিত্রপ্রকাশ নামে মাসিকপত্রে "মাতৃভাষা উপেক্ষিদলের প্রতি" বলিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় এক তীব্র প্রবন্ধ লেখেন। এই যুগে মাইকেল প্রথমে বিদ্বেষীদের দলেই ছিলেন—তাহার 'মাতৃভাষারূপখনি পূর্ণ মণিজালে'—এ সত্য নিজে

বুঝিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।— তিনি যে 'কমলকানন ত্যাগ করিয়া' (এতদিন ইংরাজি ভাষার উপাসনা করিয়া) শৈবালে কেলি' করিতেছিলেন—বীণাপাণির এই রাজহংসের মুখে একথা শুনিয়া অনেকেরই চৈতন্য হইয়া ছিল। ভূদেববাবুও মাতৃভাষার গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছিলেন। সেকালের বিদেশীয় শিক্ষায় পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষাকে অবহেলা করিয়া ইংরাজিতে যে সকল পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন—আজ সেগুলির কেহ নামও করে না।

সুখের বিষয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল বঙ্গভাষার দিকে মতিগতি ফিরাইয়াছিলেন—তাই ঈশ্বরচন্দ্র, রামনারায়ণ, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, রামগতি ইত্যাদি সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও ইংরাজি-শিক্ষিতগণের বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে নাই। বাঙ্গালা ভাষার পণ্ডিতী রূপ দেখিয়াই তাহারা আরও বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িলেন। এরূপ ক্ষেত্রে মাইকেলই বঙ্গভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার মত বিধর্ম্মী ইংরাজি শিক্ষায় বুবন্ধর সাহেব লোকও যখন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে লাগিলেন, তখন অনেকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইল। তারপর ব্রাহ্ম মনীষীদের হাতে বাঙ্গালা গদ্যের সহজ সরল এবং কোন কোন ইংরেজি-শিক্ষিতের হাতে তাহার লঘুতরল রূপ দেখিয়া ইংরাজি নবীশদের শ্রদ্ধা আরও আকৃষ্ট হইল। গোঁড়া হিন্দুসমাজকে আঘাত করিবার জন্য তাঁহাদেরও বাঙ্গালা লিখিবার ও পড়িবার প্রয়োজন হইল।

বাঙ্গালা গদ্য-রচনার সূত্রপাত—বাঙ্গালা দেশে গদ্য রচনার সূত্রপাতের সহিত নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলির সম্পর্ক আছে।

১। মিশনারিগণের ধর্ম্মপ্রচার। ২। তাহাদের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন। ৩। মিশনারিগণের এতদ্দেশীয় লোকের রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ। ৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা। ৫। ধর্ম্ম কলহ। ৬। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের বাণী-প্রচার। ৭। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের আক্রমণ ও ইউরোপীয় দার্শনিক মত প্রচার। ৮। রক্ষণশীল হিন্দুদের স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য চেষ্টা। ৯। ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা-প্রচার ও দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিবিধ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা। ১০। সমাজ সংস্কার ও ব্রাহ্ম মত প্রচার। ১১। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রচার।

পূর্ব্বে গদ্যে কোন পুস্তক রচিত হইত না। গদ্যে চিঠিপত্র, দলিলপত্র ইত্যাদিই লিখিত হইত। পুস্তকরচনায় গদ্যের প্রয়োজনও হয় নাই। কারণ, যে পয়ার ছন্দে চৈতন্য চরিত ও বৈষ্ণব সাধুসন্তদের জীবনী লেখা হইত, তাহা নামে পদ্য হইলেও একপ্রকার গদ্যই। তাহা ছাড়া, যে যুগে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সে যুগে পদ্য এমন কি গানের সাহায্য ছাড়া বক্তব্য প্রচার করাই সম্ভবপর ছিল না। পদ্যে লেখা চলে না এমন বিষয়বস্তুরও অভাব ছিল। তাই বলিয়া গদ্যভাষা যে ছিল না তাহা নয়। তাহা এমনি সহজ ও সরল ছিল যে অতি অল্পায়াসেই তাহাকে পয়ারে পরিণত করা যাইত। যে দেশে পদ্যের ভাষা এত সহজ সরল, সে দেশে গদ্যের ভাষা অন্যরূপ হইতে পারে না। মৌখিক গদ্যও বেশ সহজসরলই ছিল। আদালত সম্পর্কীয় ব্যাপারে

এ ভাষা (ভারতচন্দ্রের কথায়) ছিল 'যাবনী মিশাল'—অর্থাৎ—সে ভাষায় আরবি ফার্সি শব্দের প্রাধান্য ছিল, কেবল পণ্ডিত-সমাজে এ ভাষা ছিল সংস্কৃত-সমাস-সন্ধি-বহুল।

১৮শ শতাব্দীতে রচিত শূন্যপুরাণে গদ্য ভাষার নিদর্শন দেখা যায়। এই শতাব্দীতে কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দ্বারা অনূদিত হয়। এই গদ্য দুর্বোধ্য নয়। এই শতাব্দীতেই পোর্ত্তুগীজ রোম্যান ক্যাথলিক পাদরিরা বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহাদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। দোম এন্তোনিও নামে একজন বাঙ্গালী খৃষ্টান হইয়া পোর্ত্তুগীজ পাদরিদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারে যোগদান করেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাংলা গদ্যে পুস্তক রচনা করেন। পাদরিদের ভাষা ছিল চল্‌তি ভাষারই কাছাকাছি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হইল। তাহাদের জন্য বাংলা পুস্তক মুদ্রণেরও প্রয়োজন হইল। তাহার ফলে বাংলা হরফের সৃষ্টি। চার্লস্ উইলকিনস্ এই হরফের প্রবর্ত্তক আর পঞ্চানন কর্ম্মকার ইহার মিস্ত্রী। প্রথমেই ইংরাজি হইতে বাংলায় আইনগ্রন্থ অনূদিত হইল এবং হ্যালহেড সাহেব বাংলা ব্যাকরণ রচনা করিলেন। অশুদ্ধ হইলেও এই আইন গ্রন্থগুলির ভাষা দুর্বোধ্য নয়।

শ্রীরামপুরে যে মিশনারিদের আস্তানা ছিল, তাঁহারাই বাংলাগদ্যকে অনেকটা আগাইয়া দেন। ইঁহারা নিজেরাও বাংলা গদ্য লিখিতেন এবং মুন্সী-পণ্ডিতদের দ্বারাও বাংলা গদ্য লিখাইতেন। ইঁহাদের মুদ্রাযন্ত্র হইতেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত মার্জ্জিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের কেরি সাহেব নিজে দুইখানি গদ্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন এবং বাংলা ইংরাজি অভিধান রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

খৃষ্টান পাদরি টমাস ও কেরি বাংলা ভাষাচর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগ দেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারই ইঁহাদের বঙ্গভাষার অনুশীলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহারা প্রতাপাদিত্য চরিতের রচয়িতা রামরাম বসুর সাহায্যে যে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেন—তাহা আসল বাংলাই বটে। ভাষার নমুনা—"যদি তোমরা মনুষ্যের দিগের অপরাধ ক্ষমা করহ, তবে তোমারদিগের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যেরদিগের অপরাধ না ক্ষমহ, তবে তোমারদিগের পিতা তোমারদের অপরাধও ক্ষমা করিবেন না। অপর যখন তোমরা উপবাস কর, তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণবদন হইও না, কেন না তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাইবার কারণ আপনারদের মুখ বিকৃতি করে।"

কেরি নিজে সংস্কৃত ও দেশীয় অন্যান্য ভাষা যত্ন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বাংলাভাষায় চমৎকার ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। তবে তাঁহার রচনাবলীতে তাঁহার মুনশী রামরাম বসুর হাত কতটা আছে বলা যায় না। খৃষ্টীয় প্রার্থনার রূপ তিনি এইভাবে দিয়াছিলেন—

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদিগের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের অপরাধীর

দিগকে মাফ কৃবি সেই মত আমারদিগেব ঋণ মাফ কব। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইওনা, কিন্তু আমাবদিগকে আপদ হইতে পবিত্রাণ কব। কেন না সদা সর্ব্বক্ষণে রাজ্য, শক্তি ও গৌরব তোমাব। আমিন।"

কেবি চল্তি বাংলাব পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু তিনি বাংলার গদ্য ভাষাকে আববি, পাবশি ও গ্রাম্য শব্দ হইতে মুক্ত কবিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকবণ বচনা কবেন। বাংলা গদ্যেব প্রবর্ত্তনে কেরিব দান যথেষ্ট।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংবাজ সিভিলিযানদেব বাংলা শিক্ষাদানের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইলে বাংলা বিভাগেব ভাব লইলেন উইলিয়ম কেবি। তাঁহার সহকাবী হইলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাব, বামনাথ বাচস্পতি, বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, বামরাম বসু ইত্যাদি ৮ জন পণ্ডিত ব্যক্তি। ইঁহাদেব মধ্যে বামবাম বসু ছাডা অন্যান্য সকলের ভাষা সংস্কৃতানুগত হইলেও গুরুচণ্ডালিয়া দোষে দুষ্ট। মৃত্যুঞ্জয় ত সর্বজনবোধ্য ভাষাকে ব্যঙ্গ কবিয়া বলিয়াছেন—

"যেমন রূপালঙ্কাববতী সাধ্বী স্ত্রীব হৃদয়ার্থ বোদ্ধা সুচতুব পুরুষেবা দিগম্ববী অসতী নাবীব সন্দর্শনে পবাঙ্মুখ হ'ন তেমনি সালঙ্কাবা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষাব হৃদয়বোদ্ধা সৎপুরুষেবা নগ্ন উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পবাঙ্মুখ হযেন। (বেদান্তচন্দ্রিকাব উপসংহার)

তাবপব বাঙ্গালা গদ্য ভাষা বাঙ্গালাব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদেব হাতে পডিয়া অনুস্বাব বিসর্গ-হীন সংস্কৃত হইয়া উঠিল। গদ্যভাষাব এই রূপটি বাংলা দেশে কথক ঠাকুবদেব মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কথকগণ ভাষাকে কৃত্রিমতায তবঙ্গায়িত কবিয়া তাহাদেব বৃত্তিব উপযোগী একটা পৌবাণিক ভক্তিগাম্ভীর্য্যময় পবিবেষ্টনী সৃষ্টিব চেষ্ট কবিতেন। সেজন্য তাঁহাদেব একটা 'নব জলধব পটলী' ভাষাব প্রয়োজন হইত। * কথকঠাকুবদেব মুখেব ভাষার যে একটা হিল্লোলিত মাধুর্য্য ছিল, তাহা বাদ দিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব পণ্ডিতগণ ও মিশনাবিদেব নিযুক্ত পণ্ডিতগণ গদ্য ভাষাকে নীবস ও শব্দাডম্ববময় কবিয়া তুলিলেন।

রামরাম বসু ইনি বাজা প্রতাপাদিত্য চবিত্র ও লিপিমালা নামে দুইখানি পুস্তক লিখেন। প্রতাপাদিত্য চবিত্র প্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত মৌলিক গ্রন্থ। কিংবদন্তীব উপব প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাকে বঙ্গভাষাব প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

লিপিমালা পত্রাকাবে লিখিত কতকগুলি নিবন্ধ। অধিকাংশই পৌবাণিক। লিপিমালার ভূমিকায় বসু মহাশয যাহা বলিযাছেন—তাহাতে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ও ভাষার নিদর্শন দুইই মিলিবে। যথা—

"এক্ষণ এ স্থলেব অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েবা তাহাবা এদেশীয় চলনভাষা অবগত নহিলে বাজক্রিয়াক্ষম হইতে পাবেন না। ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখনকাব চলনভাষাও

* গোলোক চন্দ বিদ্যাবত্ন মহাশয অল্প সময়েব মধ্যে খেদ করুণা বীভৎস বাৎসল্য ইত্যাদি রস অবলীলাক্রমে উত্তম বাগ মান তালে যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেন তাহা শ্রবণ কবিলে শ্রোতৃমাত্রই মোহিত হইতেন। তিনি ভাগবতীয শ্লোকাদি অবলীলাক্রমে পাঠ ও তাহার মর্ম্মার্থ টীকা-সম্মত ব্যাখ্যা কবিতে পারেন।" (সংবাদ, প্রভাকর ৬।১।৪০)

লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমির যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা পুস্তক রচনা করা গেল।”

রামরাম বসু গদ্যভাষার আদর্শ আকৃতি দিয়াছিলেন—অবশ্য সংস্কৃত না জানার জন্য তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে তাঁহার ভাষায় সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের প্রাচুর্য্য নাই বরং আরবি ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে।

রাজীবলোচন—ইঁহার গদ্যপুস্তক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্। ইহা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকের নাম সংস্কৃত হইলেও ইহার ভাষা অতিরিক্ত পণ্ডিতী নয়। রামরাম বসুর ভাষার মত আরবি ফারসি শব্দের প্রাধান্যও ইহাতে নাই। লেখক সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলেও ভাষা সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ রাখিতে পারে নাই।

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী—সংস্কৃত শুকসপ্ততির ফারসী অনুবাদ তুতিনামা, তাহার হিন্দী অনুবাদ তোতা কহানী। তাহার বাংলা অনুবাদ করেন মুন্‌শী মহাশয় তোতা ইতিহাস নামে। ইঁহার ভাষাও ছিল রাজীবলোচনের পুস্তকের মত। তোতার কাহিনীটি ফারসী ও হিন্দীর মধ্য দিয়া আসিয়াছে। তাহার ফলে এই পুস্তকের ভাষায় অনেক ফারসী ও হিন্দী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। তথাপি ইঁহার ভাষাকে স্বাভাবিক ও প্রাঞ্জল বলিতে হইবে।*

হরপ্রসাদ রায়—ইনি বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষার বাংলা অনুবাদ করেন। ইঁহার ভাষা সংস্কৃতানুগ। কিন্তু দুর্বোধ নয়। ভাষার নিদর্শন—কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমান লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি। বীর এবং সুধী ও বিদ্বান আর পুরুষার্থ যুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত। (পুরুষ পরীক্ষার ভূমিকা)। যুগপৎ মানসিক উৎকর্ষ ও নাগর নাগরীদের হর্ষোৎপাদনের জন্য এই গ্রন্থ বিরচিত।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উইলিয়ম কেরির অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন—পরে ইনি জজপণ্ডিত হ'ন। ইনি বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি, বেদান্ত-চন্দ্রিকা ও প্রবোধ-চন্দ্রিকা এই কয়খানি পুস্তক রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয় হইতেই প্রকৃত পক্ষে অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ গদ্য ভাষার সূত্রপাত। ইঁহার রচনায় সকল প্রকার গদ্য-ভঙ্গীরই নিদর্শন আছে। ইঁহার হিতোপদেশের অনুবাদের ভাষা সংস্কৃতানুগ, এই ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার অগ্রদূত। এই যুগে হিতোপদেশের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, এক গোলোকনাথ শর্ম্মার অনুবাদ ছাড়া কোনটি মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলিকে বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের প্রথম ইতিহাস বলা

---

* কথক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্য শিবাবদের সহিত কলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া ব্যাঘ্র ও হস্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল রাত্রি হইলে সেই শিবারা শব্দ করিত সেই শব্দ শুনিয়া সরদার শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করিলেক।—তোতা ইতিহাসের ভাষার নিদর্শন।

যাইতে পারে। ইহাতে তিন প্রকার ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। একপ্রকার অতিরিক্ত সংস্কৃতানুগ, একপ্রকার গ্রাম্য ও বিদেশী শব্দের মিশ্রণে সহজপ্রাঞ্জল, আর একপ্রকার উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভাষা—বঙ্কিমের ভাষার অগ্রদূত তাহাকে বলিতে পারা যায়। প্রবোধ-চন্দ্রিকাতে এই তিন শ্রেণী ছাড়া চলিত মৌখিক রীতির কাছাকাছি রীতিরও নিদর্শন আছে। বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে ভাষারও তারতম্য ঘটিয়াছে। প্রাচীন বিষয় বা সংস্কৃত আবেষ্টনীর বিষয় লইয়া রচনা কালে এবং সংস্কৃত অনুবাদ স্থলে ভাষা সংস্কৃতানুগ হইয়াছে। যেখানে বিষয় বর্ত্তমান জগতের এবং যেখানে বর্ণনীয় বিষয় বাঙ্গালীর সাধারণ ঘরসংসারের, সেখানে ভাষা সরল প্রাঞ্জল। এ ভাষা যেন টেকচাঁদের ভাষার অগ্রদূত। বেদান্তচন্দ্রিকায় মৃত্যুঞ্জয় উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন—ইহার ভাষা তদনুরূপ। এ বিষয়ে তিনি রামমোহনের সহযোগী ছিলেন, যদিও পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুতে ছিলেন প্রতিযোগী। কেহ কেহ বলেন—এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ই অগ্রণী। বাংলা গদ্যের ক্রমোন্মেষে মৃত্যুঞ্জয়ের দান অপরিসীম। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধ-চন্দ্রিকাই বাংলা ভাষায় প্রথম সারগর্ভ গদ্য পুস্তক।

গোলোকনাথ শর্ম্মা—ইনি হিতোপদেশের অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থও শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। গোলোকনাথ ভাল সংস্কৃত জানিতেন না—সে জন্য অনুবাদ যথাযথ হয় নাই—ভাষাতেও যথেষ্ট অশুদ্ধি আছে। তবে তিনি স্থলে স্থলে সম্পূর্ণ চলতি বাংলাতেও অনুবাদ করিয়াছেন। কেবল ক্রিয়াপদগুলির রূপ চলতি নয়।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি সমাচার-চন্দ্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি প্রথমে রামমোহনের সংবাদকৌমুদী সম্পাদনে সহযোগিতা করিতেন—ধর্ম্মমত সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় ইনি সংবাদকৌমুদীর সঙ্গ ছাড়িয়া সমাচার-চন্দ্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার নববাবুবিলাস, কলিকাতা কমলালয় ইত্যাদি গদ্যে পদ্যে রচিত পুস্তকে সেকালের সর্ব্ববিধ আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। যাহারা সমাজের গ্লানি তাহাদের যেমন তিনি কশাঘাত করিয়াছেন—যাহারা সমাজ ভাঙ্গিতে চান তাঁহাদেরও তেমনি কশাঘাত করিয়াছেন। ভবানীচরণ হইতেই বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় কৌতুকরসরচনার প্রারম্ভ। ইহার ভাষা কৌতুকরসের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল না—কারণ ভাষায় প্রাঞ্জলতা ছিল না। ইনি লোকশিক্ষার জন্যও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

রামমোহন—এ যুগে বাংলা গদ্যভাষার অন্যতম প্রবর্ত্তক রামমোহন। রামমোহনের ভাষাও সংস্কৃতানুগ। একালের তুলনায় সংস্কৃতানুগ, কিন্তু সেকালের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় সহজ সরল। তাই গুপ্ত-কবি বলিয়াছিলেন—"দেওয়ানজি জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন। তাহাতে কোন বিচার বা বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত।" রামমোহন সাধ করিয়া ভাষাকে সংস্কৃতানুগ করেন নাই। আত্মমত-প্রচারের জন্য ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিত বিতর্ক করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ভাব-প্রকাশের ভাষা দার্শনিক তত্ত্বপ্রকাশের অনুকূল করিয়া লইতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, তিনি বেদান্ত, উপনিষদ্, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্র গ্রন্থের মর্ম্মকথা বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন, সেজন্য অনেক পারিভাষিক শব্দ তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

যুক্তি-পরম্পরার সাহায্যে তত্ত্বমূলক নিবন্ধ-রচনার পদ্ধতির তিনিই প্রধান প্রবর্ত্তক। তিনি সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টাই করেন নাই। সাহিত্যের ভাষাও তাঁহার লেখনীতে আসিত না। গুপ্ত কবি তাই বলিয়াছেন "তাঁহার লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" রামমোহন সাহিত্যিক নহেন, তিনি এদেশের জ্ঞানগুরু, স্বাধীন চিন্তাধারার ভগীরথ। তিনি বেদান্ত-দর্শনের বঙ্গানুবাদ করেন। রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য। রামমোহন বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে ইনি জ্ঞানাঞ্জন নামে সাময়িক পত্রপ্রকাশ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মকে সমর্থন করিতে থাকেন। নিম্নলিখিত অংশ হইতে রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রয়াস ও তাঁহাদের ভাষার চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের জ্ঞানাঞ্জন (২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬)। "জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থের ভূমিকা।—

"সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নানা শাস্ত্রানুশীলনপর ধর্ম্মাবর্ম্মাবৃত সাধুজন সমাজেষু।

এই ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধারণ লোককর্ত্তৃক মান্য অথচ অনুষ্ঠেয় অনাদি পুরুষ-পরম্পরা প্রচলিত যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহা আধুনিক সামান্য কর্ত্তৃক অমান্য হইয়াছে ইত্যবধানে রামনারায়ণপুর মথুরা-নিবাসী শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য বঙ্গপুরে থাকিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহার্য্য বিবিধোপনিষৎ স্মৃতিপুরাণেতিহাস ন্যায়-বেদান্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসা ও তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণ সমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পারসী ও আরবী প্রভৃতি বহুবিধ লৌকিক প্রমাণ ও সদ্‌যুক্তি দ্বারা কুতর্কের উচ্ছেদ পূর্ব্বক বেদপ্রণীত লোকপরম্পরাকর্ত্তৃক চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুর্বর্ণ ধর্ম্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় হৃদয়ঙ্গম করণ এবং এই ধর্ম্ম বিষয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোকসমূহ কর্ত্তৃক যে সকল বিতণ্ডাবাদ সংঘটনের সম্ভাবনা তাহাও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ, দৃষ্টান্ত ও সদ্‌যুক্তি দ্বারা নিবারকরণার্থে জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ইহা সদ্বিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাব্য ও আদরণীয় ইত্যবধানে যাথার্থ্যান্বেষণে কৃতযত্ন শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদারের বিশেষ আনুকূল্যদ্বারা বহু যত্নে মুদ্রাঙ্কিত করা গেল। যে সকল মহাশয়েরা বৈদিক ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত আছেন তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করেন তাঁহারদিগের অবশ্যই সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে। এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ মহাশয়েরা নীর-পরিত্যাগী ক্ষীরভক্ষী হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্যই সারগ্রাহী হইবেন কিমধিকমিতি। শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কারস্য।"

এই ভাষায় একটিও আরবি ফারশী শব্দ নাই। মিশনারি সাহেবদের ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় যে গদ্য ভাষা রচিত হইয়াছিল তাহাতে আরবি ফারশী ও চলতি শব্দ বর্জ্জিত হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়রা ভাষাকে একেবারে যবনদোষমুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাধাকান্ত দেব এই পণ্ডিতমণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য পাঠ্য পুস্তকগুলি এই ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। সেকালের অনেকগুলি সংবাদপত্রের ভাষাও এইরূপ কিংবা ইহার চেয়েও বেশি সংস্কৃতানুগ ছিল। ছাত্রদের পঠন পাঠনের জন্য সংস্কৃত ও ইংরাজি হইতে বহু গ্রন্থের অনুবাদ হয় এইরূপ ভাষায়। অক্ষয়কুমার এই ভাষারই

অনুসরণ করিয়া একটা বিশিষ্ট রূপ দান করেন এবং বিদ্যাসাগর এই ভাষাকেই মধুরায়িত ও হিল্লোলিত করেন।:

দেশে নবপ্রবর্তিত ইংরাজী সভ্যতা ও শিক্ষা স্বাধীনচেতা রামমোহনের মনে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জাগাইল—কোরানপাঠে এই অশ্রদ্ধা ঘনীভূত হইল। তিনি দেখিলেন, তখনকার হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের নামে কতকগুলি অনাচার, অবিচার, কুসংস্কার ও পৌরোহিত্য-শাসন চলিতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ঐ পুরোহিতদের ও সমাজ-নায়কদের কোন পরিচয়ই নাই—স্বার্থ সাধনের জন্য বিরচিত কতকগুলি অপশাস্ত্রের ও কুলাচার, লোকাচারের দোহাই দিয়া জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ-সমাজ সমগ্র জাতিকে বিপথে পরিচালিত করিতেছে—সময় ও সুযোগ বুঝিয়া খৃষ্টান পাদরিরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি ও গলদগুলি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে এবং খৃষ্টান সমাজের দলপুষ্টি করিতেছে। এইসময় রামমোহন প্রচার করিলেন—প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম লোকাচার, কুলাচার, স্মৃতি, পুরাণ, পুরোহিত-দর্পণ, পঞ্জিকা, কুলজি, ঘটক-কারিকা ইত্যাদির মধ্যেও নাই—মঠ-মন্দির, ঢাক-ঢোল, পূজা-পার্ব্বণ, হোমবলি, আহার বিহার, দান দক্ষিণা ইত্যাদির মধ্যেও নাই। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের কথা আছে—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা ও তন্ত্রে। তিনি বেদান্ত-সম্মত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন—দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিকতাকে অপধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহা ছাড়া, তিনি সমাজ-সংস্কার-সাধনে ও ইংরাজী-শিক্ষা-প্রচারে সরকারকে সহায়তা করিলেন।

এইভাবে যুগান্তর আনয়ন করিতে তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল—তাহার ফলে বাঙ্গালাভাষায় গদ্য-সাহিত্যের ও প্রবন্ধ-রচনার সৃষ্টি। * বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা ইত্যাদি পরাবিদ্যামূলক আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বাঙ্গালী জাতির পরিচয়ই ছিল না। রামমোহনই এই সকলের সহিত বাঙ্গালীজাতির পরিচয় ঘটান। ফলে, রামমোহনের সময় হইতে বঙ্গভাষায় ঐসকল শাস্ত্রের অনুবাদ, অনুশীলন ও বিচারের সূত্রপাত হইল এবং ঐসকল শাস্ত্র হইতে বঙ্গভাষা পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। রামমোহনের বেদান্তানুরাগের প্রতিবাদের জন্য মৃত্যুঞ্জয় বেদান্তচন্দ্রিকা রচনা করেন। তাহার উত্তরে রামমোহন লেখেন 'ভট্টাচার্য্যের

---

* তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী পাঠকের সহিত গদ্য ভাষার পরিচয়ই ছিল না। সেজন্য বেদান্ত দর্শনের অনুবাদের প্রারম্ভে তিনি গদ্য ভাষা বুঝিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।—"এ-ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না। ইহা প্রত্যেক কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এ' দুয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে, তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়া অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু একবাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না।"

২

সহিত বিচার।' রামমোহনের মতবাদের প্রতিবাদে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন লেখেন 'পাষণ্ড পীড়ন'। ইহার উত্তরে রামমোহন লেখেন—'পথ্য-প্রদান'। রামমোহনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য 'জ্ঞানাঞ্জন' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

রামমোহন যে অভিযানের সূত্রপাত করিয়া গেলেন—তাহা রামমোহনের মৃত্যুর সহিত লোপ পায় নাই—ক্রমেই বাড়িতে থাকিল। গোঁড়া হিন্দুরাও নিশ্চেষ্ট থাকিল না—তাহারাও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অবতীর্ণ হইল। ফলে, বাদপ্রতিবাদে বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যের পুষ্টি হইতে লাগিল। সভা-সমিতির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, বক্তৃতা ও বিতণ্ডাকলার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, বাদানুবাদে দেশ মুখরিত হইল, নূতন নূতন সাময়িকপত্রের সৃষ্টি হইতে লাগিল, বহু প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও পুস্তক রচিত হইতে লাগিল। শ্রীরামপুরের পাদরিদের সঙ্গে বাদানুবাদের জন্য রামমোহন ব্রাহ্মণ-সেবধি ও সংবাদ-কৌমুদী নামে সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন।

সাময়িক পত্র—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই (১৮০১ খৃঃ অব্দে) শ্রীরামপুরের মিশনারীরা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। ইহার সহিত বাংলা গদ্য রচনার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। মুখে মুখে বক্তব্য প্রচার করিতে হইত বলিয়া সকল বিষয়ই পদ্যে রচিত হইত। মুখে মুখে চালানোর পক্ষে ছন্দোবদ্ধ রচনাই প্রকৃষ্ট। গ্রন্থাকারে প্রচারের সুবিধা হওয়ায় গদ্য-রচনার পদ্ধতি প্রবল হইয়া উঠিল। মুদ্রাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনের পর কেবল গ্রন্থ নয়, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি গদ্য ভাষার পুষ্টি ও প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। প্রথমে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রবর্ত্তিত মাসিক দিগ্‌দর্শন (১৮১৪) পরে সাপ্তাহিক সমাচারদর্পণ প্রকাশিত হয়। 'দিগ্‌দর্শন' কেবল গদ্য ভাষার পুষ্টিতে নয়, শিক্ষাবিস্তারেও সহায়তা করিয়াছিল। সমাচার-দর্পণে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার গদ্য পদ্য দুইই লিখিতেন।* এই দুই পত্রিকার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ও দেশীয় সমাজধর্ম্মের সমর্থনের জন্য—তারপর রামমোহনের সংবাদকৌমুদী প্রকাশিত হয়। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সমাচারচন্দ্রিকা। তারপর প্রকাশিত হয় বঙ্গদূত। ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামমোহন ও তাঁহার ঠাকুরবাড়ীর বন্ধুগণ। ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ-প্রভাকর —এ যুগের প্রসিদ্ধ পত্রিকা, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের ভাস্কর। তত্ত্ববোধিনী, সংবাদপূর্ণ-চন্দ্রোদয়, সংবাদ-দিবাকর, সংবাদ-সৌদামিনী, জ্ঞানান্বেষণ, তিমির-নাশক, সংবাদসুধাংশু, হরকরা ইত্যাদি পরে প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকার নামকরণ হইতে বুঝা যায়, দেশে জ্ঞানপ্রচারই সেকালের কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদের সাময়িকপত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। দেশ অজ্ঞান অন্ধকারে পরিপূর্ণ তাই প্রভাকর, ভাস্কর, চন্দ্র, সৌদামিনী ইত্যাদির আলোকের খুব প্রয়োজন ছিল। এইগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই প্রচলিত ছিল। গদ্যভাষার পুষ্টিসাধনে যে পত্রিকাগুলি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল তন্মধ্যে সংবাদ প্রভাকর ও তত্ত্ববোধিনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারপর পরবর্ত্তী যুগে বঙ্গদর্শন, প্রচার,

* মিশনারি কেরি সাহেবই জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা পরিমার্জ্জিত করাইয়া সর্ব্বপ্রথম কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত করেন। এই দুই গ্রন্থও গদ্যসাহিত্য রচনায় সহায়তা করিয়াছিল।

নবজীবন, বান্ধব, জন্মভূমি, সাধনা ইত্যাদি মাসিক পত্রগুলি গদ্য সাহিত্যের বাহন হইয়াছিল।

হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল'—রামমোহনের পর একটি নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আবির্ভাব হইল। ইহারা হিন্দু কলেজের ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের ছাত্রবৃন্দ। ইহারা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। এই বিষয়ে ব্রাহ্মদের সঙ্গে ইহাদের মতভেদ ছিল না। কিন্তু ইহারা ব্রাহ্মদের মত সংস্কার সাধন করিতে চাহেন নাই—ইহারা ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন অর্থাৎ ইহাদের প্রয়াস Reformative নয়, Iconoclastic. ইহারা হিন্দু-সমাজকে অমান্য করিতে গিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্য, চিন্তা, আহারবিহার, বেশভূষা ইত্যাদি সমস্তকেই অমান্য করিতে সুরু করিলেন। শুধু তাহাই নয়। ইহারা ঈশ্বর, পরলোক, লৌকিক পাপপুণ্য, নৈতিক আদর্শ সমস্তকেই অস্বীকার করিতে লাগিলেন —সর্ব্ববিষয়ে ইহাদের আদর্শ হইল জড়বাদী ইউরোপ। ভারতবর্ষের সমস্তই ইহাদের কাছে হেয় ও বর্জ্জনীয় হইয়া পড়িল। ইহাদের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মদিগকেই যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল।

সাহিত্যে ব্রাহ্মপ্রভাব—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদলের সেনাপতি হইলেন। ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহার মারফতে নাস্তিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিলেন। এই পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইত্যাদি তৎকালের একেশ্বরবাদী আস্তিকের দল লেখনী ধারণ করিলেন। তাহার ফলে বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যের পুষ্টি হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মসমাজ,—গোঁড়া হিন্দুসমাজ ও হিন্দু কলেজের বিদ্রোহিসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমন্বয় (Synthesis) আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বিদেশী সভ্যতা ও স্বদেশী সভ্যতারও Synthesis এই ব্রাহ্মসভ্যতা। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ বিদ্রোহিদলের অনেককে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারিয়াছিল। কেবল হিন্দু কলেজের বিদ্রোহিদল নয়,— সেকালে Locke, Hume, Bentham, Comte, Spencer ইত্যাদির দর্শনতত্ত্বের পুস্তক পড়িয়া হিন্দুসমাজের অনেকেই Agnostic, Sceptic, Positivist কিংবা Atheist হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম প্রভাবে তাঁহারা Reformed Hindus নামে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলে ব্রাহ্ম হ'ন নাই বটে—কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের সব কথা নির্বিচারে মানিয়া লইতে পারেন নাই—যতটুকু যুক্তিবাদ ও সত্যাদর্শের দ্বারা পরীক্ষিত ও সমর্থিত ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রাচ্যবিদ্যার সহিত পাশ্চাত্যবিদ্যার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া ইহাদিগকে আত্মবিবেকের তুষ্টিসাধন করিতে হইয়াছিল। তাহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবন্ধ-সাহিত্যের পুষ্টি। ব্রাহ্ম প্রভাবে এদেশে স্বাধীন চিন্তার সহিত শাস্ত্রশাসিত হিন্দুসভ্যতার সমন্বয়সাধন (Synthesis) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গদ্য সাহিত্যে তাহারই প্রভাব সম্পাতিত হইয়াছে।

এদেশে নৈতিক আদর্শ অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল—রুচিও ছিল অত্যন্ত

জঘন্য। ব্রাহ্মপ্রভাব সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বের সাহিত্য তাহার সাক্ষী। ব্রাহ্মপ্রভাবে সাহিত্যে সুরুচি ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবির দল ও হাফআখড়াই দলের পৃষ্ঠপোষক ঈশ্বরগুপ্তও ব্রাহ্ম প্রভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাগবতী কবিতাগুলি ব্রাহ্ম ভজনালয়েরই প্রতিধ্বনি। ব্রাহ্মাচার্য্যগণের মতই তিনি কাব্যে নীতি প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম প্রভাবেই তাঁহার অধিকাংশ বঙ্গব্যঙ্গ-রচনা সুরুচির মর্য্যাদা অতিক্রম করে নাই। রামনারায়ণ পণ্ডিত যে নাটকে কৌলীন্য ও হিন্দু সমাজের অন্যান্য অনাচারগুলি লইয়া ব্যঙ্গ করিতে পারিয়াছিলেন—তাহাও ব্রাহ্ম প্রভাবে। তাঁহার অনুবর্ত্তী দীনবন্ধু সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাটকাবলিতে নৈতিক আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ব্রাহ্ম প্রভাবেই তিনি নৈতিক আদর্শের মর্য্যাদা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর ব্রাহ্ম প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগরের রচনা পাঠ করিয়া কেহ যদি তাঁহাকে ব্রাহ্ম মনে করেন—তবে বিস্ময়ের কারণ দেখি না। তাঁহার রচনায় দেবদেবীর নামগন্ধও নাই, পৌত্তলিকতার কোন প্রভাব নাই—তিনি পূর্ণমাত্রায় নবপ্রবর্ত্তিত সুরুচি ও সুনীতির মর্য্যাদা তিনি ব্রাহ্ম লেখকদের মতই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশধর ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কিন্তু রচনায় কোথাও ব্রাহ্মণ্য অভিমান নাই। বহু বিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন অভিযান চালাইয়া গিয়াছেন এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি কি ভাবে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা সকলেই জানেন। যে দুর্নিবার স্বাধীন চিন্তার ধারা তাঁহার রচনায় দৃষ্ট হয়—তাহা তিনি হিন্দুসমাজ হইতে পান নাই, হিন্দু কলেজ হইতেও পান নাই, পাইয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজ হইতে।

অক্ষয় কুমার দত্ত ত নিজেই ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল আদর্শ তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কোন নিবন্ধে তিনি ব্রাহ্মজন-সুলভ ভাগবতী ভক্তি ও একেশ্বরবাদের মহিমা প্রচার করিতে ভুলেন নাই। বৈজ্ঞানিক নিবন্ধরচনাকালে তিনি মুহুর্ম্মুহুঃ ভগবানের মহিমার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—পাছে পাঠক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে অন্ধ জড় শক্তির অভিব্যক্তি মনে করিয়া সংশয়বাদী বা জড়বাদী হইয়া উঠে।

রাজনারায়ণ বসু নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন—তাঁহার রচনা ব্রাহ্ম প্রভাবে যে পুষ্ট হইবে—তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তাঁহার বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন গোঁড়া হিন্দুর সন্তান। কিন্তু তিনিও ব্রাহ্ম প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাকে Reformed Hindu-র দলে ধরা যাইতে পারে। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কোন আচার আচরণকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারেন নাই—প্রত্যেকটিকে তিনি সার্ব্বজনীন সত্য ও যুক্তিবাদের কষ্‌টি পাথরে কষিয়া তবে গ্রহণীয় মনে করিয়াছেন। হিন্দুকলেজের ছাত্র ভূদেব বাবু যে যুগে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন—সে যুগে শাস্ত্রের বা লোকাচারের প্রতি অন্ধ ভক্তির দোহাই দিয়া বাণী প্রচারের যুগ নয়। হিন্দুয়ানীর প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস তাঁহার রচনার কোথাও নাই। ব্রাহ্ম প্রভাবই তাঁহার লেখনীকে সংযত ও যুক্তিমূলক পরম্পরার পথে পরিচালিত

করিয়াছিল। যুক্তির দ্বারা আমাদের সমাজের যে অঙ্গ বা আচারকে বাঁচাইতে পারিয়াছেন, তিনি প্রবন্ধে তাহারই বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। *

প্রবন্ধ সাহিত্যের সূত্রপাত—স্বদেশের ও বিদেশের ধর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার কথা দেশের লোককে বুঝাইবার জন্য ও বিদেশী ও স্বদেশী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বাদানুবাদের জন্য এ দেশে প্রথম গদ্য-প্রবন্ধ-রচনার সূত্রপাত। পদ্যের অনুক্রম আবেগাত্মক, গদ্যের অনুক্রম যুক্তি-মূলক। যখনই যুক্তি-পরম্পরার প্রয়োগে বক্তব্যকে দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়োজন হইয়াছে তখনই গদ্য প্রবন্ধের প্রয়োজন হইয়াছে। রামমোহন হইতেই গদ্য প্রবন্ধের সূত্রপাত।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা ছিল ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। এই পত্রিকার মধ্য দিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব-মূলক গদ্য প্রবন্ধের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিদেশী শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব বস্তু পাইলাম বিজ্ঞানে। তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত দেশের লোককে সর্ব্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি লিখিলেন। তিনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্ম ছিলেন। বিজ্ঞানের সহিত চিরকালই ভাগবত বিশ্বাসের বিরোধ আছে। বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার ধর্ম্মভাবের একটা সংঘর্ষ ঘটিল। অক্ষয়কুমার তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতে ভাগবত মহিমার সহিত বৈজ্ঞানিক রহস্যের সমন্বয় ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্য-বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতার সহিত পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব কৌশল ও মহিমার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। জড় জগতের রহস্য-ভেদের জ্ঞান লাভ করিয়া পাছে লোকের ভগবানে বিশ্বাস টলিয়া যায়, সেজন্য তাঁহার উদ্বেগের সীমা ছিল না।

ক্রমে বিদেশী শিক্ষা দীক্ষা, সভ্যতা ও জীবনাদর্শ এদেশে গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইল। তখন বিদেশীয় ভাব চিন্তা ও তাহাদের অভিঘাতে সদ্যোজাত ভাব-চিন্তাগুলি দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য ইংরাজী শিক্ষিত মনীষিগণ গদ্য প্রবন্ধ রচনা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য লোকশিক্ষক। ইঁহাদের স্বতই একটা ধারণা জন্মিল—দেশবাসীর প্রতি ইঁহাদের একটা কর্ত্তব্য আছে, অন্ততঃ লোকশিক্ষাবিষয়ে ইঁহাদের একটা দায়িত্ব আছে। বাঙ্গালী জীবন নানা কুসংস্কারে ও ভ্রান্ত ধারণায় আবিল হইয়া আছে, তাহার চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। বাঙ্গালীকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও সত্যের সন্ধান করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু ভ্রান্ত, যাহা কিছু যুগজীর্ণ, যাহা কিছু সংশয়াত্মক, তাহা দূর করিবার জন্য ইঁহারা শৃঙ্খলিত যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রবন্ধে বিলাতী তত্ত্বজ্ঞগণের যুক্তি ও

* বঙ্কিমচন্দ্রও ব্রাহ্ম প্রভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। গীতার বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতেই পাইযাছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি উপন্যাসে রুচি ও নীতির উচ্চাদর্শ ও ভাষার শুচিতা রক্ষা করিয়াছেন—তাহা ব্রাহ্মপ্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি যে স্বাধীন চিন্তা, সত্যদৃষ্টি, সূক্ষ্মবিচার শক্তি, আবেগোচ্ছ্বাস-সংবরণ, যুক্তি-মূলক ক্রম ইত্যাদির পরিচয় দিয়াছেন,—তাহাতে ব্রাহ্মপ্রভাবই সূচিত হয়। তিনিও ছিলেন Reformed Hindu দলের একজন। ব্রাহ্ম প্রভাবেই তিনি Ethicsকে Logicএর দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন এবং উপকথা ও অলৌকিক কাহিনীর বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ঐতিহাসিক বেদিকার উপর শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

স্বাধীর দোহাই যতটা দিয়াছেন—আমাদের শাস্ত্রকারগণের নজীর ততটা ব্যবহার করেন নাই। বিদেশী তত্ত্বজ্ঞগণের নজীর, সাক্ষ্য ও যুক্তিতে ইহাদের প্রবন্ধ সমাকীর্ণ। বিদেশী তত্ত্বজ্ঞগণের প্রতি দেশের শিক্ষিত লোকের শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। প্রাচীন ভারতের ভাবচিন্তাগুলিকেও ইহারা যুক্তিমূলক শৃঙ্খলায় ব্যক্ত করিয়া জাতীয় গৌরব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও চেষ্টা একেবারে করেন নাই তাহা নয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থরাশি মন্থন করিয়া ইহারা স্বমতের সমর্থন খুঁজিয়াছেন।

দেশে বিদেশী সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা প্রচারিত হইল, স্কুলকলেজ স্থাপিত হইল, দেশের লোকের জ্ঞান-পিপাসা বাড়িতে লাগিল, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাও বাড়িতে লাগিল, জাতীয়তাবোধ প্রবুদ্ধ হইল, জনমত-গঠনের প্রয়োজন হইল, রসবিচার ও সমালোচনার প্রথা প্রবর্তিত হইল।

এই সকল কারণে ছাত্রশিক্ষা, লোকশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনাব প্রয়োজন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন কবি—সেজন্য তাঁহার প্রবন্ধে অনেকটা গদ্য পদ্যের সমন্বয় হইয়াছিল। প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারাব প্রচাব তাঁহাব প্রভাকর হইতেই—এই ধারা বিদ্যাসাগব বঙ্কিমের রচনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই ধারা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন।

ব্রাহ্ম-ধর্মমত সম্পূর্ণ বুদ্ধিশৃঙ্খলা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে হৃদয়াবেগেব স্থান নাই—ইহা জ্ঞানমার্গ-মূলক বৈদান্তিক ধর্ম্ম। ফলে, এই ধর্ম মূলতই গদ্যাত্মক। ব্রাহ্মধর্ম্মেব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে গদ্যের প্রসার বাড়িতে থাকে। বিদেশী শিক্ষাও শৃঙ্খলিত চিন্তাব উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদেশী শিক্ষার ফলে দেশে চিন্তাশৃঙ্খলা প্রবুদ্ধ হইল। এই চিন্তাশৃঙ্খলা ও ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিমূলক বুদ্ধিশ্রী দেশে সমাজ-সংস্কারের স্পৃহা জাগাইয়া তুলিল। এই স্পৃহা এক দিকে যেমন নাট্যসাহিত্যে রূপ লাভ করিল, অন্যদিকে তেমনি প্রবন্ধ-রচনায় প্রবুদ্ধ হইল। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকব পত্রিকাতে সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ বচিত হইতে লাগিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন, দেশের অশিক্ষা মোচন ও বহু বিবাহ নিরোধের জন্য যুক্তিমূলক প্রবন্ধ রচনা করিতে বাধ্য হইলেন।

এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ধাক্কাটা ছিল বড়ই সাংঘাতিক। প্রথম যাঁহাবা ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিলেন, তাঁহারা বিশেষতঃ হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম, সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনকে ঘৃণা করিতে শিখিলেন—তাঁহাদেব অনেকে ঈশ্বব মানিতেন না—কেহ বা খৃষ্টান হইলেন—কেহ বা মেম বিয়ে করিলেন। যিনি খুব শান্ত শিষ্ট লোক তিনি হইলেন ব্রাহ্ম। ইঁহারা গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানকে সভ্যতার অঙ্গ মনে করিতেন—কোন প্রকার নীতির বন্ধনে থাকাকে কাপুরুষতা মনে করিতেন।*

পক্ষান্তরে ইঁহারা শিক্ষিত, প্রতিভাবান্, স্বাধীনচেতা ও গতানুগতিকতার বিরোধী ছিলেন।

* ইঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই দীনবন্ধু সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ চরিত্র অঙ্কন করেন। রাজনারায়ণবাবু সেকাল ও একাল নামক পুস্তকে, যোগেন্দ্র বসু মাইকেলের জীবন চরিতে ও শিবনাথ শাস্ত্রী রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন-চরিতে ঐ সকল প্রতিভাশালী উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের কথা লিখিয়াছেন।

ইঁহাদের দ্বারাও বঙ্গ সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকেই ঘৃণা করিতেন। ইঁহারা যাহা কিছু লিখিতেন—তাহা ইংরাজীতেই। ভূদেববাবু ইঁহাদের দলে মিশেন নাই—বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তাহার ফলে বঙ্গভাষা তাঁহার সাহায্যে উপকৃত হইয়াছে। মাইকেল এই দলেরই একজন পাণ্ডা। আমরা মাইকেলকে হারাইয়াছিলাম—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সুমতি হইল, তাই তিনি "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" ইত্যাদি স্বীকার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মত প্রতিভা কাহারও ছিল না সত্য, কিন্তু ভূদেবের মত প্রতিভা অনেকেরই ছিল। তাঁহারা বঙ্গভাষাকে ঘৃণা না করিলে বঙ্গ সাহিত্যের যথেষ্ট লাভ হইতে পারিত। ইঁহারা সাময়িকপত্রে যে নিবন্ধগুলি লিখিতেন সেগুলি বাংলায় লিখিলে দেশের প্রবন্ধ-সাহিত্য যথেষ্টরূপ সমৃদ্ধ হইতে পারিত।

যাঁহারা এই সময়ে বঙ্গদেশের সমাজ ধর্ম্ম ও গতানুগতিক লোকযাত্রার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'ন—তাঁহারা সকলেই হিন্দুকলেজের ডিরোজিওর শিষ্য ও তাঁহার Academic Association এর সভ্য। ইঁহারা সকলেই সংস্কারমুক্ত চিত্তে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেন এবং সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন। সত্যই ইঁহাদের উপাস্য ছিল—সত্যই ছিল ইঁহাদের ব্রহ্ম। ইঁহাদের মধ্যে এক প্যারীচাঁদ মিত্র ছাড়া অন্য কেহ প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টিতে মন দেন নাই। ইঁহাদের অধিকাংশ রচনা ছিল ইংরাজীতে। রচনা অপেক্ষা রসনার উপর ইঁহাদের আধিপত্য বেশী ছিল। বক্তৃতার মধ্য দিয়াই ইঁহারা ইঁহাদের অধিকাংশ বক্তব্য প্রকাশ করিতেন। সাহিত্যরচনা না করিলেও ইঁহাদিগকে বঙ্গভাষাতেও কিছু কিছু লিখিতে হইয়াছিল। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বার্থসংগ্রহ নামে একটি মহাকোষ রচনা করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক জ্ঞানান্বেষণ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাহার অর্দ্ধাংশ বঙ্গভাষায় রচিত হইত। শিবচন্দ্র দেব শিশুপালন ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান (প্রেততত্ত্বের পুস্তক) নামে দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। তারাচাঁদ, টেকচাঁদ ও রামগোপাল ঘোষের উৎসাহে যে Bengal Spectator প্রকাশিত হইত তাহার অর্দ্ধাংশও বাঙ্গালার রচিত হইত। রাধানাথ সিকদার প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় 'মাসিকপত্র' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল—খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ বিষয়ের আলোচনা। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রবর্ত্তিত ভাষাকে ইঁহারা অস্বাভাবিক বাঙ্গালা বলিয়া মনে করিতেন। এ ভাষা বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা নয়—ইহাতে বাঙ্গালীর অন্তরের কথা প্রকাশিত হইতে পারে না—ইহাই ছিল ইঁহাদের বিশ্বাস। সাহিত্যসৃষ্টিই ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না—ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালার নিজস্ব জাতীয় ভাষার প্রতিষ্ঠা। প্যারীচাঁদ মিত্র—কেবল এই ভাষায় দাবি পেশ করিয়াই তুষ্ট হন নাই। তিনি এই ভাষায় একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে হরিনাথ মজুমদার মহাশয় বিজয় বসন্ত নামে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন—তাহা সংস্কৃতানুগ অস্বাভাবিক ভাষায় রচিত। উহাকে খাঁটী বাঙ্গালার উপন্যাস বলা যায় না।

ভাষার ক্ষেত্রে যুগান্তর—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা শিক্ষকদের কোন কোন পুস্তক হইতেই চলতি ভাষার একটা ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়া আসিতেছিল। চলতি ভাষায়

পুরা একখানি বই লেখার সাহস কাহারো হয় নাই। আলালের ঘরের দুলাল হইতেই বঙ্গভাষার নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম পেঁচার নকসা এই ভাষার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আলালী ভাষার তুলনায় এ ভাষা গ্রাম্যতাদুষ্ট।

আজকাল বিদ্যাসাগরী ভাষা আর চলে না। সে কালেও ঐ ভাষাকে ইংরাজি শিক্ষিত দল ও অল্পশিক্ষিত দল আদর্শ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া ল'ন নাই। সেকালেব অনেক সাময়িকপত্রে বিদ্যাসাগরী ভাষা লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ চলিত এবং শিক্ষিত সমাজেও ঐ ভাষা লইয়া হাস্য-পরিহাস চলিত। আলালী ভাষা ঐ ভাষাব সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ ভাষায় ঘরসংসাবেব ও লৌকিক জীবনের কথার অনায়াস প্রকাশ সম্ভব হইত—কিন্তু উচ্চস্তবের চিন্তা, অতীত ভারতের কথা বা দেশবিদেশেব কথা প্রকাশ কবা সম্ভব হইত না। সেজন্য ঐ ভাষাও সাহিত্যে চলিল না। তখন দুই শ্রেণীর মধ্যে একটা সন্ধি হইল। এই সন্ধি হইয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাসেব ভাষায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে বিদ্যাসাগবী ভাষাতেই উপন্যাস বচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন—পবে বুঝিতে পাবিলেন—এ ভাষা প্রবন্ধে ববং চলিতে পাবে—কথা-সাহিত্যে চলে না। তখন তিনি বিদ্যাসাগবী ও আলালী ভাষাব একটা সমন্বয় ঘটাইয়া ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে আলালী ভাষাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাষা নয়। ইহাব জন্ম পণ্ডিতী ভাষাব প্রতিক্রিয়ায়। পণ্ডিতী ভাষাব বিপরীত বৃত্তক্রান্তি দেখাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া টেকচাঁদ সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত ঢঙ, সংস্কৃত আবহাওয়া সর্বপ্রযত্নে বর্জ্জন কবিযাছিলেন এবং জোর কবিযা গ্রাম্য, আরবী, ফাবসী, অপ্রচলিত দেশী শব্দ সকল খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহিব করিয়া পুস্তকে স্থান দান করিয়াছেন। এ যেন হবিজন উদ্ধারেব পর্ব্ব। এ যেন গোঁড়ামিব প্রতিশোধ লওয়াব জন্য চামারচণ্ডাল সবারই গলায় পৈতা পরাইয়া দেওযা। এই বিদ্রোহেব ভাষা সাহিত্যেব স্বাভাবিক ভাষা নয়। সেজন্য দুই ExtremeএB একটা Golden Mean এব বা একটা সামঞ্জস্য বা Synthesis এর প্রয়োজন হইয়াছিল। বঙ্কিম এই কার্য্যটি কবেন। যাঁহারা শান্ত সংযত প্রকৃতির লেখক—গোঁড়ামি বা ভাঁড়ামি দুইই যাঁহাদের চরিত্রেব অঙ্গীভূত ছিল না—তাঁহারা, যেমন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র ও রাজনাবায়ণ বসু ইত্যাদি মনীষীরা স্বাভাবিক ভাষাতেই লিখিতেন।

ঈশ্বর গুপ্ত—তৎকালীন বঙ্গ-সাহিত্যে যখন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র যুবকমাত্র; সেই সময় হইতে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'প্রভাকবে' কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বব গুপ্ত কতক অংশে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, অক্ষয়দত্ত, রঙ্গলাল, মনোমোহন বসু, দ্বাবকানাথ প্রভৃতির সাহিত্যগুরু। 'প্রভাকরে' সেই সময়ে কবিতার মধ্য দিয়া তরুণ লেখকদিগেব বাগ্‌যুদ্ধ ও বসকলহ হইত, তাহাকে সকলে 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ' বলিতেন।

"ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। কোন বিষয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল না, তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ভিন্ন আর কোনও ভাষা জানিতেন না; এবং তাঁহার মতও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও কুসংস্কারাপন্ন ছিল। তথাপি বিংশ বৎসরের অধিককাল ব্যাপিয়া তিনিই

বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক ছিলেন। ব্যঙ্গ ও রহস্যপূর্ণ কবিতা রচনায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ; এবং এই গুণেই তিনি কি কবি, কি সম্পাদক, উভয় রূপেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।"—বাঙ্গালা সাহিত্য—বঙ্কিমচন্দ্র।

গুপ্ত কবির গদ্য রচনায় শব্দের ঘটা ও অনুপ্রাস যমকের ছটাই ছিল খুব—বক্তব্যের সারবত্তা বা অর্থগৌরবের অভাব ছিল। পল্লববাহুল্যে পুষ্প যেন প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সেজন্য গদ্য রচয়িতা বলিয়া গুপ্ত কবির কোন খ্যাতি নাই। যদিও তিনি গদ্যে পদ্যে সব্যসাচী ছিলেন। উভয় ধারাতেই তিনি সেকালের লেখকদের শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর—বিদ্যাসাগরকে ঠিক সাহিত্যস্রষ্টা বলা যায় না। ইনি ছিলেন অদ্বিতীয় ভাষাশিল্পী ও শিক্ষাব্রতী। তিনি বাংলা গদ্য ভাষাকে যে অবস্থায় পাইয়াছিলেন, তাহাতে ব্যাকরণের দিক হইতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, বাক্য-গঠন ও পদবিন্যাসের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না এবং বাক্যে কোন সৌষ্ঠব ছিল না। তাহা ছাড়া সন্ধি-সমাস-ঘন বাক্যের মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য শব্দ ও আরবি পারসি শব্দের মিশ্রণ ছিল। বাক্যগুলি গাঢবন্ধ ছিল না—তাহার মধ্যে ওজন-বোধেরও পরিচয় ছিল না।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ব্যাকরণকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়াছেন, বাংলার নিজস্ব বিভক্তিগুলির ইংরাজি ছেদগুলির সুনিয়মিত প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার হাতে বাংলা গদ্য একটি স্বচ্ছন্দ, সৌষ্ঠবময় ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিল। তিনি বাক্যের সর্ব্বাংশে একটা সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও সৌষম্য সৃষ্টি করেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবল মাত্র জনতার দ্বারা নয়। জনতা নিজেকেই খণ্ডিত ও প্রতিহত করিতে থাকে। তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছিলেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাব-প্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যে নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন।"

বঙ্কিম প্রথম জীবনে বিদ্যাসাগরী রচনা-শৈলী অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এইরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং পরেও কেহ পারে নাই।"

বিদ্যাসাগর নিজে সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না। কিন্তু সাহিত্যিকদের অভিভাবক ও গুরুস্থানীয় ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার নিকট যে শ্রদ্ধা ও আনুকূল্য পাইয়াছিলেন—তাহা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে পাইবার কথা নয়। মধুসূদনের সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহাকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে অমিতাচারী, দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী হইলেও তাঁহার জন্য তিনি নিজে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদি সেকালের সাহিত্যরথিগণ সকলেই তাঁহার নিকট নানা ভাবে ঋণী।

নিজে সাহিত্য রচনা না করিয়াও তিনি দেশবাসীকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনার সহিত পরিচিত করাইতে চাহিয়াছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতির উত্তররাম চরিত অবলম্বনে তিনি যে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন তাহা মৌলিক রচনার মতই উপাদেয়। ঈসপের ব্যঙ্গার্থ-গর্ভ গল্পগুলির তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। শেক্সপিয়ারের কোন কোন নাট্যের উপাখ্যানও তিনি বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করেন।

বিদ্যাসাগর একজন নিবন্ধকারও ছিলেন। বিধবা-বিবাহ-প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তন, বহুবিবাহ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন ইত্যাদির জন্য তিনি অনেক যুক্তি-গর্ভ নিবন্ধও রচনা করেন। তাঁহার 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' নামক নিবন্ধ সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে।

তাঁহার সারস্বত জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্রত ছিল দেশের লোককে ভাষাশিক্ষা দান। এ বিষয়ে তিনি হাতে খড়ি হইতে গুরুগিরি করিয়াছেন। বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ হইতে সীতার বনবাস পর্য্যন্ত গ্রন্থরচনা দেশবাসীকে দস্তুরমত বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা হইতে এজন্য তিনি বহু আখ্যায়িকা, গল্প, উপাখ্যান ইত্যাদি সংকলন করিয়া বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করেন। সেগুলি সাহিত্য না হইলেও সাহিত্যরচনায় ও সাহিত্যের রসবোধে দীক্ষাদানের কার্য্য করিয়াছে।

এখন কথা হইতে পারে, শিক্ষা-প্রচারই যাঁহার ব্রত তাঁহার ভাষা সর্ব্বজন বোধগম্য হওয়া উচিত ছিল না কি? একথা অক্ষয়কুমার সম্বন্ধেই খাটে। কারণ, তিনি দেশের জনসাধারণকে বিজ্ঞানাদি বিবিধ-বিষয়ের শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার ভাষা সর্ব্বজনবোধ্য হওয়া উচিত ছিল। বিদ্যাসাগর ভাষা-শিক্ষাই দিতে চাহিয়াছিলেন—যে ভাষা সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী, সেই ভাষাই তিনি শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। যে ভাষায় লোকে সাধারণতঃ ভাব প্রকাশ করে, যে ভাষা তাহাদের পূর্ব্বেই অধিগত সে ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া লাভ কি? তাহা ছাড়া, তিনি চাহিয়াছিলেন সাহিত্যবোধে দীক্ষা দান করিতে। সর্ব্বজনের উচ্ছিষ্ট ভাষায় তাহ সম্ভব নয়। বিশেষতঃ সাহিত্য বলিতে বিদ্যাসাগর বুঝিতেন সংস্কৃত সাহিত্য। সে সাহিত্যে দেশবাসীকে দীক্ষিত করিতে হইলে সংস্কৃতানুগ সরস ভাষারই প্রয়োজন। তাঁহার নিজস্ব শিক্ষাভিজাত্যের সহিত অন্য ভাষার সামঞ্জস্যও হয় না।

অক্ষয়কুমার দত্ত—ইনি একজন ভাষাশিল্পী, শিক্ষাব্রতী ও নিবন্ধকার ছিলেন। রেভাঃ কৃষ্ণমোহনের মত ইনিও একজন লোকশিক্ষক ও ধর্ম্মগুরু। ইনি সংস্কৃতানুগ ভাষায় লিখিতেন—বিদ্যাসাগরের ভাষার মত ইঁহার ভাষা সৌষ্ঠবময় ও সাবলীল ছিল না। ইঁহার ভাষা অনেক স্থলে শ্রুতিকটু, নীরস ও জটিল। অক্ষয়কুমার আমাদিগকে বিদেশীয় বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মদর্শন ইত্যাদির সহিত পরিচিত করান। তিনি এজন্য অনেক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' ইংরাজি ভাষা হইতে সংকলিত একখানি ব্যাবহারিক জ্ঞানের পুস্তক। চিন্তাগর্ভ বিচারমূলক নিবন্ধ হিসাবে ইহার মূল্য অসাধারণ। তিনি দেশী বিদেশী বহু উপাদান হইতে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্মসম্বন্ধের

পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি অক্ষয়কুমারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। বিবিধ উপাসক সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি বহু গবেষণা করিয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় দুইশত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও আচার অনুষ্ঠানের কথা আছে। বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণা-মূলক রচনা বোধ হয় ইহাই প্রথম। 'প্রাচীন হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' অক্ষয়কুমারের আর একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ। ইনি প্রথমে সংবাদপ্রভাকরের একজন লেখক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্য্যেই ইহার সাহিত্যে দীক্ষা। বহুদিন ধরিয়া তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মালোচনা-বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার পরিচালনা করিয়াছিলেন। যুক্তি অনুসরণ করিয়া নিবন্ধরচনার প্রবর্ত্তনে তিনি গুরুস্থানীয়।

প্রকৃত সাহিত্য কাহাকে বলে তাহা তিনি বুঝিতেন না তাহা নয়। তিনি বুঝিতেন যে সরস করিয়া না বলিতে পারিলে কোন নিবন্ধ সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিতে পারে না। তাই তিনি Addison এর Vision of Mirza র অনুসরণে স্বপ্নদর্শনচ্ছলে বিদ্যা, নীতি, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রূপকের অন্তরালে সত্যপ্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অক্ষয়কুমার সেকালের সাহিত্যিকদের চিন্তা-বিষয়ে সত্যনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার তিনভাগ চারুপাঠ অদ্যাবধি শিক্ষার বাহন হইয়া আসিতেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও মহর্ষি অক্ষয়কুমার বা বিদ্যাসাগরের মত সমাস-সন্ধিঘন সংস্কৃতানুগ ভাষায় লিখিতেন না। তাঁহার রচনার প্রধান উপজীব্য ছিল ধর্ম্ম। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা শাস্ত্র-গবেষণা নয়, শাস্ত্রীয় বাদবিচার, তর্কদ্বন্দ্বও নয়—তিনি স্বধর্ম্মকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন—তাঁহার নিজস্ব ধর্ম্মানুভূতি ও ভাগবতী ভক্তির কথাই তিনি সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। সত্যানুভূতির ভাষা কখনও অস্বচ্ছ, জটিল বা আড়ম্বরময় হয় না। তাঁহার অনুভূত ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যানগুলি 'ব্রাহ্মধর্ম্ম', 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা', 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' ইত্যাদি গ্রন্থে উপনিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালাভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার প্রবর্ত্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁহার আত্মজীবন-চরিত তাঁহার জীবনের নিজস্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইতিহাস—সত্যনিষ্ঠ ভাগবদ্‌ভক্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মমূলক গদ্যসাহিত্য-রচনায় তাঁহার পিতার নিকট ঋণী।

রাজনারায়ণ বসু—ইনি মাইকেল, ভূদেব ইত্যাদি রথিগণের সতীর্থ ছিলেন। কাজেই ইনি ছিলেন ইংরাজি-নবিশ। ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি সম্বন্ধে ইঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ইনি সংস্কৃতানুগ ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইনি নিজে সাহিত্যিক ছিলেন না—কিন্তু সাহিত্য-রসিক ছিলেন। ইঁহার ভাষা সরস—সাহিত্য-রচনার ভঙ্গীতেই ইনি নিবন্ধাদি রচনা করিতেন। ইঁহার দৃষ্টি ছিল কৌতূহলী ও রসাত্মক। রসদৃষ্টিতে ইনি চারিপাশে যাহা কিছু দেখিতেন—তাহাই সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেন। ইঁহার আত্মজীবন-চরিত ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ইঁহার প্রাণটি ছিল স্বচ্ছ—ইঁহার ভাষাও ছিল স্বচ্ছ। ইনি রচনার মধ্য দিয়া দেশাত্মবোধ-

জাগরণেরও চেষ্টা করেন। সত্যনিষ্ঠ লেখক নিজের জীবনের ভুলভ্রান্তি দোষক্রটী—এমন কি ছাত্রজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা অকুণ্ঠিতভাবেই লিখিয়া গিয়াছেন;

ভুদেব মুখোপাধ্যায়—ইনিও ঠিক সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না—শিক্ষাব্রতী, জ্ঞানগুরু ও নিবন্ধকার ছিলেন। এডুকেশন গেজেটের মারফতে ইনি নিজের চিন্তা, মন্তব্য ও অভিজ্ঞতার কথা প্রচার করিতেন। শিক্ষাব্রতী বিশেষতঃ লোকশিক্ষক হিসাবে ইনি সংসারীদিগকে সংসারধর্ম্মের নৈতিক শৃঙ্খলা শিক্ষাদান করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ ইত্যাদি পুস্তকে আদর্শ-গৃহি-জীবন পালন সম্বন্ধে বহু উপদেশ আছে। প্রাজ্ঞ মনীষী তাঁহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে দেশবাসীকে আদর্শ চরিত্রগঠন ও আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন যাপনে শিক্ষাদান করিয়াছেন। ভুদেব শিক্ষাবিষয়েও অনেক নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তিনি একজন ঐতিহাসিকও ছিলেন—তাঁহার পুরাবৃত্তসারে বহু দেশ বিদেশের ইতিহাস সঙ্কলিত আছে। ভুদেবের ভাষা ছিল অনেকটা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক।

হিন্দুকলেজের দূষিত ছোঁয়াচ তিনি এড়াইয়া চলিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গোঁড়ামিও ছিল না। তিনি হিন্দু সংস্কারগুলিকে যুক্তির দ্বারা অথবা যুগোপযোগী ব্যাখ্যান দানে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেন—তাঁহার বিচারনিষ্ঠ মন বিনা যুক্তিতে কিছুই বরণ করিতে চাহিত না। * যুক্তিমূলক চিন্তায় তিনি বঙ্কিমের অগ্রদূত ছিলেন।

তিনি একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন—এই উপন্যাসও শিক্ষাব্রতীর উদ্দেশ্যই বহন করিতেছে—কারণ ইহা নীতিমূলক। তাহা হইলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও ইহাকে অগ্রদূত বলা যায়। ভুদেব ছিলেন আদর্শ সংসারী। হিন্দু সংসারী লোককে তিনি তাঁহার নিবন্ধগুলির মারফতে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা অমূল্য। ভুদেব সর্ব্বব্যাপারে সর্ব্বক্ষেত্রেই ছিলেন শিক্ষক। ভুদেববাবুর রচনাভঙ্গী সংস্কৃতের কঠোর বন্ধন হইতে অনেকটা মুক্ত।

টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)—ইনি খাঁটি বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কবল হইতে উদ্ধার করেন। ইনিই প্রথম দেখাইলেন—যে খাঁটি চল্‌তি ভাষাতেও বই লেখা চলে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—'এত দিনে বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত হইল।'†

বঙ্কিমচন্দ্র চতুষ্পাঠীর লেখকদের পরাভবে উৎফুল্ল হইয়াই একথা বলিয়াছিলেন—প্রকৃত পক্ষে তিনি এই ভাষা নিজে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ, এই ভাষায়

---

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ—'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ'—অনুশাসনটির ব্যাখ্যা। ভুদেব 'বনের' অর্থ ধরিয়াছেন পুত্র পৌত্রের মায়া কাটাইয়া স্বগৃহ হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে বসতি।

† বঙ্কিম যে এ কথা বলিয়াছিলেন—তাহা পণ্ডিত-লেখকদের প্রতি বিরক্তিবশতঃ। প্রকৃত পক্ষে তিনি নিজে এই ভাষা অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তিনি নিজে বিদ্যাসাগরী ভাষা-শৈলীরই তখন পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতেন। ঐ ভাষা-শৈলী অনুসরণে পুস্তক লিখিয়াও তিনি পণ্ডিতদের তুষ্ট করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীর ভাষায় অনেক ভুল ধরিয়াছিল—ব্যাকরণের দোষ দেখাইয়াছিল। ইহাতে বঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডিতী ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

—বর্ত্তমান কালের সাধারণ জীবন-যাত্রার কথাই ব্যক্ত করা যায়—গুরুতর বিষয়, তত্ত্বমূলক প্রসঙ্গ, দেশের নানাবিধ সমস্যার কথা, দেশে ও কালে দূরবর্ত্তী বিষয় এই ভাষায় আলোচনা করা যায় না।—তবু এ ভাষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কথাগুলিও আগে চতুষ্পাঠীর লেখকগণ আড়ম্বরময় ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। তাহা যেমন অস্বাভাবিক—তেমনি অসত্য। জাতীয় জীবনের ও জনসাধারণের জীবন-যাত্রার সঙ্গে আমাদের দেশের সাহিত্যের যত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটিবে—ততই এই ভাষার প্রয়োজন হইবে।

টেকচাঁদ বাংলাদেশে প্রথম ঔপন্যাসিক। 'আলালের ঘরের দুলাল' যদিও উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট নয়, তবু শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কতকগুলি লক্ষণ এই পুস্তকে আছে—যথা—চরিত্রের যথাযথ চিত্রণ, ঘটনাদির যথাযথ বর্ণনা, পাত্রপাত্রীর মুখের জবানীর যথার্থতা এবং আখ্যানভাগের সরস বিবৃতি। উপন্যাসখানি উদ্দেশ্য-মূলক। 'সেকালের মূর্খ ধনিদুলালদের অবিবেচিত উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রার পরিণাম প্রদর্শনচ্ছলে সমাজকে শিক্ষাদানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল'—এই শিক্ষার সঙ্গে কশাঘাত যথেষ্টই আছে। আদালতের আবহাওয়া ও শঠচরিত্র অঙ্কনে তিনি প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের মতই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

যে যুগে গদ্যে মৌলিক রচনার চেষ্টাই ছিল না—কেবল বিদেশী সাহিত্য অথবা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অনুবাদ বা মর্ম্মানুবাদ চলিতেছিল—সে যুগে টেকচাঁদ এমন একটা সৃষ্টি করিলেন—যাহা ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ মৌলিক। এজন্য যাঁহারা বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী, মৌলিকতার পক্ষপাতী, তাঁহারা 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়িয়া বড়ই উৎফুল্ল হইলেন। বঙ্কিম তাই বলিয়াছেন—

"তিনিই প্রথম সংস্কৃত ও ইংরাজির উচ্ছিষ্টাবশেষ অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনায় উপাদান সংগ্রহ করিলেন। তিনি প্রথম দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য সংস্কৃত ও ইংরাজির কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর নয়। তিনি প্রথম দেখাইলেন যে যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে উন্নত করিতে হয় তবে বাঙ্গালা দেশের বিষয় লইয়া সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলালের ঘরের দুলাল।"*

---

* আলালের ঘরের দুলালের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা এখানে দেওয়া গেল :—

বৈদ্যবাটীর বাবুরামবাবু, বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হ'রে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই একজন ভট্টাচার্য্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই—লবণ দিয়া দুগ্ধ খাইলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া টেঁকির কচ্‌কচি করিতেছেন। একপাশে দুইজন গাহক যন্ত্র মিলাইতেছে; তানপুরা মেও মেও করিয়া ডাকিতেছে। একপাশে মুহুরীরা খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জ্জদার, প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে—অনেকের দেনা-পাওনা ডিক্রী ডিস্‌মিস্ হইতেছে—বৈঠকখানা লোকে থই-থই করিতেছে। খুচুরা খুচুরা মহাজনেরা, যথা তেলওয়ালা, কাঠওয়ালা, সন্দেশওয়ালা—তাহারাও কেঁদে ককিয়ে কহিতেছে—মহাশয়, আমরা মারা গেলাম,—আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ—এমন করিলে আমরা কেমন ক'রে বাঁচিতে পারি?" এই ভাষা-ভঙ্গী আমরা বঙ্কিমের শেষ বয়সের রচনায় দেখিতে পাই।

সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের ধনিসন্তানদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি কশাঘাতে দূর করার জন্যে টেকচাঁদের রচনা যতটা প্রবল ছিল—খাঁটি সাহিত্য সৃষ্টির মনোভাব তাঁহার ততটা ছিল না। তবু ইহাতে একটা লাভ হইয়াছিল। বাস্তব চিত্র অঙ্কন না করিলে কশাঘাত করা চলে না, সংস্কারের পন্থা দেখানোও চলে না। সেইজন্য টেকচাঁদকে আদর্শবাদ, স্বপ্নবিলাস, গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া রীতিমত বাস্তব চিত্র অঙ্কন করিতে হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে এই বাস্তবতার প্রবর্ত্তন তাঁহার একটি বড় দান। সে যুগে এই বাস্তবতার মূল্য কালীপ্রসন্ন সিংহ ছাড়া আর কেহ বুঝিতেন না। চিত্রের যে চিত্রহিসাবেই একটা মূল্য আছে—চিত্র কেবল পরিবেষ্টনী সৃষ্টির জন্য অথবা গল্পের কথাবস্তুর পোষকতার জন্যই প্রয়োজনীয় নয়—একথা টেকচাঁদ প্রথম বুঝাইলেন। বিচিত্র না হইলেও যথাযথ চিত্রের একটা নিজস্ব মূল্য আছে। চিত্র ফুটাইবার জন্য টেকচাঁদ যে বাগ্‌বিনিময়ের সমাবেশ করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার নাটকীয় মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বাগ্‌বিনিময়ের ধারা পরবর্ত্তী উপন্যাস ও নাটকগুলির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

টেকচাঁদের আগেও গদ্য রচনার প্রারম্ভকাল হইতেই চলিত ভাষার একটা ধারা চলিয়া আসিতেছিল। তবে তাহার মূল্যমর্য্যাদা শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃত হয় নাই।

রামরামবাবুর ভাষা সংস্কৃতানুগ নয়, নিতান্ত চলিত ভাষাতেও তিনি লেখেন নাই। সেকালের বাক্যগঠনগত অমার্জ্জিত ভাব বাদ দিলে ও ব্যাকরণাশুদ্ধি বর্জ্জন করিলে রামরাম বাবুর ভাষা একালের সাধু ভাষারই অনুরূপ। যেমন—তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি ইহার দুঃখের সীমাহ নাই। ইনি সদাই নিরানন্দ কোনকার্য্যে আমোদ নাই ইহার পূর্ব্বমত আহার নিদ্রা নাই তোমার বিচ্ছেদে ইনি অতিশয় খিদ্যমান। আমি তোমাকে যত্নপূর্ব্বক পাঠাইয়াছিলাম ইহাতে ইনি হবিষমনে আমার সহিত আলাপ করেন না এই পর্য্যন্ত শোকিত। অতএব পুত্র তোমার বিবরণ অবগত কর তবে প্রাণ স্থির হয় নতুবা আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত।

—প্রতাপাদিত্য চরিত্র।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকরা সংস্কৃতানুগ রীতির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের ভাষা সন্ধিসমাসে সমাকীর্ণ ছিল না। মিশনারি সাহেবরা চলিত বাংলার পক্ষপাতী ছিলেন। কেরি সাহেব নিজে দুই শ্রেণীর ভাষাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার 'কথোপকথন' পুস্তকে বাগ্‌ বিনিময়ের পাত্রপাত্রী যেমন, তাহাদের মুখের ভাষাও তেমনি। যেমন—

—মুই সে বাড়ীতে কাম করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বচ্ছর তার বাড়ী কাম করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড় খারা মোকে আপ এক টাকা দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তাকে।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবেস্ মুই তোর ঠাঁই মোর খাটুনি নিব।

ভাল ভাই। তুই চল তোর যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব।

আচ্ছা ভাই। ইহা কর যদি তবে মুই যাব।

ইতিহাসমালায় তিনি প্রায় বর্ত্তমান সাধুভাষারই অনুসরণ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ও প্রয়োজনমত সাধু ভাষা ও চলতি ভাষা দুইই লিখিতেন। তাঁহার চলতি ভাষার নমুনা—

"স্ত্রী বলিল গুড় হইলেই কি বাঁধা যায় তৈল নাই নুণ নাই চাউল নাই তরকারিপাতি কিছুই নাই। কাঠগুলি সব ভিজা বেসাতি বা কিরূপে হইবে। কুটনা কে কুটিবে বাটনা বা কে বাটিবে।"

'মোরা চাষ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব। ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ি ও মটর মসুর শাকপাত শামুক গুগলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিল ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জালানি করি। কার্পাস তুলি তুলা করি ফুঁড়ি পিঁজি পাঁইজ করি চরকাতে সুতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাঠে ঘাটে বেড়াইয়া ফল ফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাথায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্সা পাড়াপড়সীদের ঘরে মুনিস খাটিয়া দুই চারি পোন যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বানি দিই ও তেল নুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া গনি ধান কুড়াই সিজাই শুকাই ভানি খুদকুঁড়া ফেন আমানি খাই। শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্ম তিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাতা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাথায় খড়ি উড়ে।" (প্রবোধ চন্দ্রিকা)

ক্রিয়াপদগুলি সবই মার্জ্জিত ভাষার। ক্রিয়াপদগুলির কথা বাদ দিলে নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও চল্‌তি ভাষার।

আর এখন কি হবে বল দেকি রে ঠেঁটা বেটা তখন ফাঁকিফুকি দিয়া নামাইলি এখন যে মুখে কথা নাহি তোর অহঙ্কার কোথা গেল হারে বেটা বোকা রাজাকে যে ধমক করিয়াছিলি এখন খাওনা।" গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশ।

গ্রীকদেশে একজন পণ্ডিত অবিবোধে কালযাপন করিতেন। এক সময় তিনি আপন মিত্রদের সহিত পথ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় একব্যক্তি গোঁয়ার আসিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তাহাতে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। ইহা দেখিয়া মিত্রেরা কহিল একি। আপনি ইহাকে যে কিছুই কহিলেন না। পণ্ডিত কহিলেন যে যদি কোন ব্যক্তি গর্দ্দভের নিকট যায় এবং গর্দ্দভ চাইট মারে তবে কি গর্দ্দভের নামে কেহ নালিশ করিয়া থাকে।

(ক্ষমাশীল পণ্ডিত, সংবাদ কৌমুদী)

যাঁহারা বাংলা গদ্যের প্রবর্ত্তয়িতা তাঁহাদের ভাষাত সংস্কৃতানুগ নয়, তবে গদ্যভাষা সংস্কৃত সন্ধিসমাসে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল কেন? ইহার পর যখন সংস্কৃত পণ্ডিতরা বাংলা গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন তখনই ভাষা কৃত্রিম রূপ পরিগ্রহ করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের যৌবনকাল পর্য্যন্ত

এই কৃত্রিম ভাষার আধিপত্য চলিয়াছিল। তারপর বঙ্কিমের প্রৌঢ়কাল হইতেই ভাষা ক্রমে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিল।

বাংলা গদ্যের আদিম অবস্থায় মৌলিক রচনার খুবই অভাব। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গদ্য লিখিতে শিখিলেন। কিন্তু তখনও সাহিত্য সৃষ্টি করিবার শক্তি কাহারো বড ছিল না। মৌলিক চিন্তা বা গবেষণা কবিবার শক্তি, প্রবৃত্তি বা অবসবও ছিল না। ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা বন্যার মত আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহাকে আত্মস্বীকৃত করিবার জন্যই লেখকরা ব্যস্ত ছিলেন। এ দিকে এত কাল সংস্কৃত পুস্তক সংস্কৃতেই পড়িতে হইত, সাধারণ লোকে সংস্কৃত পুস্তকের স্বাদ লাভ করিত না। প্রকাশের ভাষা পাইয়া পণ্ডিতমহোদয়গণও সংস্কৃত গ্রন্থেব অনুবাদ কবিতে লাগিলেন। যাঁহারা সেকালের ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন —তাঁহারাও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করাইতেই চাইতেন। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে গেলেই ভাষা সংস্কৃতের অনুগামী হইবে ইহাই স্বাভাবিক। সেকালে পণ্ডিতদেব ভাষা যে অনুস্বারবিসর্গহীন সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাব একটি কারণ ইহাই। ইংরাজি হইতে যাঁহাবা অনুবাদ করিয়াচেন—তাঁহারাও পরিচিত ও প্রচলিত শব্দেব দ্বাবা ইংরাজির ভাব প্রকাশ কবিতে না পারিয়া সংস্কৃত সন্ধি সমাসেবই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ফলে তাঁহাদের ভাষাও সংস্কৃতানুগ হইত। সকলেই যে আক্ষরিক অনুবাদ কবিতেন তাহা নয়, অনেকে ভাব বা কথাবস্তু গ্রহণ করিয়া কতকটা নূতন ভাবে অনুবাদ্য গ্রন্থেব রূপান্তব দান কবিতেন। এই অনুবাদনেব ধারা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া তারাশঙ্কব ও কালীপ্রসন্ন সিংহ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে যে সাহিত্যিক ধারা চলিতে থাকিল—সে ধারার লেখকরা মৌলিক সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা অনুবাদে মন দেন নাই।

সেকালের সংবাদ-পত্রগুলিতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরই কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য ছিল। সেজন্য অধিকাংশ সংবাদপত্রের ভাষা ছিল সংস্কৃতানুগ। পণ্ডিত মহাশয়দেব হাতেই পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার পড়িয়াছিল। সেজন্য সেকালেব বহু পাঠ্যপুস্তকেব ভাষাও সংস্কৃতানুগ। পৌবাণিক বিষয় বিবৃতিতে কথকতাব ভাষাব ধারা স্বভাবতই আসিয়া পডিয়াছিল। তাহার ফলে ইহাতেও সংস্কৃতানুগ ভাষাব প্রাধান্য ঘটিয়াছিল।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। যৌবনেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খৃষ্টান পাদরি হ'ন। ইনি দেশে শিক্ষা বিস্তাবের জন্য লেখনী ধারণ করেন। ইঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুম ১৩খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, নীতিবিদ্যা জীবনচবিত ইত্যাদি বহুবিষয়ের সন্দর্ভ আছে। ষড্‌দর্শনের তত্ত্বালোচনা করিয়াও ইনি ষড্‌দর্শন সংবাদ নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইনি সংবাদসুধাংশু নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচনার ভাষা পণ্ডিতদের ভাষার তুলনায় সহজ সরল। ইঁহাকে সাহিত্যিক না বলিয়া লোকশিক্ষক বলিতে হয়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—ইঁহাকেই বাংলার আদিনাট্যকার বলা হয়। যদিও ইঁহার আগে ২।৪খানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হইয়াছিল এবং ২।১খানি পৌরাণিক নাটক রচিত

হইয়াছিল। তর্করত্নও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং পৌরাণিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম সামাজিক নাটক কুলীনকুলসর্ব্বস্বের জন্যই রামনারায়ণ এদেশে নাট্যগুরু। কৌলীন্য পীড়িত সমাজের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে এই নাটকখানি রচিত। আমাদের সমাজে গলদের সীমা ছিল না—কাজেই রামনারায়ণ-প্রদর্শিত পথে ক্রমে বহু নাট্য রচিত হইতে থাকিল। রামনারায়ণ হইতে গিরিশচন্দ্র পর্য্যন্ত নাট্যকারগণ সমাজ সংস্কারের জন্যই নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ এই নাটকে সংস্কৃত নাটকের রীতিধারাই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

রামগতি ন্যায়রত্ন—রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালাভাষা বিষয়ক প্রস্তাব বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ইতিবৃত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং কিছু কিছু লোকসাহিত্যও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সংবাদ প্রভাকরে সে সমস্তের পরিচয়ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বিধিবদ্ধ কোন ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া যান নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়ই সেই সকল উপাদান অবলম্বনে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। তিনি দুইখানি উপকথার পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন—একখানির নাম রোমাবতী, অন্যখানি ইলছোবা।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন—ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি কাদম্বরী। বিদ্যাসাগর যেমন শকুন্তলা নাটক অবলম্বন করিয়া বাংলায় শকুন্তলা রচনা করিয়াছিলেন—তারাশঙ্কর তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত কাদম্বরীর আখ্যান বস্তু লইয়া বাংলায় অভিনব কাদম্বরী রচনা করিয়াছেন। মূল কাদম্বরীর পদবিন্যাসের ঘটা ইহাতে নাই—কিন্তু মূলের আলঙ্কারিকতা পণ্ডিত মহাশয় যতদূর সম্ভব রক্ষা করিয়াছেন। ইহার ফলে বাংলা সাহিত্যে একটা সংস্কৃত আলঙ্কারিকতার ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র—ইনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয় কুমার দত্তের মতন একজন লোকশিক্ষক ছিলেন। ইনি সেকালের শিক্ষার্থীদের জন্য কেবল পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন নাই—তিনি বিবিধার্থসংগ্রহ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন—ইহাতে বহু বিষয়ের নিবন্ধ প্রকাশিত হইত। প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় গবেষণার ইনিই পথিপ্রদর্শক।

ইঁহাদের অনেকের রচনা আজ বিলুপ্ত। কিন্তু ইঁহাদের রচনাবলীর সাহায্যেই আমাদের গদ্যভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (বাং ১২১৩—১২৬৫) আবির্ভাব। ইঁহার রচনায় প্রাচ্য যুগ শেষ হইয়া পাশ্চাত্য যুগেব শুরু হইয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব ইঁহাব রচনায় নাই, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। গুপ্তকবির অনেক রচনা তাঁহার সামসাময়িক গ্রাম্য সাহিত্যেরই মার্জ্জিত নাগরিক রূপ। রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাবও দৃষ্ট হয়,—ছন্দের বৈচিত্র্যে নয়, শব্দালঙ্কারেব (শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাসাদির) ঘটায়। গানগুলিতে সেকালের শাক্ত কবিদেরই অনুসৃতি দৃষ্ট হয়। গুপ্তকবিব বচনায় রসের নিবিড়তা দৃষ্ট হয় না,—তবে রূপের বৈচিত্র্য আছে। অধিকাংশ রচনাই বর্ণনাত্মক। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাব বিস্তারে জাতীয় জীবনে একটা অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ঘটায় গুপ্তকবি বিষয়বস্তু ও আখ্যানবস্তুর বিস্তৃত পরিসব ও বৈচিত্র্য পাইয়াছিলেন। অনেক কবিতা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। সেকালের সাময়িক-পত্রে ব্রাহ্মপ্রভাবে যে সকল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়েব আলোচনা হইত, গুপ্তকবিব কবিতাগুলি সেই আলোচনারই ছন্দোবদ্ধ রূপ।

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা তখন আমাদেব জাতীয় ও সামাজিক জীবনে একটা মহা আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল। গুপ্তকবির কাব্যে সেই আলোড়নের সাড়া পাওয়া যায়। ইংরাজ-শাসনে আমাদেব সামাজিক জীবনে যে পবিবর্ত্তন ঘটে—তাহা গুপ্তকবিকে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও কৌতুকরসের উপকবণ যোগাইয়াছিল। আবাব ইংবাজের বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি এদেশেব লোককে চমকিত ও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল—সেই বিস্ময়েব বিস্ফারিত ভাব গুপ্তকবিব অনেক কবিতায় রূপায়িত হইয়াছিল।

গুপ্তকবির রচনায় বহু অধ্যাত্মতত্ত্ব, নৈতিকতা ও পারমার্থিক তথ্য থাকিলেও,—ভাবেব গভীরতা, মনস্তত্ত্বেব জটিলতা বা রসের নিবিডতা নাই। সকল তত্ত্ব তথ্যের উপব দিয়া তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী লঘু পদে সঞ্চরণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কবিদের মত তিনি কোন একটি উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্য বচনা করেন নাই—যখন যাহা তাঁহার চিত্তে রসসঞ্চার করিয়াছে তখনই তিনি তাহা লইয়াই পদ্য লিখিয়াছেন। পরং ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তপসে মাছ, পাঁটা, আনারস পর্য্যন্ত অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্বের কিছুই বাদ যায় নাই। ধর্ম্মকথা ছাড়া বিচিত্র বিষয় লইয়া নানা রসের রচনা গুপ্তকবি হইতেই সুরু হইয়াছে। গুপ্তকবি যুগ-সন্ধিব কবি। তাই তাঁহার রচনায় পূর্ব্বতন কবিদের রুচি, রীতি, ভাবভঙ্গী, শব্দচ্ছটা, বস্তুতান্ত্রিকতা, বর্ণনাবিলাস, নির্ঘণ্টরচনা ইত্যাদি বিদ্যমান আছে—আবার বর্ত্তমান যুগের গীতিকাব্যেরও পূর্ব্বাভাস তাঁহার রচনায় দৃষ্ট হয়। বাংলা কবিতাকে গুপ্ত কবিই প্রথম ধর্ম্মের কঠোর শাসন বিশেষতঃ পৌরাণিক আবেষ্টনী হইতে মুক্তি দেন।

গুপ্ত কবি তখনকার রাষ্ট্রিয় ও জাতীয় সমস্যা অবলম্বনেও অনেক কবিতা লিখিয়াছেন।

প্রভাকরে যে রাষ্ট্রিয় ঘটনা বা জাতীয় সমস্যা লইয়া গদ্যে আলোচনা করিতেন—তাহা লইয়া ব্যঙ্গের সুরে পদ্যও লিখিতেন। এই কবিতাগুলিতে সমসাময়িক জাতীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তকবিই প্রথম দেশমাতা বলিয়া নূতন একটি দেবতার আবিষ্কার করেন। বাঙ্গালা কবিতায় গুপ্ত কবিই সর্ব্বপ্রথম দেশভক্তি ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেন। তিনি গদ্য ও পদ্যে মাতৃভাষার মহিমাও প্রচার করেন। জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময় স্বরূপবর্ণনাও গুপ্তকবির লেখাতেই শুরু হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে গুপ্তকবি—হিন্দুর বিশেষ বিশেষ দেবদেবী ছাড়িয়া—এক সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং খৃষ্টান কবিদের মত তিনিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে ভগবানকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিলেন। গুপ্ত কবির ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, তিনি সগুণ হইয়া পিতৃত্বলাভ করিয়াছেন। কবি নিরাকারকে সাকার হইতে আবেদন জানাইয়াছেন—

> হায় হায় কব কায় ঘটিল কি জ্বালা।
> জগতের পিতা হয়ে তুমি হলে কালা।
> অনুভবে বুঝিলাম তুমি কালা বটে।
> নতুবা কি আমাদের এত দুঃখ ঘটে ?
> চলিবার শক্তি নাকি কিছু নাই আর।
> বি পদ হইলে তুমি বিপদ আমার।
> যে শুনিছে সে হাসিছে কাবে আব ক'ব।
> কেমনে বুঝাব আমি কব নাই তব।
> কহিতে না পার কথা কি রাখিব নাম।
> তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।
> তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
> আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার
> গুপ্ত হয়ে গুপ্তপুত্রে ছল কেন কর।
> গুপ্তকায় ব্যক্ত করি গুপ্তভাব হর।

গুপ্তকবি অনেক অধ্যাত্মতত্ত্ব, নীতিসূত্র, দার্শনিক তথ্যও পদ্যে প্রচার করিয়াছেন এইগুলি লোকশিক্ষার জন্য পরিকল্পিত। ব্যঙ্গকৌতুক-রচনায় সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু নূতন ধরণের কৌতুকরসরচনা তিনিই প্রবর্ত্তন করেন—তখনকার গ্রাম্য রসিকতার তুলনায় তাহা অনেকটা মার্জ্জিত ও শিষ্টরুচির। গুপ্তকবি প্রধানতঃ রঙ্গ-ব্যঙ্গের কবি। নিরপেক্ষ উদাসীন দ্রষ্টার উচ্চাসনে বসিয়া তিনি চারিপাশের জগৎকে এবং মানবের জীবন-যাত্রার বৈচিত্র্যকে কৌতুকদৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন। এই দৃষ্টিটাই বঙ্গসাহিত্যে অভিনব। ইহা প্রকৃত রসশিল্পীর দৃষ্টি। এই দৃষ্টিকে তিনি রসসৃষ্টিতে পরিণত করিতে পারেন নাই বটে,

কিন্তু অভিনব দৃষ্টির প্রবর্ত্তক হিসাবে তিনি গুরুস্থানীয়। এই ব্যঙ্গ-রসরচনার দিক হইতেই দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের ইনি গুরুস্থানীয়।

ঈশ্বর গুপ্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাংলার কাব্য সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, হরপার্ব্বতীর কাহিনী, আগমনী-বিজয়া ও কোন কোন পৌরাণিক কাহিনী। মঙ্গলকাব্যের গল্প লইয়া আর কাব্য রচনা করা হইত না। ইংরাজের আগমনের পর হইতে এ দেশের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য ঘটিল—কাব্যের বিষয়বস্তুও বাড়িয়া গেল। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আমরা সর্ব্বপ্রথম বিবিধ বিষয়ের অবতারণা দেখিতে পাই। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। —দেবদেবীর প্রাধান্য ঘুচিয়া এক ভগবান সাহিত্যে উপাস্য হইয়া উঠিল—ধর্ম্মমতে বেদান্ত উপনিষদের প্রভাব সঞ্চারিত হইল—তাহার ফলে ধর্ম্মজগতে নূতন বিষয়বস্তুর আবির্ভাব হইল। দুর্নীতির সংস্কার চেষ্টার ফলে সুনীতি প্রচারও একটা বিষয়বস্তু দাঁড়াইল। ইংরাজি সভ্যতার ও ইংরাজপ্রবর্ত্তিত শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশে নব নব ভাব, বস্তু, প্রতিষ্ঠান ও আচারের প্রবর্ত্তন হইল এই গুলিও হইল অভিনব বিষয়বস্তু। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মারফতে সেকালে সংঘটিত প্রত্যেক ঘটনাটি প্রচারিত ও আলোচিত হইত। সেগুলিও অভিনব বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। তাহা ছাড়া, সাময়িক-পত্রিকার মারফতে ইউরোপীয় কাব্য সাহিত্যের নব নব রূপও অনুকরণ ও অনুবাদের সাহায্যে প্রচারিত হইল। সেগুলি হইতেও কাব্যের বিষয়বস্তু কত প্রকারের হইতে পারে—তাহাও জানা গেল। এমন সব বিষয়বস্তু ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আমরা পাই সে সকল যে কখনো কবিতার বিষয়ীভূত হইতে পারে এ ধারণা পূর্ব্বের কবিদের ছিল না। এইভাবে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্য সাহিত্যকে অনেকটুকু আগাইয়া দিয়াছিলেন। গাহিবার জন্য শুধু নয়, পড়িবার জন্য কবিতা বহুকাল পরে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম লেখেন।

ঈশ্বর গুপ্ত কাব্যে কোন চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই—কোন ভাবকে বিগ্রহ বা মূর্ত্তিদান করেন নাই। তিনি স্নেহ-প্রেম করুণার কবি ছিলেন না—কোন গাঢ় বা গূঢ় অনুভূতির সাড়া তাঁহার কবিতায় নাই। সমগ্র জগতের সাহিত্যের বিচারে তিনি বড় কবি নহেন—এমন কি প্রাচীন বঙ্গের বিচারেই তিনি বড় কবি নহেন—সর্ব্বকালের বিচারেও তিনি বড় কবি নহেন, বঙ্গদেশের কোন এক সময়ের বিচারেই তিনি বড় কবি অর্থাৎ বাংলা দেশে তাঁহার সময়ে তাঁহার চেয়ে বড় কবি কেহ ছিল না। বাঙ্গালী সমাজ তাঁহার সময়ে যেমনটি ছিল—তিনি ঠিক তাহারই প্রতিনিধি কবি। দেশে ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল—মুষ্টিমেয় ইংরাজিশিক্ষিত কয়েকজনকে এবং প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মুষ্টিমেয় আর কয়েকজনকে বাদ দিলে বাংলাদেশে যে ভদ্রসম্প্রদায় থাকে—সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা সেকালে যাহা চিন্তা করিত, অনুভব করিত, যে আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত, গুপ্ত কবি তাহাকেই তাঁহার কাব্যে রূপ দান করিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি বাংলার কোন এক সময়ের জাতীয় কবি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—যাহা কাল্পনিক নয় প্রকৃত বা বাস্তব, যাহা অনুমিত নয় প্রত্যক্ষ, যাহা উদ্ভাবিত নয়, প্রাপ্ত, তাহার যথাযথ বর্ণনায় একটা রস আছে।

অবশ্য কেবল যথাযথ বর্ণনা ফোটোগ্র্যাফির মত হইয়া পড়ে—আর্ট হয় না। গুপ্তকবি এই যথাযথ বর্ণনার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গপরিহাসের ফল্গুধারা বহাইয়াছেন। এই ফল্গুধারাই বর্ণনাগুলিকে সরস করিয়াছে—তাঁহার বাচন-ভঙ্গীই আলোকচিত্রকে রঙিন করিয়াছে—কবির মৃদু-মৃদু হাস্যই বাস্তবের রক্তমাংসে লাবণ্যসঞ্চার করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায় রান্নাঘরের ধুঁয়ায় নাটুরে মাঝির লগির ঠেলায় নীলের দাদনে হোটেলের খানায় পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুররস ছাড়া কাব্যরস পান। তপসে মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বিভাব দেখেন, পাঁটায় বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন তোমাদের এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথা কোটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর। আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওরে ফাঁকি দিতেছ এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার—তা হইলে হইতে পারে কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে। উভয়কে মুখ ভেংচানোতেই সুখ। স্ত্রীলোকের রূপ আছে তাহা তোমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে, উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পাড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘমাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন ঈশ্বরচন্দ্র যাইতেন তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য। * * * স্থূলকথা ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং Satirist. ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য—ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।"

ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গ করিবার জন্য ব্যঙ্গ করিতেন, আঘাত দিবার জন্য নয়, সংস্কারের জন্যও নয়, বিদ্বেষপ্রচারের জন্যও ত নয়ই। ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, সমাজবিশেষ, প্রথাবিশেষ, প্রতিষ্ঠানবিশেষই তাঁহার লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"মেকির উপর তাঁহার রাগ ছিল বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটাই আনন্দ।"

তখন বাংলার পল্লীতে কবির লড়াই চলিতেছিল। তিনি কবিওয়ালাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নাগরিক সমাজে কবির লড়াইএর একটা মার্জ্জিত রূপ দিয়াছিলেন সংবাদ প্রভাকরে। কবির লড়াইয়ের গালাগালি ব্যঙ্গবিদ্রূপে যেমন নিছক রঙ্গ ছিল, সংবাদ প্রভাকরের তথাকথিত কবির লড়াইয়ে তিনি সেইরূপ একটা রঙ্গ সৃষ্টিই করিতেন বা করাইতেন।

কবির লড়াইএর রুচিও তাঁহার রচনায় সংক্রমিত হইয়াছিল, সে জন্য তাঁহার রচনায় মাঝেমাঝে অশ্লীলতা দেখা যায়। যে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুমাত্র অশ্লীলতা সহ্য করিতে পারিতেন না —তিনি তাঁহার অশ্লীলতা দোষটুকু সমর্থন করিবার জন্য যুক্তি দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন—গুপ্তকবি দেবতুল্য প্রতিভার অধিকারী হইয়াও সংসারের সর্ব্ববিধ সুখসৌভাগ্য হইতে আবাল্য বঞ্চিত। তাহার ফলে সমাজসংসারের প্রতি তাঁহার ছিল মজ্জাগত আক্রোশ। সেকালে আক্রোশ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল—তাই তাঁহার রচনায় অশ্লীলতা মার্জ্জনীয়। কিন্তু

আর একটা কথা আছে—খৃষ্টান ও ব্রাহ্মপ্রভাবে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বাক্যের রুচি হইয়া উঠিয়াছিল অতিরিক্তরূপ মার্জ্জিত। রামমোহন রায় যে দেশে এত বাদানুবাদ তর্কাতর্কি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি একটি কুরুচিকর শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার আদর্শই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ে চলিতেছিল। কিন্তু এই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে কেহ সুরাপায়ী, কেহ সাহেবদের উচ্ছিষ্টভোজী, কেহ স্বজাতিদ্রোহী, কেহ স্বধর্ম্মদ্রোহী, কেহ নাস্তিক, কেহ আভিজাত্যের গর্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কেহ সাহেব বনিয়া গিয়াছে, কেহ বা ভণ্ড। এই নাগর সম্প্রদায়ের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের শ্রদ্ধা ছিল না—সেজন্য ইচ্ছা করিয়াই তিনি তাহাদের বাগ্‌ভঙ্গীর বিরুদ্ধরুচির অনুসরণ করিতেন, খাঁটি গ্রাম্য হিন্দু বাঙ্গালীর মুখের ভাষা ব্যবহার করিতেন। তাহার ফলে রচনায় কিছু কিছু অশ্লীলতা আসিয়া পড়িত।

তাহা ছাড়া, গুপ্তকবি ভারতচন্দ্রকে পাইয়াছিলেন আদর্শরূপে। তাহাতে ধারণা জন্মে—অশ্লীলতা রসসৃষ্টিরই একটা অঙ্গ। এই ধারণাতেই তিনি বাক্য সম্বন্ধে সতর্ক হ'ন নাই। যাহাই হউক, তাঁহার অশ্লীল রচনাগুলি তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে।

ভাষার পারিপাট্য-সাধনে তিনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য, কিন্তু শ্লেষযমক অনুপ্রাসে ভাষা অনেকস্থলে অপরিচ্ছন্ন। ভারতচন্দ্রও শ্লেষযমক অনুপ্রাস প্রয়োগ করিতেন—কিন্তু তাহা অত্যন্ত সুবিবেচিত প্রয়োগ—কলাসৃষ্টির অনুকূল। গুপ্তকবি এ বিষয়ে দাশুরায় ইত্যাদি পাঁচালিকারদের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। পাঁচালিকাররা শ্লেষযমক অনুপ্রাসের প্রয়োগকেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন—তাহাদের অন্য কোন সম্বল ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের সম্বল ঢের বেশি ছিল। তিনি কেন যে পাঁচালিকারদের রীতি অনুসরণ করিতেন—তাহা বুঝা যায় না। ভারতচন্দ্রের রচনায় অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য্য ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার অভাব শব্দালঙ্কারের দ্বারা পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আনারস কবিতাটির আরম্ভ অতি সুন্দর, তার পর আনারসের 'আনা' কথাটি লইয়া এতই বাড়াবাড়ি করিলেন যে কবিতাটি সর্বাঙ্গসুন্দর পদ্যও হইয়া উঠিল না।

এইরূপ হেমন্তের খাদ্য কবিতায় কই ও কুল লইয়া বাড়াবাড়ি হইয়াছে। যেখানে যেখানে তিনি শব্দালঙ্কারের সংযত কিংবা সুবিবেচিত প্রয়োগ করিয়াছেন সেখানে সেখানে বাক্য সরস ও স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সেইরূপ কয়েকটি বাক্য—

১। গুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে।

২। সাত পাত ভাত মারি ভ্যাভ্যা রব শুনে।

৩। বিবিজান চলে যান লবেজান করি।

৪। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।

৫। কৃষকের মহানন্দ আশার সুসার
শস্যশিরে দৃশ্য ভাল উষার তুষার।
বর্ষ যায় হর্ষ তায় পরিপূর্ণ আশা
ক্ষেত্রে প্রতি নেত্র পাত সুখে করে চাষা।

৬। কলাই থাকিলে ঘরে বালাই কি আর ?

৭। শিশির সময়ে দেখ কৃষীর কুশল
তিসির তরুতে কিবা ফলেছে ফসল ॥

৮। পলিত কুন্তল জাল গলিত দশন।
লোলিত গাত্রের চর্ম্ম স্খলিত বচন।

গুপ্তকবির রচনায় আর একটি দোষ—নিঃশেষ করিয়া বক্তব্য প্রকাশ, ব্যঞ্জনার অবকাশ না রাখা। তাহার ফলে বহু পদ্যই তালিকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। শব্দালঙ্কার অনুপ্রাসের মত অর্থালঙ্কার রূপকেরও ছড়াছড়ি ছিল গুপ্ত কবির কাব্যে।

এক সংসারের সঙ্গেই ভোজবাজি, জাঁতা, সমুদ্র, কানন, সাজঘর, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি কত বস্তুর যে রূপক দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ঈশ্বর গুপ্তের রূপক কোথাও কোথাও শ্লিষ্টরূপক—অধিকাংশ স্থলে ক্লিষ্টরূপক (strained metaphor)।

বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবিকে আদর্শ ভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—রামপ্রসাদ যেমন এদেশে মাতৃভাবে উপাসনার প্রবর্ত্তক, ঈশ্বর গুপ্ত তেমনি ভগবানের পিতৃভাবের উপাসনার প্রবর্ত্তক। খৃষ্টানরা ও ব্রাহ্মরা ভগবানকে পিতৃসম্বোধন করিত। কিন্তু তাহাতে পিতাপুত্রের স্বাভাবিক গভীর বাৎসল্যভাবের পরিচয় ছিল না। গুপ্ত কবির কবিতায় ভক্তির গাঢ়তা ও আকুলতা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। অন্তরের সুগভীর অনুভূতি ব্যতীত এইরূপ রচনা সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে গুপ্ত কবির সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তিনি কেবল কবিতা পড়িয়া নয়, জীবনের আচরণ হইতেও জানিতেন যে তিনি যথার্থই ভক্ত ছিলেন।

আমরা তাঁহার রচনা পড়িয়া বুঝি—তিনি ছিলেন উদাসীন ও অনাসক্ত পুরুষ। ঔদাসীন্য ও অনাসক্তি না থাকিলে কেহ সমাজ সংসারের মধ্যে কূটস্থ থাকিয়া মানুষের সুখদুঃখ উত্থানপতন জয়পরাজয়ে সমভাবে হাসিতে পারেন না। তিনি বেদান্ত পড়িয়াছিলেন—তাহার নিদর্শন বহু কবিতাতেই বর্ত্তমান। এই বেদান্ত তাঁহার জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল—বেদান্তের মধ্যে তিনি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার কবিদৃষ্টির মূলে আছে। এই সৃষ্টি যে জগদিন্দ্রজাল, এ সংসার যে মায়াময় পাঁচ ভূতের খেলামাত্র গুপ্ত কবি বহু কবিতায় তাহা নানাভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন—

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক।
পোষাকের দান মোটা জুতা পাযে তেড়ি ওঠা
কপালে জুড়িয়া ফোঁটা শোভা করে নাক।
বসনে বিচিত্র সাজ কাবায় রঙিন কাজ
শিরে দিলে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখ টাক।
দুনিয়ার মাঝে আজ সব হ্যায় ফাঁক।

গুপ্তকবি ইংরাজি জানিতেন না—জানিলেও জানিতেন কাজচলা-গোছের। তাহার ফলে

ইংরাজি সাহিত্যের ভাবভঙ্গী তিনি বাংলা কবিতায় আনিতে পারেন নাই—কিন্তু তাহাতে একটা লাভ হইয়াছে ইংরাজিতে ভাবিয়া তর্জ্জমা করিয়া তিনি বাংলা লেখেন নাই। অন্যদিকে সংস্কৃতেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল না, তাহার ফলে জটিল সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরও তাঁহার রচনায় নাই। খাঁটি বাংলা ভাষাতেই তাঁহার ভাব অনুভূতির প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। খাঁটি বাঙ্গালীর ভাষা ইহার পর কাব্যে আর মিলিবে না। গুপ্তকবির খাঁটি বাংলাভাষা ও বাচনভঙ্গীর নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি চরণ এখানে তুলিয়া দিই—

১। কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেটভরে খাব থাবা থাবা।

২। উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া
চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া।

৩। ঝোলা গুড় তোলা ছিল শিকের উপরে
তোলা তোলা খেতে দিয়া ফুরাইল ঘরে।

৪। মণ্ডাচোষা দধিচোষা চোসাজল যত
কোষা ধরা গোসাভরা তপেজপে রত।
প্রভাতে উঠিয়া সব মিছে ফুল তুলে,
পূজার আসনে ব'সে মন্ত্র যায় ভুলে।

৫। শিবেরে ঠেকায়ে কলা কলা আগে চায়
খপ ক'রে তুলে নিয়ে গপ ক'রে খায়।

এই ভাষা ব্যঙ্গ রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গুপ্তকবি যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়াই লিখিতেন, বিশেষতঃ রঙ্গ-কবিতায়। পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছেন—ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের মুখে ভাষা যোগাইয়া দিয়া গিযাছেন।*

মধুসূদন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উদ্দেশে একটি সনেট লিখিয়াছিলেন—তাহাতে বলিয়াছিলেন—

এই ভাবি মনে,
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে
তব চিতাভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহশিল্পে গড়ি মঠ রাখে তার তলে ?

ঈশ্বর গুপ্তের কথা সকলে ভুলিয়া গেল বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন—

আছিলে রাখালরাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি, নানা খেলা খেলিলে হরষে
যমুনা হয়েছ পার, তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ?

ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কে ঈশ্বর গুপ্তকে ভুলাইয়া দিল ? কবি নিজেই এজন্য দায়ী। মাইকেলের কবিতা পাইয়া দেশের লোক ঈশ্বর গুপ্তকে ভুলিয়া গেল।

বিদ্যাসাগর

(বাং ১২২৭—১২৯৮)

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মাইকেল বঙ্কিমের মত সাহিত্যস্রষ্টা বলা চলে না—তিনি কাব্যকবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি কিছুই লেখেন নাই। তবু তিনি সাহিত্যিক, কারণ তিনি সৎসাহিত্য পরিবেষণের ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার সীতার বনবাস ও শকুন্তলা ভাবানুবাদ হইলেও অভিনব সৃষ্টিরই মত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দেশবাসীকে বিশেষতঃ বাঙ্গালা লেখকদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা-ত বাঙ্গালীর মাতৃভাষা, তাহার আবার শিক্ষা কি এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার উত্তর এই—বাঙ্গালীরা যে ভাষায় কথা বলিত, সে ভাষায় কোন গদ্যগ্রন্থ রচনা চলিতে পারে তাহা সেকালের লোকের ধারণা ছিল না। সে ভাষায় শব্দসম্পদও খুব বেশি ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালীকে এমন ভাষা শিখাইতে চাহিয়াছিলেন—যাহাতে অক্লেশে গদ্যগ্রন্থ রচনা করা যাইতে পারে। এক হিসাবে এই ভাষা কৃত্রিম ভাষা। বৈষ্ণব কবিদের ব্রজবুলি যেমন ব্রজগীতি রচনার জন্যই পরিকল্পিত, মাইকেলের ভাষা যেমন বীররৌদ্ররসাত্মক বৃহৎকাব্য রচনার জন্য পরিকল্পিত, বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষা তেমনি দেশে ও কালে দূরবর্ত্তী বিষয়ের আলোচনা ও তাহার আবেষ্টনী বর্ণনার জন্যই পরিকল্পিত ভাষা।

বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী গদ্যভাষার সহিত তুলনা করিলেই বিদ্যাসাগরের ভাষার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধ হইবে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের ভাষার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার উপর আর বলিবার কিছু নাই।

"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য পূরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে সে কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু যেমন সমাজবন্ধন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব। কেবল মাত্র জনতার দ্বারা নহে, জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি ও কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নবনব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যিনি এই সেনাবাহিনীর রচনাকর্ত্তা যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হইবে।

বাংলাভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহার শব্দগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন ; গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।* গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্ববতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্যভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।"

বিদ্যাসাগর সাহিত্য-শিল্পী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ভাষাশিল্পী। বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে যে ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা হইত অথবা কথকতা করা হইত তাহাতে শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটা ছিল প্রচুর, কিন্তু ভাবের প্রাধান্য ছিল না, রসের গন্ধও ছিল না। বিদ্যাসাগরের ভাষায় হইল ভাবই প্রধান, ভাষা তাহার বাহনমাত্র। এই বাহন রাজার বাহন গজরাজের মত। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দসমুচ্চয় বাংলা ভাষায় প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এই শব্দ আহরণেও বৈশিষ্ট্য ছিল একই ভাবের প্রকাশক বহু প্রতিশব্দের মধ্যে সুকুমার শ্রুতিমধুর শব্দগুলিই তিনি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। সমাস বিদ্যাসাগরের ভাষাতেও ছিল প্রচুর, কিন্তু সমাসে সুললিত শব্দে শব্দে মিলনের ফলে সর্ব্বত্র বাক্যে একটা লাবণ্যের সঞ্চার হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের ভাষায় সন্ধিবদ্ধ সমাসের সংখ্যা অনেক কম। সন্ধি যেখানে শ্রুতিকটু, সেখানে তিনি সন্ধি বর্জ্জন করিয়াছেন অথবা এমন শব্দদ্বয় নির্ব্বাচন করিয়াছেন যাহাদের সহিত সন্ধি হয় না। ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘিত হইলেও 'সতত সঞ্চরজ্জলধরপটল' না লিখিয়া তিনি 'সতত সঞ্চরমাণজলধরপটল' লিখিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের রচনায় বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ ও বিধেয়াংশের মধ্যে চমৎকার ভাবসামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। ভাষার অন্তরস্থ সঙ্গীতকে তাঁহার কর্ণ সহজেই আবিষ্কার করিয়াছিল, সেজন্য তাঁহার ভাষায় একটা অপূর্ব্ব Rhythmএর সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার সমসাময়িক লেখক অক্ষয়কুমারের গদ্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। অক্ষয়কুমারও সংস্কৃতানুগ ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতেন কিন্তু তাঁহার ভাষায় বিদ্যাসাগরী Rhythm নাই। বিদ্যাসাগরের এই ছন্দঃস্পন্দময়ী ভাষা বঙ্কিম প্রথম জীবনে অনুকরণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে এই ভাষার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই।

---

* গদ্যকবি বিভূতিভূষণ বিদ্যাসাগরের ভাষার ছন্দঃস্রোতের ধ্বনিসামঞ্জস্য (Harmony) অপ্রবুদ্ধ উপভোগের মধ্য দিয়াও কিরূপ উচ্চ সাহিত্যের ধর্ম্ম পালন করে 'তাহা পথের পাঁচালী'র শিশু অপুর কল্পনালীলার বর্ণনাপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক জগতের কোন ব্যাপারের বিবৃতির পক্ষে এভাষা উপযোগী নয়—দেশে ও কালে দূরবর্ত্তী বিষয়ের পক্ষেই ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী। এই ভাষার দ্বারা প্রাচীনকাল ও দূরবর্ত্তী দেশের পরিবেষ্টনীরও সৃষ্টি করা যায়। বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ সংস্কৃত কথা সাহিত্য ও নাট্য সাহিত্যের এবং ইংরাজি আখ্যায়িকা-সাহিত্যের অনুবাদে বা রূপান্তর-সাধনে এই ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদে স্বতই এই ভাষা তাঁহার লেখনীতে আসিয়াছিল—সংস্কৃত সাহিত্যের সুললিত শব্দসমুচ্চয় স্বভাবতই বাঙ্গালা বাক্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। 'সকলভুবন-প্রকাশক ভগবান কমলিনীনায়ক অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে' ইত্যাদি ভাষা আক্ষরিক অনুবাদেরই ভাষা। এই ভাষায় ভারতের প্রাচীন যুগের একটা আবেষ্টনীরও সৃষ্টি হইয়াছে। বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষায় সমাসবন্ধন শিথিল করিয়া তিনি আখ্যায়িকা-বিবৃতির একটা নিদর্শনী রীতি দিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক তিনি নির্বাচন করিয়া তাহাদের আখ্যানাংশের সহিত সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকের পরিচয় সাধন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালীকে সংস্কৃতসাহিত্যপাঠে প্রণোদিত করা। সংস্কৃতের সর্বোৎকৃষ্ট নাটক দুইখানির চমৎকারিতার আস্বাদ দিয়া তিনি বাঙ্গালী জাতিকে সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস ও শকুন্তলা বিবৃতির গুণে অভিনব সৃষ্টিরই মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের কথা লিখিতে হইলে বাক্যে অসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের বর্জ্জন যে কলাশ্রীসম্মত ও যুক্তিযুক্ত তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই যতদূর সম্ভব চলিত বাংলা শব্দ বা বিজাতীয় শব্দ ইহাতে বর্জ্জন করিয়াছেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি কতকগুলি ইংরাজি আখ্যায়িকার অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং ইউরোপের কতকগুলি মনীষীর জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের ভাষাও চলিত ভাষা নয়। চলিত ভাষা তখন পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য ছিল, তাহা গ্রন্থের ভাষা হইতে পারে না বলিয়াই লোকের বিশ্বাস ছিল। ভাষান্তর-সাধনে চলিত শব্দের প্রয়োজন যে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু সংস্কৃত শব্দাবলীর সহিত চলিত শব্দের মিশ্রণ গুরুচণ্ডালিয়া দোষে দুষ্ট হইবে বলিয়া তিনি চলিত শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দ বর্জ্জন করিয়াছেন। বাংলার চলতি গতের (Idiom) ভাবপ্রকাশদক্ষতা তিনি অস্বীকার করিতেন না, কিন্তু বাক্যে চলতি গৎগুলিকে তিনি স্থলে স্থলে মার্জ্জিত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতেও ভাবের প্রকাশ হইয়াছে—কিন্তু চলতি গতের নিজস্ব শক্তি পাওয়া যায় নাই।

বিদ্যাসাগরের পরে বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যরচনায় সংস্কৃত শব্দের পংক্তিতে চলতি শব্দ বসাইতে সুরু করিয়াছিলেন—এমন কি চলতি গৎগুলিকেও সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সেজন্য বঙ্কিম ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের 'শবপোড়া-মড়াদাহের দল' বলিয়া উপহসিত হইতে হইয়াছিল।

লোকশিক্ষা ও সাহিত্যরস-পরিবেষণ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগরকে বিচারসভায় অবতরণ করিতে হইয়াছিল। বিচারসভার বাদানুবাদে ও সমাজসংস্কারের প্রসঙ্গে তাঁহাকে রচনায় যুক্তিমূলক ক্রমও অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ এই অমূল্য গ্রন্থ দুই

খানি বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থ। এই বই দুইখানিতে বিদ্যাসাগর যে রচনাশৈলীর অনুসরণ করিয়াছেন—তাহা সীতার বনবাস শকুন্তলার রচনাশৈলী হইতে স্বতন্ত্র।

বিদ্যাসাগর মহাশয় শেক্সপীয়রের Comedy of Errors নামক প্রহসনখানির আখ্যান-ভাগকে বাঙ্গালায় উপকথার রূপ দান করিয়াছিলেন। ফলে ভ্রান্তিবিলাস অনুবাদ মাত্র না হইয়া অভিনব সৃষ্টির রূপ ধরিয়াছিল। কিন্তু সীতার বনবাস বা শকুন্তলার মত ইহা আদৃত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ হাস্যকৌতুক-রসসৃষ্টির ভাষা তিনি নির্ব্বাচন করিতে পারেন নাই। এই রস শূদ্ররস, বিপ্ররসের ভাষায় শূদ্র রসের প্রকাশ হয় না। সংস্কৃত নাটকেও এই রস প্রাকৃত ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যঙ্গার্থই যেখানে ব্যঙ্গকৌতুকের দ্যোতনা করে সেখানে ভাষার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অনুপযোগী নয়—সেজন্য Aesop's Fablesএর অনুবাদ বিদ্যাসাগরের নিজস্ব ভাষায় অসমীচীন বা অসঙ্গত হয় নাই।

বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহে অনুসৃত রচনাশৈলীই বাংলাদেশে প্রবন্ধরচনার আদর্শ শৈলীরূপে বিদ্বজ্জনের দ্বারা গৃহীত ও অনুসৃত হইয়াছিল। ইহাতে বিদ্যাসাগরের প্রাক্তনী রচনাশৈলীর অলঙ্করণ, অতিভাষণ, তারল্য, সৌকুমার্য্য, হিল্লোলিত পদবিন্যাস বর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু সত্যপ্রতিপাদনের দৃঢ়তা, বাক্যপরম্পরার সংযমশৃঙ্খলা এই ভাষাকে প্রবন্ধরচনার পক্ষে বিশেষতঃ তত্ত্বের বিচারবিশ্লেষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাষা সরস না হইলেও রুক্ষ নয়, কারণ হৃদয়ের স্পর্শ যুক্তিপরম্পরার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে। শাস্ত্রের বিচার করিতে করিতে যখন লেখক দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহার চারিপাশে চাহিয়াছেন— তখন তাঁহার ভাষা পণ্ডিতী আভিজাত্য ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়াছে।

বহুবিবাহ হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিই—

"কন্যার জননী অথবা বাটীর গৃহিণী একটি ছেলে কোলে করিয়া পাড়ায় বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন—অনেক দিন পরে কাল রাত্রে জামাই আসিয়াছিলেন, হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকালে কোথায় কি পাব, ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারি নাই, অনেক বলিলাম এক বেলা থাকিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও। তিনি কিছুতেই রহিলেন না; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না, সন্ধ্যার পরেই অমুক গাঁয়ের মজুমদারদের বাড়ীতে একটি বিবাহ করিতে হইবেক পরে, অমুক দিন অমুক গ্রামে হালদারদের বাড়ীতেও বিবাহের কথা আছে, যদি সুবিধা হয় আসিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর-ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিলাম—ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন, তারা জামাইএর সঙ্গে খানিক আমোদ আহ্লাদ করুক। একলা যেতে পারিব না বলিয়া ছুঁড়ী কিছুতেই এল না। এই বলিয়া সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার জামাই এলে মা তোরা যাস্ ইত্যাদি। এইরূপে পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া জামাতার আগমনবার্ত্তা কীর্ত্তন করেন।" অবাঞ্ছিত সংসর্গে কুলীন কন্যার গর্ভসঞ্চারের আবরণী হিসাবে দৃষ্টান্তটি উল্লিখিত হইয়াছে।

বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষাও বিদ্যাসাগরের,—এই ভাষাও বিদ্যাসাগরের। ইহাতে কি

প্রমাণ হয়? যেমন বিষয়বস্তু ও তাহার আবেষ্টনী, ভাষা তদনুরূপ হইবে বিদ্যাসাগর তাহা যে বুঝিতেন না তাহা নয়। তবে সাধারণতঃ তিনি বর্ত্তমান জগতের কথা বেশি লেখেন নাই, বলিয়া তাঁহার রচনাশৈলী চলতি ভাষার কাছাকাছি আসে নাই।

এই পুস্তক দুইখানিতে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা অপেক্ষা চরিত্রই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের প্রেরণা পাইয়াছিলেন হৃদয় হইতে, মস্তিষ্ক হইতে নয়। বালবিধবার বেদনায় ও কুলীনকন্যাদের লাঞ্ছনায় তাঁহার বিরাট হৃদয়কে বিচলিত ও বিগলিত হইয়াছিল। যিনি আত্মমর্য্যাদা ও জাতীয় মর্য্যাদারক্ষার জন্য অসাধারণ দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন—তিনিই আবার অসহায়া নারীর বেদনায় বালকের মত কাঁদিতেন। বিধবাবিবাহপ্রচলন ও বহু বিবাহ নিরোধের জন্য তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যাসাগর পরের দুঃখে ব্যথিত হইলে কেবল হাহুতাশ করিয়া অথবা সাহিত্যে তাহার বাণীরূপ দিয়াই নিবৃত্ত হইতেন না। তিনি কেবল সাহিত্যিক হইলে তাহাতেই পর্য্যবসান হইত—কিন্তু তিনি ছিলেন যেমন প্রেমপ্রবণ তেমনি কর্ম্মবীর। পরদুঃখ মোচনের জন্য তিনি সর্ব্বস্বপণ করিতে রাজী হইতেন।

আজ বিধবা বিবাহ যে অসঙ্গত নহে—তাহা শিক্ষিত লোক মাত্রই জানেন এবং বহু বিবাহ ধীরে ধীরে যুগধর্ম্মের তাড়নায় রহিত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর যখন আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন বিধবাবিবাহের কথা শুনিয়া সকলেই চমকাইয়া উঠিত এবং কুলীন কুপুরুষগণ তখন বহু বিবাহের সুযোগ ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া বহু বিবাহকারী কুলীনপুঙ্গবদের বিবাহের সংখ্যা তালিকাবদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছিলেন তখনও এই কুপ্রথার প্রাধান্য কতটা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে কুলীন সন্তান হইয়া কুলীন সংসারের যাবতীয় কদাচার প্রকাশ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য দেশময় তাঁহার কত যে শত্রু হইয়াছিল —তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই সত্যসন্ধ বীরপুরুষ কিছুতেই বিচলিত হ'ন নাই।

তখনকার দিনে সমাজ এমনি অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল যে, সমাজের লোকের বিবেক ও বিচারবুদ্ধির কাছে আবেদন করিয়া কোন ফল হইত না। সেজন্য বিদ্যাসাগরকে সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য সত্যের সমর্থন করিতে হইয়াছে। দেশের অগ্রগণ্য পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় যুক্তিকে শাস্ত্রের শস্ত্রেই ক্ষতবিক্ষত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিল। ফলে, বিদ্যাসাগরকে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা তাহাদের সঙ্গে যুঝিতে হইয়াছে। নারীর দুঃখ মোচনের প্রেরণার জন্ম তাঁহার হৃদয়ে, কিন্তু যুঝিতে হইয়াছে তাঁহার মস্তিষ্ককে। তাঁহার মত হৃদয় এই হতভাগ্য সমাজের লোকদের থাকিলে এ সংগ্রাম করিতে হইত না।

আজ এই গ্রন্থ দুইখানির কোন ব্যাবহারিক মূল্য নাই। বিধবাবিবাহ ন্যায়োপেত ইহা প্রমাণ করার জন্য আজ শাস্ত্রের শ্লোক উৎকলনের প্রয়োজন নাই। তবু যে বিধবা বিবাহ চলে না—তাহার অন্য কারণ আছে। যে দেশে কুমারীর বিবাহই শক্ত সে দেশে বিধবার বিবাহ কি করিয়া চলে? বিধবার বিবাহ আরো ব্যয়সাপেক্ষ। বিধবাকে পুনরায় বিবাহ করিতে হইলে নিজেই পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিতে হয়। নগরের সমাজে এইরূপ ২।৪টির দৃষ্টান্ত পাওয়া

যাইতেছে—কিন্তু পল্লীসমাজে আজিও বিধবার সে সাহস ও সুবিধা নাই। মৃতদার ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে হইলে বিধবা বিবাহ করিতে হইবে এই আইন না হইলে এ প্রথা চলা কঠিন। আর বহু বিবাহ শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয় মুসলমানদের মধ্যেও উঠিয়া গিয়াছে। আজ প্রয়োজন না থাকিলেও বিদ্যাসাগরের সময়ে এই আন্দোলনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনে ফলও হইয়াছিল—অন্ততঃ ইহা সেকালের শিক্ষিত লোকের মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল।

ব্যাবহারিক মূল্য না থাকিলেও এই গ্রন্থদ্বয়ের অন্য মূল্য আছে। এই গ্রন্থদ্বয়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্র, জীবনব্রত ও কর্ম্মজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের সমাজের লোকের চরিত্র ও মনোবৃত্তিরও এই বই দুইখানি ইতিহাস। যদিও গ্রন্থ দুইখানি যুক্তিবিচারের পরম্পরা অবলম্বন করিয়াছে—তবু ইহাদের বক্তব্য হৃদয়াবেগ হইতে বঞ্চিত নয়। বিদ্যাসাগরের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ যুক্তিগুলিকে বলীয়ান করিয়াছে। হতভাগিনী বঙ্গনারীর জন্য বিদ্যাসাগরের অধীর উৎকণ্ঠা, আগ্রহ ও আকুলতা সমগ্র গ্রন্থ দুইখানির ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে বিদ্যমান। ফলে এই গ্রন্থ দুইখানি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

যুক্তিমূলক নিবন্ধ রচনার রীতির প্রবর্ত্তক রামমোহন। বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার ও ভূদেব এই রীতিকে বহুদূর আগাইয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থ দুইখানি শকটের তুরঙ্গযুগলের মত অতি দ্রুতগামী বাহন। রামমোহন এদেশে স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তক, বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থ দুইখানির মধ্য দিয়া স্বাধীন চিন্তার ধারাকে বহুদূর আগাইয়া দিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদন

মাইকেল গুপ্তকবির পরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু গুপ্তকবির প্রভাব মাইকেলের রচনায় পাওয়া যায় না। মাইকেল বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতনযুগের প্রবর্ত্তন করিলেন। মাইকেলের সাহিত্য-সাধনা ইউরোপীয় শিক্ষার প্রথম ফল। ইউরোপীয় সাহিত্য ও পুরাণের প্রভাব খুব বেশী স্পষ্টভাবে মাইকেলের রচনায় পরিস্ফুট। মাইকেল ভাব, ভঙ্গী ও গঠন-শৃঙ্খলা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে এবং ভাষা, বিষয়বস্তু ও অনেক স্থলে আলঙ্কারিকতা সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণ হইতে আহরণ করিয়াছেন।

বহুদিন পরে আবার সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও সাক্ষাৎভাবে বাংলা কাব্যে সঞ্চারিত হইল। মাইকেল নানারসপুষ্ট আয়ত কাব্য রচনা আরম্ভ করিলেন—কোন' দেব-দেবীর স্বপ্নাদেশে নয়—কোন রাজা মহারাজা বা প্রতিপালকের আদেশে বা মনোরঞ্জনার্থ নয়—কোন' দেবতার মহিমাকীর্ত্তন বা কোন' ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠার জন্য নহে—কোন' সম্প্রদায়ের মর্ম্মকথা প্রচারের জন্য নহে। আপনার অন্তরের প্রেরণায়, রস-সৃষ্টির জন্য কাব্য-সাহিত্যের নিজস্ব স্বতন্ত্র মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি কাব্যরচনা শুরু করেন।

ইঁহার রচনাভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। মিত্রাক্ষরের বেড়ী ভাঙ্গিয়া ১৪ অক্ষরের পয়ার-পংক্তিকে ইনি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কল্লোলিত গতি দিয়াছেন—তাহা অপূর্ব্ব ও অচিন্ত্য-পূর্ব্ব। রস-বৈচিত্র্যময় মহাকবিতা রচনা, কাব্যে নাটকীয়তার প্রবর্ত্তন, পাশ্চাত্য ধরণের গীতি-কবিতা-রচনা, ছন্দে যতি, গতি, মাত্রা ও ছেদের বৈচিত্র্য-সাধন, সনেট-রচনা, পত্রচ্ছলে কাব্যরচনা, কাব্যের ভাষায় পৌরুষশ্রী ও আভিজাত্য সৃষ্টি, অর্থালঙ্কারের পারিপাট্য ইত্যাদি ইঁহার অমর কীর্ত্তি। বঙ্গকাব্য-সাহিত্যে ইনিই প্রথম পৌরুষ তেজস্বিতার সঞ্চার করেন। বাংলা ভাষার যুক্তাক্ষরে কি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে তাহা ইঁহারই কাব্যে প্রথম উপলব্ধ হয়। ইনি বহু মহাপ্রাণাক্ষরময় সংস্কৃতশব্দকে বাংলা কবিতায় স্থান দিয়া বাংলা কবিতার ভাষাকে ওজস্বিনী করিয়াছেন। লাস্তে যে মাধুর্য্য আছে তাহা ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবি বেশ বুঝিতেন,—কিন্তু তাণ্ডবেও যে একটা শ্রী আছে তাহা তিনি মেঘনাদবধে দেখাইয়াছেন। ঠুংরি টপ্পার আসরে তিনি পাখোয়াজ বাজাইয়া ধ্রুপদ গাহিয়াছেন।

মাইকেলের মেঘনাদবধ মহাকাব্য নয়,—খণ্ডকাব্য, বরং নাট্যকাব্য বা মহাকবিতা বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়। কারণ, কবি ইহাতে নাটকীয় কলাসৌষ্ঠবের দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন। যে ঘটা, ছটা, সমারোহ ও ভাবোচ্ছ্বাস নাটকেই মানায় ভাল—এই কাব্যে তিনি তাহারই প্রাধান্য দিয়াছেন। কবির নিজের কৃত্রিমতাপূর্ণ বর্ণনাগুলিও বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকৃতোক্তিগুলি বাদ দিলে ইহাতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পাত্রপাত্রীর মুখের কথা। এই কথাগুলি নাটকেরই অঙ্গ। কবি রচনায় আবেগের সঙ্গীত অপেক্ষা উচ্ছ্বসিত বক্তৃতাকেই অধিকতর সমাদর করিয়াছেন। কবির কতকগুলি বর্ণনা শব্দচ্ছটায় অঙ্কিত দৃশ্যপটমাত্র।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে মহাকাব্যের যে লক্ষণ আছে—মাইকেল তাহা অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার কাব্য পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত। তাই বলিয়া তিনি আরিস্টটলের আদর্শও অনুসরণ করেন নাই। সব দিক হইতে দেখিলে, সর্গবদ্ধ হইলেও মেঘনাদবধকে রবীন্দ্রনাথের মতে মহাকাব্য বলা যায় না। তাঁহার মতে মহত্ত্ব ছাড়া মহাকাব্য হইতে পারে না। উহাতে চরিত্রের বা বর্ণিত বিষয়ের মহত্ত্ব নাই। কবি রাম-লক্ষ্মণকে করিয়াছেন প্রতিনায়ক, বাল্মীকি-সৃষ্ট মহৎ চরিত্রকে তিনি রাক্ষসের কাছে ক্ষীণ ও হীনপ্রভ করিয়াছেন। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎই কবির কাব্যে বীর নায়ক। তাহাতেও কাব্যের দিক হইতে ক্ষতি হইত না—যদি ঐ চরিত্র দুটি সম্পূর্ণ পশুবলের গৌরবেই গৌরবান্বিত না হইত। ফলে, মেঘনাদবধে পশুবলের কাছে নৈতিকবল ও ধর্ম্মবলকে হীনপ্রভ করা হইয়াছে। আদর্শের মহত্ত্ব না থাকায় মেঘনাদ মহাকাব্য হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—মাইকেলের রচিত কাব্য লোকে কৌতূহলবশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গালা ভাষার অনন্যপূর্ব্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানি বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কত দিন?

মেঘনাদবধে কবি গ্রীসীয় মহাকাব্যের অনেক অঙ্গ,—যেমন—কাব্যলক্ষ্মীর আবাহন, নিয়তির অমোঘ নির্দেশস্বীকার, হিন্দু দেবদেবীর গ্রীক দেবদেবীর রূপপরিগ্রহ, দেবদেবীর ছদ্মবেশধারণ, গ্রীক আদর্শে নূতন দেবদেবীর পরিকল্পনা, প্রমীলার রণরঙ্গিণীরূপ, মায়াজাল-বিস্তার, রামচন্দ্রের পিতৃলোকদর্শন, গ্রীক সৎকার-পদ্ধতি, যুদ্ধবর্ণনা, স্বর্গ-নরকবর্ণনা ইত্যাদির সন্নিবেশ করিয়াছেন বলিয়া লোকে ইহাকে মহাকাব্যশ্রেণীতে স্থান দিয়াছিল। মহত্ত্ব ছাড়া মহাকাব্য হয় না তাহাও মাইকেল যে বুঝিতেন না তাহা নয়। গ্রীক আদর্শ অনুসারে পশুবলের গৌরব ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যের ঘটাকেই তিনি মহত্ত্ব মনে করিয়াছিলেন। হেলেন যেভাবে ট্রয়ে নীত হইয়াছিল, সীতা যদি সেইভাবে লঙ্কায় নীত হইত—তাহা হইলে রাক্ষসদের পরাক্রমের মধ্যেও একটা মহত্ত্বের সৃষ্টি হইতে পারিত। হোমারের আদর্শের পূরাপূরি প্রয়োগের সুযোগ রামায়ণের কাহিনীতে নাই—অথচ কবি হোমারের আদর্শ কোথাও ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

মাইকেল মহাকাব্যের ঢঙে কাব্য লিখিতে গেলেও তাঁহার বাঙ্গালা মনটি ছিল গীতি-কবিতারই মন। মেঘনাদবধের অনেক অংশই গীতি-কবিতা। যে যে অংশে গীতি-কবিতার মাধুর্য্য ফুটিয়াছে, মেঘনাদবধের সেই সেই অংশই হইয়াছে চমৎকার। মাইকেল কত যত্ন করিয়াই ইতালীয় ও গ্রীক কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নরক বর্ণনা করিলেন—তাহা কাহারও প্রাণস্পর্শ করিল না, কিন্তু স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে লিখিলেন সীতা-সরমার কথা—উহা গীতি-কবিতার মাধুর্য্য লাভ করিয়া চমৎকার হইল।

মেঘনাদবধের প্রকৃতিবর্ণনায় প্রাণ নাই—চরিত্রের উচ্চাদর্শ নাই—ভাষার কৃত্রিমতা অতিরিক্ত, আবেগের সুর বহুস্থলেই খণ্ডিত হইয়াছে—এমনই কত ত্রুটীই সমালোচকরা ধরিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, অনেকের ধারণা, ইহা যেন কতকটা অসম্পূর্ণ—কবিকল্পনা সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবার আগেই যেন কবি ইহা রচনা করিয়াছিলেন—পরিপূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনার

আগে ইহা যেন একটা Experiment. তবু মেঘনাদ বধের তুলনা নাই। ফতেপুর সিক্রীর রাজ-প্রাসাদ আকবর সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই—এখন তাহা ভগ্নদশায়, তবু সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আজিও তাহার তুলনা নাই। মেঘনাদ বধ সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়।

মাইকেলকে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি করিতে হইয়াছে—কাব্যের ভাব, আদর্শ, ভাষা, ভঙ্গী, আকৃতি-প্রকৃতি সবই নূতন। এই অভিনব সৃষ্টি করিতে তাঁহাকে এক হাতে ভাঙ্গিতে হইয়াছে—আর এক হাতে গড়িতে হইয়াছে। ভাঙ্গার কাজ সম্পূর্ণই হইয়াছিল—গড়ার কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কবি হিসাবে মাইকেলের স্থান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার মত এমন গঠন-শিল্পী জগতে অতি অল্পই জন্মিয়াছে। জঞ্জাল-স্তূপ সরাইয়া, জীর্ণ গৃহ ভাঙ্গিয়া, দেশদেশান্তর হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া শূন্য প্রান্তরের উপর এরূপ অভিনব সৃষ্টি গড়িয়া তুলিবার প্রতিভা এদেশে কখনও কাহারও ছিল না। এ সৃষ্টি যেন মাইকেলের বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থজয়ী লঙ্কার রাজপ্রাসাদ।

রোমক জাতি যখন গ্রীকদের দেশ জয় করিল এবং গ্রীকগণ রোমকদের মনোভূমি জয় করিল—তখন Cultural Conquestএর ফলে রোমক-সাহিত্যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। সেই সময় রোমক-সাহিত্যকে গ্রীকছাঁচে ঢালিয়া Naevius ও Enius যাহা করিয়াছিলেন—বাঙ্গালা কাব্যকে বিলাতীছাঁচে ঢালিয়া মাইকেল তাহাই করিয়াছেন। মাইকেলের প্রতিভায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রথম মিলন ঘটিয়াছে। সেই মিলনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হইবার অবসর পায় নাই। সেজন্য মাইকেলের কাব্যে বিদেশীয় উপাদান উপকরণগুলি বড় স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে—অনেকস্থলে Mechanical mixture বলিয়া মনে হয়—Organic development বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে—প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রথম মিলনের পক্ষে মাইকেলের কাব্য অদ্ভুত সৃষ্টি। আজ যে বঙ্গভাষা পাশ্চাত্য প্রভাবে এত সমৃদ্ধ সে সমৃদ্ধির সূত্রপাত হইয়াছে মাইকেলের কাব্যে। আজ যে সাহিত্য-গৌরবের কোজাগর পৌর্ণমাসী. মাইকেলের মেঘনাদ তাহার প্রতিপদ্ দ্বিতীয়া নয়—একেবারে নবাধ্যায়ের মহানবমী। ইহা বড় কম গৌরবের কথা নয়।

মাইকেলের কাব্যে হোমার ভার্জিল ট্যাসো দান্তে মিল্টন ইত্যাদি ইউরোপীয় কবির প্রভাব যথেষ্টরূপ বর্ত্তমান। পাশ্চাত্য প্রভাব প্রচুর থাকিলেও মাইকেলের কাব্য এ প্রভাবে অভিভূত হয় নাই, মাইকেল জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেন নাই। বাঙ্গালীর ভাব-প্রবণতা, বাঙ্গালী নারীত্বের গৌরব ও মাধুরী, বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের সুখ দুঃখ, বাঙ্গালী কবির মণ্ডনশিল্প, আলঙ্কারিকতা ইত্যাদি তাঁহার কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাইকেলের বাঙ্গালী হৃদয় তাঁহার সনেটে ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর বৃন্দাবনলীলা ও আগমনীবিজয়ার কারুণ্য-মাধুরী তাঁহার বিজাতি-বিজিত হৃদয়কে বিগলিত করিত।

বাঙ্গালা দেশের কবিগুরু জয়দেব। ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলাম্বিত বাঙ্গালা

কবিতায় পদলালিত্য ও পদমাধুর্য্যের অভাব নাই। সবই যেন নারীধর্ম্মোপেত, কোথাও পৌরুষ সবলতা দেখা যায় না। বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালী কবিদের হাতে লতিকা-বৃত্তি লাভ করিয়াছে—বিরাট মহীরুহের দৃঢ়তা তাহার নাই। তাই মাইকেলের কাব্যে বাঙ্গালা ভাষার ওজস্বিতা, তেজস্বিতা ও সবলতা দেখিয়া গৌড়জন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা যেন ভাবের কুঞ্জলতা ত্যাগ করিয়া মহাভাবের মহাবণ্যে প্রবেশ করিল।

মাইকেলের মেঘনাদবধ, তিলোত্তমাসম্ভব ও বীরাঙ্গনা কাব্যের ছন্দের নাম দেওয়া হইয়াছে—অমিত্রাক্ষর। ইহা নেতিবাচক নাম—ইহার উপযুক্ত নামকরণ বাঙ্গালায় এখনও হয় নাই। মিল না থাকিলেই এই ছন্দ হয় না। মাইকেল প্রত্যেক চরণে চরণে মিল দেন নাই—কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেক মিল দিয়াছেন—সে মিলকে বাঙলায় অনুপ্রাস বলে। যাহাই হউক এ মিলটাও এ ছন্দের পক্ষে বড় নয়। ছন্দঃস্পন্দ ও ছন্দোহিল্লোলটাই বড় কথা। ছন্দঃস্পন্দকে ইংরাজিতে বলে rhythm ইহা ইংরাজি ও সংস্কৃত কবিতার প্রধান ঐশ্বর্য্য। এই ছন্দঃস্পন্দ সংস্কৃত কবিতার মিলের অভাবকে শতগুণে পূরণ করিয়াছে। যে দেশে কবিতার যুক্তাক্ষরগুলিকে বিপ্রকৃষ্ট (যেমন—তৃপ্তি—তিরপিতি, ব্যক্ত—বেকত) করিয়া লইবার প্রথা ছিল, সেই দেশে মাইকেল ছন্দে অজস্র যুক্তাক্ষর প্রয়োগ করিয়া এই ছন্দঃস্পন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা স্বরকে উঠাইতে নামাইতে বাধ্য করে—তাহার ফলে একটা অপূর্ব্ব নর্ত্তিত সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। আর একটি ঐশ্বর্য্য ছন্দোহিল্লোল। প্রত্যেক চরণের শেষে মিলের খাতিরে থামিতে হয় না—প্রত্যেক চরণেই কবি এক একটি ভাবের অবসান ঘটান নাই। একটি তরঙ্গ যেমন রাজহংসকে তরঙ্গান্তরে চালিত করে তেমনি করিয়া তিনি ভাবকে ছত্র হইতে ছত্রান্তরে অবাধে লইয়া গিয়াছেন। যেখানে ভাবাবসান হইয়াছে, সেখানে ছেদ পড়িয়াছে। পড়িবার সময় ছেদ ও যতি উভয়ের মর্য্যাদা রাখিয়া পড়িতে হয়, তাহার ফলে এই অপূর্ব্ব হিল্লোলের সৃষ্টি হয়।

কবির কল্পনার বিরাটতাও লক্ষ্যের বস্তু। কবির কল্পনা বিরাট রসলোকের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা সম্পূর্ণ শূন্যে। স্বর্ণলঙ্কা সম্পূর্ণ কবিকল্পনার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির জন্য কবির কল্পনাকে বিরাট বলিতেছি না। কবির কল্পনা স্বর্গ, নরক মর্ত্ত্য, দেবলোক, নরলোক, রক্ষোলোক সর্ব্বত্র বিদ্যুদ্বেগে বিচরণ করিয়াছে। কবির কল্পজগতে দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নর, বানর সমস্ত এক গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। একটি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে কবির কল্পনা হস্তামলকবৎ ধারণ করিয়াছে।

কবি বলিয়াছেন :—'রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' মধুর এই রসচক্র সত্যই মধুচক্র। কবি গ্রীস, ইতালি, ইংলণ্ড ও ভারতের কাব্য-কাননের যত মধু বিন্দু বিন্দু করিয়া আহরণ করিয়া এই মধুচক্র রচনা করিয়াছেন। মেঘনাদবধ এই ভাবে তিলে তিলে উত্তম হইয়া উঠিয়াছে। ইহারও নাম 'তিলোত্তমাসম্ভব' দিলে দোষ হইত না। গৌড়জন এই কাব্যে জগতের মহাকবিদের পুঞ্জীভূত মাধুরীর আস্বাদ পাইয়া ধন্য।

কবির চরিত্রাঙ্কনও অপূর্ব্ব। কবি রাম লক্ষ্মণকে দেবতা বানান নাই, সাধারণ মানুষই করিয়াছেন। মানুষের দুর্ব্বলতার সঙ্গে মানবহৃদয়ের লালিত্য-মাধুর্য্য এ চরিত্রে প্রকট হইয়াছে। দেবযক্ষগন্ধর্ব্বজয়ী রাক্ষসকে তিনি বিরাট পুরুষ করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।* সাধারণ মানুষের বিপরীত মূর্ত্তি দিয়াই তাহাকে রচনা করিয়াছেন। মহাকাব্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক, খণ্ডকাব্যের দিক হইতে তাহাতে কোন দোষ হইয়াছে মনে হয় না। সংস্কারমুক্ত মনে বিচার করিলে রসোপভোগে বাধা জন্মে না। বাল্মীকির সৃষ্টি ও প্রচলিত আদর্শ ভুলিয়া মধুসূদনের সৃষ্টিতেই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

কবির কাব্য একখানি ট্রাজেডি। মহাষ্টমীর ছাগ বলিদান দিয়া অথবা একটা বন্য শূকর শিকার করিয়া ট্রাজেডির সৃষ্টি হয় না। বিরাটের পতন হইলেই আমাদের চিত্ত বিস্ফারিত হয়। যে-জন আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা সহানুভূতির বিস্ময়বিমুগ্ধ অর্ঘ্যলাভ করিয়াছে, তাহার পতন হইলেই খাঁটি ট্রাজেডি হয়। বিয়োগান্ত কাব্যরসসৃষ্টির প্রয়োজনেই রাবণ-মেঘনাদ বিরাট হইয়াছে, বিভীষণ-লক্ষ্মণ হীনতর হইয়াছে। মহাকাব্যের দিক হইতে ইহার সার্থকতা না থাকিলেও নাট্যকাব্যের দিক হইতে ইহার সার্থকতা আছে। কবি বীরাঙ্গনার গৌরবের সহিত সতীর তেজস্বিতার সংযোগে হেক্টর-বধে আন্দ্রোমাখে ও ট্যাসোর ক্লোরিন্দার ছায়ানুসরণে প্রমীলার সৃষ্টি করিয়াছেন। কবির বীরবাহুজননী বীরপুত্রের বীরমাতা। চিত্রাঙ্গদার উক্তি বীরাঙ্গনা কাব্যে স্থান পাইতে পারিত। বঙ্গ সাহিত্যে এরূপ চরিত্র অভিনব। তাই বলিয়া কবি সীতা সরমাকে অবহেলা করিতে পারেন নাই—সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য ও শুচিতার সমন্বয়ে তিনি এই দুটী নারীচরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন—আজিও সীতার চরণতলে সরমা তুলসীর মূলে স্বর্ণ দেউটীর মত বঙ্গের সাহিত্যাঙ্গনে জ্বলিতেছে।

মাইকেল রাক্ষসরাক্ষসীর চরিত্রাঙ্কনে অপূর্ব্ব সাহস ও তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন। গতানুগতিকতায় আমাদের দেশের সাহিত্যের প্রগতি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। দেশের কবিকল্পনা বিদ্যাসুন্দরকে বেষ্টন করিয়া মুখে কালী-মহিমা এবং মনে কন্দর্প-মহিমা প্রচার করিতেছিল। চোখে ঠুলিবাঁধা কলুর বলদ যেমন সারাদিন চলিয়াও এক পা অগ্রসর হয় না, মামুলী ধারায় ঘুরপাক খাইয়া বঙ্গসাহিত্যের গতি তেমনি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এই গতানুগতিকতার যুগে বিদ্রোহের বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হইল মেঘনাদে, মাইকেলের পৌরুষ-দৃপ্ত-কণ্ঠ হইতে। এই নির্ঘোষ কাব্যের ভাষার ছন্দ, ভঙ্গী, প্রকৃতি, ভাবাদর্শ সমস্তকেই দিল নূতন রূপ। বিদ্রোহীর কাছে কে সর্ব্ববিষয়ে যথাযথতা প্রত্যাশা করে? কবির ভাবাদর্শ দেশের লোকের প্রীতিকর হয় নাই, চির প্রচলিত আদর্শে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া। মাইকেলের পরম ভক্ত জীবনীকার

* "People here grumble and say that the heart of the Poet is with the Rakshasas. And that is the real truth. I despise Rama and his rabble, but the idea of Ravana elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow."

—*Michael M. S. Dutt.*

যোগীন্দ্রনাথ বসুও রাক্ষসপক্ষপাতিত্বের জন্য মাইকেলকে দোষী করিয়াছেন।* কাব্যের রসের দিক হইতে কবির কোন ত্রুটী হইয়াছে আমরা মনে করি না। যদি ত্রুটী হইয়াই থাকে, তবে মনে করি যাঁহাকে এক হস্তে চূর্ণ—আর এক হস্তে সৃষ্টি দিয়' পূর্ণ করিতে হইয়াছে, তাঁহার চ্যুতিত্রুটি হইবেই। যাহাই হউক, বিদ্রোহের যে প্রয়োজন্ হইয়াছিল এবং মাইকেলের বিদ্রোহ যে বঙ্গসাহিত্যকে শক্ত হস্তীর বল দান করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

মেঘনাদ বধ এপিক হয় নাই—নাটক ও গীতিকবিতাব মিশ্রণে এক প্রকারের নূতন ধরণের কাব্যেরই রূপ ধরিয়াছে। যাহাই হউক—ইহা অপূর্ব্ব। মাইকেলের সংকল্প ছিল 'বীর রসে ভাসি' বীররসাত্মক কাব্য লিখিবেন—তাঁহার সে সঙ্কল্প অশ্রুবন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। বীররস কারুণ্য রসে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মত মহাকাব্য রচনার 'কল্পনাটি হাজার গীতে ফাটিয়া পড়ে নাই,' কারুণ্যপ্রধান বহুরসাত্মক নাট্যকাব্যের রূপ ধরিয়াছে। গ্রীক পরিচ্ছদ পরিয়া কবি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন—কিন্তু অভিনয় করিয়াছেন শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হৃদয়ের। বিদ্রোহী হইয়াও তিনি বাঙ্গালার মর্ম্ম ও বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন নাই—এসকল কথা নিন্দার নয়, প্রশংসারই যোগ্য।

দেশীয় কবিদেব মধ্যে মাইকেলের প্রধান সম্বল ছিল কাশীরাম ও কৃত্তিবাস।

মেঘনাদবধের প্রারম্ভের ইঙ্গিত মাইকেল কৃত্তিবাস হইতেই পাইয়াছেন। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ গোচর।
বীরবাহু পড়ে বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥
শোকের উপরে শোক হইল তখন।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥"

বাল্মীকির রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ-বধে রাবণের শোকের বর্ণনা আছে—কৃত্তিবাসের রামায়ণে নানা স্থলেই রাবণের বিলাপ আছে। মাইকেল বিলাপ-বর্ণনায় কৃত্তিবাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

বাল্মীকির রামায়ণে রাবণেব মায়ের নাম কৈকসী, কৃত্তিবাসের রামায়ণে নিকষা। মাইকেল নিকষা নামই গ্রহণ করিয়াছেন।

বাল্মীকির রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের সৈন্য-সামন্তসহ রীতিমত যুদ্ধের কথা আছে—কৃত্তিবাসের রামায়ণেও মেঘনাদ বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে নাই। বাগ্‌যুদ্ধে মাইকেল কৃত্তিবাসেরই অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন।

---

* "………………মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গই কাব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কি জন্য যে মধুসূদন এই সর্গে এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। দুইটি কারণে তিনি এই সর্গে এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রথম, রক্ষোবংশের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ এবং দ্বিতীয়, বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া, হোমরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা। রক্ষোবীরদিগের বীরত্ব চিন্তা করিতে করিতে তিনি এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতিপক্ষগণও যে বীর, সে কথা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন; এবং সেই জন্যই তিনি মহাবীর লক্ষ্মণকে তাদৃশ কাপুরুষের এবং হীনবলের ন্যায় চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসও ইহার অন্যতম কারণ।"

—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (যোগীন্দ্রনাথ বসু)।

রাম-লক্ষ্মণের চরিত্রে ও সীতা-সরমার হৃদয়-বিনিময়ে যে খাঁটি বাঙ্গালী ভাব এবং রাক্ষস-রাক্ষসীগণের চরিত্রে যে স্নেহার্ত্তির ভাব মাইকেলের কাব্যে সুপ্রকট, তাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতেই সংক্রামিত।

সীতাচরিত্র কৃত্তিবাস যে ভাবে বাঙ্গালী নারীর হৃদয়াবেগ দিয়া গড়িয়াছেন, মাইকেল সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। মাইকেল একটি সনেটে কৃত্তিবাসের উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন—ইহা প্রকারান্তরে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন।

বীরাঙ্গনা কাব্যের কাহিনীগুলির অধিকাংশই কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে গৃহীত। নীলধ্বজ-প্রবীর-জনার উপাখ্যান ব্যাসদেবের মহাভারতে নাই। এ উপাখ্যান আছে কাশীরাম দাসের মহাভারতে। জনার বীরাঙ্গনা-চরিত্রের জন্য মাইকেল কাশীরামের কাছে ঋণী। দুর্য্যোধন-পত্নীর নাম ভানুমতী দিয়াছেন কাশীরাম। ভানুমতীর শঙ্কাতুর হৃদয়ের অভিব্যক্তি মাইকেল কাশীরামের মহাভারত হইতেই পাইয়াছেন। কাশীরামের মহাভারতে অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্বের একটি কাহিনী আছে। 'অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' নামক পত্রে সেই পক্ষপাতিত্ব আভাসিত হইয়াছে। পত্রের বিষয়-বস্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল প্রেমিক-প্রেমিকার পরিস্থিতিই মহাভারত হইতে গৃহীত। এই পরিস্থিতিগুলিও কাশীরামের মহাভারত হইতেই গৃহীত বলা চলে।

এইরূপ অনেক স্থলেই কাশীরামের প্রভাব দেখা যায়। মাইকেল তাই শ্রদ্ধাভরে কাশীরামের উদ্দেশে বলিয়াছেন—

"হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।"

মাইকেল ব্যাসদেবের মূল মহাভারত সম্ভবতঃ পড়েন নাই—কিন্তু মেঘনাদের আখ্যান-বস্তুর জন্য তিনি বাল্মীকির রামায়ণের প্রয়োজনীয় অংশ পড়িয়াছেন তাঁহার প্রমাণ আছে। মেঘনাদের মুখের কথাগুলির সহিত বাল্মীকির রামায়ণের মেঘনাদের উক্তির মিল আছে। বাল্মীকির মেঘনাদ বলিতেছেন—

গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ॥

মধুসূদনের মেঘনাদ বলিতেছেন—

শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা।

মাইকেল শ্লোকের অনুবাদ করিতে গিয়া সংস্কৃতের পরঃ এই ১মা বিভক্তিযুক্ত পদটিকেও বাঙ্গালাতেও বিসর্গযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

মেঘনাদের অসামান্য বীরত্বের বর্ণনায় মাইকেল বাল্মীকির সমর্থন পাইয়াছিলেন। এখানে তিনি কৃত্তিবাসের মেঘনাদকে বর্জ্জন করিয়াছেন।

মেঘনাদবধপাঠের ভূমিকা

আমাদের দেশের সাহিত্যে দুইটি রসের প্রাধান্য—একটি আদিরস ও আর একটি করুণরস। বৈষ্ণবকবিতায় ও বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি কাব্যে আদিরসের ছড়াছড়ি। করুণরসও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরহকেই অবলম্বন করিয়া সঞ্চারিত। চণ্ডীমঙ্গলে ও শিবায়নে দারিদ্র্য, মনসামঙ্গলে নিয়তির নির্যাতন ও শাক্তসাহিত্যে মেনকার বেদনা লইয়া করুণরসের কবিতা রচিত হইয়াছিল। হাস্যরসের রচনা মধুসূদনের পূর্ব্বে যাহা পাওয়া যায়, তাহা সুরুচিসঙ্গত নয়—তাহা সাহিত্যের পদবীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ইহা ছাড়া, সাহিত্যে একটা গতানুগতিক ধারা চলিতেছিল—তাহার মধ্যে না ছিল বৈচিত্র্য, না ছিল জীবনী শক্তি।

মাইকেলের পূর্ব্বে বাঙ্গালী সমাজও ছিল কতকগুলি অন্ধ কুসংস্কারে জীর্ণ—বিধিনিষেধের সহস্র ডোরে আবদ্ধ। খাদ্যাখাদ্য-বিচার, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচার, কৌলীন্যের উপদ্রব, বহু-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বৃদ্ধ-বিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি বহু কুপ্রথার আধিপত্য চলিতেছিল। বাঙ্গালীরা ছিল গতানুগতিক, ভীরু, স্বার্থপর, আচারশাসিত, ভাববিলাসী, আত্মপ্রত্যয়হীন, স্বল্পে সন্তুষ্ট ও কূপ-মণ্ডূক।

ধর্ম্মজগতে স্বাধীন চিন্তা একেবারেই ছিল না—ষষ্ঠী, শীতলা, ওলাবিবির পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া শতসহস্র পূজা-পার্ব্বণই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব। ইহা ছাড়া, দৈন্যসর্ব্বস্ব বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাববিলাস পৌরুষশক্তিকে হরণ করিতেছিল। ইহার উপর, পঞ্জিকা, ঘটককারিকা, কুলপঞ্জী, মন্ত্রতন্ত্র, মাদুলী, তাগা, হাঁচি, টিকটিকি ইত্যাদির উপদ্রব!

হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ছিলেন এ সকলের বিরুদ্ধে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন মাইকেল। মাইকেল স্ব-সমাজ ও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিদ্রোহের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তিনি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের মত সংস্কারের বাসনা কোন দিন পোষণ করেন নাই। তিনি ছিলেন আত্মসর্ব্বস্ব—তিনি এই সমাজ ও ধর্ম্মের গণ্ডী হইতে আপনাকে অপসারিত করিয়া সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। তবে তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ কবি হইবার বাসনা পোষণ করিতেন। অন্তরে তিনি কবিপ্রতিভার আবেদন ও প্রেরণা অনুভব করিতেন। ইংরাজীতে কবিতা লিখিয়া জগদ্বরেণ্য হইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন তাহা সম্ভব নয়—তখন তিনি বঙ্গভাষায় কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাদৃপ্ত বিদ্রোহী মন প্রচলিত ধারাকে সহ্য করিতে পারিল না—প্রচলিত আদর্শের ঠিক বিপরীত আদর্শের কাব্য রচনা করিয়া তিনি তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও কবিপ্রতিভার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে যে কাব্যের জন্ম হইল—তাহা—ছন্দে, ভাষায়, পদবিন্যাসে, ভঙ্গীতে, আকৃতিতে, প্রকৃতিতে, আদর্শে, চরিত্রসৃষ্টিতে, রসসৃষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অধিকাংশ অঙ্গে একেবারে প্রাক্তন আদর্শের বিপরীত।

এই কাব্যে তিনি যে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন—তাহাও প্রচলিত নৈতিক আদর্শের বিপরীত। এই কাব্যের চরিত্রাঙ্কনে তিনি নিজের বিদ্রোহী চিত্তকে সমাবিষ্ট করিলেন এবং সেই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া তিনি প্রচলিত সমাজধর্ম্মের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।

ইহা পরিপূর্ণ বিপরীত সৃষ্টির দ্বারা গতানুগতিককে আঘাত। বাঙ্গালী জীবনে যাহা দূষণীয় ছিল—তাহার বিপরীতও যেমন কাব্যের অঙ্গীভূত হইল—যাহা কিছু প্রশংসনীয় ছিল—তাহার বিপরীতও তেমনি তাহার সঙ্গে আসিয়া পড়িল। ফলে, মেঘনাদবধের সৃষ্টি হইল। এই মেঘনাদবধ 'একাধারে সেকালের সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতি সমস্তের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ! ইহা মাইকেলের বিদ্রোহী ও অসহিষ্ণু মনের সর্ব্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি। এই কাব্যে যেন মাইকেল নিজেই রাবণ, আর বাঙ্গালার প্রচলিত সাহিত্য সমাজ ও ধর্ম্ম—ভিখারী রাঘব, তস্কর লক্ষ্মণ ও 'রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষ' ধর্ম্ম আশ্রয়ী বিভীষণ'।

মাইকেলের সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি মেঘনাদবধের বিষয়বস্তু রামায়ণ হইতে গৃহীত হইলেও তিনি রামায়ণ পড়িয়া কবিত্বের প্রেরণা লাভ করেন নাই। একজন জগদ্বরেণ্য কবি হইবার বাসনায় তিনি ইউরোপের বহু কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে শেলি, কীটস্ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ হইতেও তিনি কোন মহাকবিত্বের প্রেরণা পান নাই—দান্তে ও মিল্‌টনের নৈতিক আদর্শ তাঁহার মনঃপূত হয় নাই, হোমরের কাব্যই তাঁহার কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি পৌরুষ বল-দৃপ্ত মনুষ্যত্বের আদর্শ হোমার হইতেই পাইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালাকাব্যে এই আদর্শের একটা রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। এই আদর্শের আশ্রয়ের জন্য আমাদের দেশের রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীগুলির মধ্যে একটি উপযুক্ত চরিত্রের অনুসন্ধান করেন। মেঘনাদই তাঁহার কাছে হোমারের আদর্শানুযায়ী উপযুক্ত চরিত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল—তাই তিনি মেঘনাদকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন।

বলা বাহুল্য, বাল্মীকির মেঘনাদকে তিনি নিজের ভাব-কল্পনায় নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। এজন্য মেঘনাদচরিত্রে যেমন রং চড়াইতে হইয়াছে—তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চরিত্রকে সেই অনুপাতে নিষ্প্রভ ও ম্লান করিতে হইয়াছে। মাইকেলের নিজস্ব কাব্যপ্রেরণার চাহিদাতেই চরিত্রগুলির রূপান্তর ঘটিয়াছে। চরিত্রগুলির জন্মভূমি আর্ষ রামায়ণ হইলেও এইগুলি গ্রীক আদর্শেই লালিত ও পুষ্ট হইয়াছে। মেঘনাদের মধ্যে গ্রীক আদর্শের মনুষ্যত্বই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। সেজন্য সমগ্র রাক্ষস সংসারকেই কবি মানবসংসারে পরিণত করিয়াছেন এবং কেবল মেঘনাদ নয় সকল রাক্ষসচরিত্রকেই তিনি মানবিক ধর্ম্মে মণ্ডিত করিয়াছেন। রাক্ষসদের কেহই মায়াবী নরভুক হিংস্র জীব নয়। তাহারা পিতৃমাতৃভক্ত, স্বদেশবৎসল, স্বজাতিবৎসল, প্রেমিক, সহৃদয় ও স্নেহপ্রবণ।

মেঘনাদের আদর্শ হোমারীয় বা ক্লাসিক্যাল। ইউরোপীয় রোমাণ্টিক্ সাহিত্য হইতে মাইকেল আর একটি আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন—যাহার পক্ষে লিরিক্ই উপযুক্ত প্রকাশভঙ্গী। এই রোমাণ্টিক্ আদর্শের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল আদর্শের একটা দ্বন্দ্বে মেঘনাদবধ মহাকাব্য হইয়া উঠে নাই—গীতিরসাত্মক কাব্যে পরিণত হইয়াছে। ক্লাসিক্যাল ও রোম্যাণ্টিক আদর্শের দ্বন্দ্ব রাবণ-চরিত্রে সমন্বয় লাভ করিয়াছে। যে রোম্যাণ্টিক আদর্শ কবির আত্মচৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে—তাহাই কবির নিজের জীবনকে ও চরিত্রকে কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়াছে। মাইকেলের নিজের দুর্দ্দম অপরাজেয় পৌরুষ, দৃঢ় উচ্চাকাঙ্ক্ষা-দৃপ্ত চরিত্র ও প্রীতিপ্রবণ স্নেহপরায়ণ

মাধুর্য্যমণ্ডিত হৃদয় রাবণের মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে। মাইকেলের রাবণ মাইকেলের মতই 'বজ্রাদপি কঠোর, কুসুমাদপি মৃদু।' মাইকেল যেমন চরম দুঃখময় পরিণতিকে বরণ করিয়াছিলেন —তবু তাঁহার বিরুদ্ধ আদর্শের সঙ্গে সন্ধি করেন নাই, মাইকেলের রাবণও তাহাই করিয়াছে। মাইকেলের রাবণ মাইকেলেরই মত সামাজিক সংস্কার, নৈতিক বিধিনিষেধ, দৈবীশক্তির শাসন কিছুই মানে নাই। সে মাইকেলের মতই আত্মশক্তিতে আস্থাবান, উচ্ছৃঙ্খল, বিবেক-বিচারে উদাসীন আবেদন নিবেদন বা হিতোপদেশে বধির, সুখে দুঃখে সমান অধীর, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ ও আত্মসর্ব্বস্ব। এইখানেই মেঘনাদবধের রোম্যান্টিক আদর্শ ও লিরিক্যাল দিকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

মধুসূদন বীররসে ভাসিয়া মহাগীত গাহিতে চাহিয়াছিলেন—তিনি সেজন্য হোমারের ক্লাসিক্যাল রূপশ্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চাহিয়াছিলেন প্রাচীন যুগের একটা আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া প্রাচীন যুগের মহাকাব্যের আদর্শকে বাংলা সাহিত্যে বাণীরূপ দান করিবেন। কিন্তু তিনি তাঁহার যুগধর্ম্মকে কি করিয়া অতিক্রম করিবেন? এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে, আত্মকেন্দ্রীয় চিন্তা ও কল্পনার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পরিবেষ্টনীর মধ্যে, রোমান্টিক কবিধর্ম্মে পুষ্ট সাহিত্যসমাজে তিনি নিজের চরিত্র, জীবন ও স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যকেই বা কি করিয়া অতিক্রম করিবেন? তাই তিনি বীররসে না ভাসিয়া ভাসিয়াছেন করুণ-রসে, তাঁহার মহাগীত বহু গীতিকায় বিগলিত হইয়াছে। রাবণচরিত্রের মধ্য দিয়া তাই কবি নিজের জীবন, চরিত্র আদর্শ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই প্রকাশ করিয়াছেন। মহাকাব্যের আকৃতি-প্রকৃতির বৃন্তে তাঁহার নিজের হৃদয়টিই গীতিকবিতার বহুদলে বিকশিত হইয়াছে। মাইকেল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কবিবন্ধু মোহিতলাল এই প্রসঙ্গে অতি মনোজ্ঞ মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"ইহাই ছিল বাঙ্গালীর মহাকাব্য। আয়োজনের ত্রুটী ছিল না। ছন্দ, ভাষা, ঘটনাকাহিনী, হোমার-মিলটনের ভঙ্গী, দান্তে ভার্জিলের কল্পনা এবং সর্ব্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু—এমন কি বাক্যঝঙ্কার পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা—সবই ছিল, কিন্তু কবি, সত্যকার কবি বলিয়া সৃষ্টি-রহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙ্গালীজীবনের গীতিকাব্য। দূর দিগন্তের সাগরোর্ম্মি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, তিনি তাহারই আহ্বানে দেহমনের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাব্যতরণী চালনা করিলেন। সমুদ্রবক্ষে তরী ভাসিল; ছন্দে ভাষায় ও বর্ণনা-চিত্রে নীলাম্বু প্রসার জলকল্লোলে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধনিমীলিত কেন? সাগরবক্ষে উত্তাল-তরঙ্গরাজির মধ্যেও এ কার কুলুকুলুধ্বনি? এ যে কপোতাক্ষ। তীরে ভগ্ন শিবমন্দিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে 'নূতন গগনে যেন নব তারাবলী' এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। সমুদ্র গর্জ্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণীতটে আছাড়িয়া পড়ুক—তথাপি এ স্বপ্ন মধুর। সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্য-তরণীর গতি নির্দ্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল, 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।" (আধুনিক বাংলা সাহিত্য—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার)

মেঘনাদ-বধ

(চতুর্থ সর্গ)

বহিরঙ্গে ক্লাসিক্যাল কিন্তু অন্তরঙ্গে রোমান্টিক আদর্শ বর্ত্তমান থাকায় মাইকেলের মেঘনাদবধ মহাকাব্য না হইয়া কতকগুলি গীতি-কবিতা 'সূত্রে মণিগণা ইব' একসূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্থ সর্গের সীতা-সরমা-মিলনটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। অন্যত্র গীতিকবিতার সৃষ্টি হইলেও তাহা ক্লাসিক্যাল প্রকৃতির কাব্যেরই অঙ্গীভূত। সীতা-সরমার মিলন-চিত্রটিতে কবি যেন কতকটা আত্মবিস্মৃত—ক্ষণকালের জন্য গ্রীক কবিদের প্রভাব হইতে মুক্ত। এই অংশে যেন রণকোলাহলে মুখরিত, অশ্বক্ষুরক্ষুণ্ণ, ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন জগতের এককোণে ক্ষুদ্র মানবসংসারের চিত্র, অথবা পশুবলদৃপ্ত হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে একটী শান্ত তপোবনের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেখানে তাপসী সীতা মুক্তির জন্য কঠোর তপশ্চরণ করিতেছেন—তাহা তপোবন ছাড়া আর কি ?

কবি ঠিকই বলিয়াছেন এখানে—'হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী নির্ভয় হৃদয়ে ফিরে দূর বনে।' তাপসী সীতা এই তপোবনে হীনপ্রাণা হরিণীরই মত।

কবি ক্ষণকালের জন্য গ্রীক প্রভাব বিস্মৃত হইয়াছেন, তাই ভারতের বাল্মীকিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার আদর্শকে বরণ করিয়া এই সর্গটির সূত্রপাত করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণের চরিত্রগুলিকে যথাযথ রাখিয়া মেঘনাদবধে তাঁহার অনুসরণ কোথাও করেন নাই—তাই অন্যত্র বাল্মীকিকে স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যেখানে কবি সীতার কথা বলিয়াছেন—সেখানে তিনি গ্রীক আদর্শ ভুলিয়াছেন। সীতাচরিত্রে তিনি বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন—তাই বাল্মীকিকে স্মরণ করিয়া এই সর্গে গৌরচন্দ্রিকা করিয়াছেন। আর একটি উদ্দেশ্য এই হইতে পারে—বাল্মীকিকে স্মরণ করিয়া কবি আগেই একটা শুচিসুন্দর তপঃশ্রীসম্পন্ন মানস আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই অংশটি একটি পরিপূর্ণ লিরিক। মাইকেলের নিজের বাঙ্গালী মন এখানে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে নাই—নিষ্ক্রিয় থাকিলে ইহা লিরিক হইত না। বাল্মীকির সীতা বাঙ্গালী নারীর নিজস্ব মাধুর্যে ও সহৃদয়তায় মণ্ডিত হইয়া মাইকেলের রচনায় শুচিতরা সুকুমারতরা ও মধুরতরা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই সরমা তাঁহার ললাটে সিন্দুরবিন্দু আঁকিয়া দিতেছে আর বলিতেছে, "এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ ?" তাই তাঁহার চরণতলে উপবিষ্টা সরমাকে কবি বলিয়াছেন, "সুবর্ণ দেউটি তুলসীর তলে যেন জ্বলিল উজ্জ্বলি দশ দিশ।" তাই সীতার প্রেম প্রেমাস্পদকে ছাড়াইয়া বনের পশুপক্ষীর মধ্যেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের সহানুভূতিময় নিবিড় যোগাযোগের কথা রোমান্টিক আদর্শের লিরিক কবিতার একটি অঙ্গ। এই অংশে কবি তাহাও দেখাইয়াছেন—সীতার শোচনীয় দশার কথা কবি দুই একটি উপমার দ্বারা বলিতে চেষ্টা করিয়া শেষে প্রকৃতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতিও যেখানে সীতার দুঃখে বিগলিত—সে দুঃখ যে কত, কবি তাহা উপমার দ্বারা কি করিয়া বুঝাইবেন? তাই কবি প্রকৃতির সহানুভূতির মধ্য দিয়া সীতার দুঃখের গভীরতা বুঝাইয়াছেন—

ধ্বনিছে পবন দূরে রহিয়া-রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা। নড়িছে বিষাদে
মর্মরিয়া পাতাকুল বসেছে অরবে
শাখে পাখী। রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু তাপি' মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ। দূরে প্রবাহিণী
উচ্চবীচিরবে কাঁদি, চলিছে সাগরে
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখকাহিনী।

আবার সীতার পক্ষ হইতেও প্রকৃতির গভীর অনুরাগ সীতার স্মৃতিকথায় ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ রোমান্টিক, ইহাতে ক্লাসিক্যাল ভঙ্গীর গন্ধও নাই। কেবল প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা নয়, সীতা প্রকৃতির মধ্যে নিজের মাতৃহৃদয়কে একেবারে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতেছেন, প্রকৃতির মাধুর্য্য ও মমতা সীতাকে অযোধ্যার রাজপুরী ও রাজৈশ্বর্য্য ভুলাইয়া দিতেছে—রাজভোগসুখ প্রকৃতির সাহচর্য্যের নির্মল আনন্দের কাছে অতি তুচ্ছ। এই বর্ণনায় মাঝে মাঝে উত্তররামচরিতের সীতাকে মনে পড়ে। সীতার মমতাময়ী স্মৃতিতে জাগিতেছে—

ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী
রাজকুল-বধূ আমি কিন্তু এ কাননে
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বনচর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ। কোন রাণী, কহ, শশিমুখি
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর। নর্ত্তক নর্ত্তকী
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে

অতিথি আসিত নিত্য করভ-করভী।
মৃগশিশু বিহঙ্গম স্বর্ণ অঙ্গ-কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কালো, কেহবা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনু ঘনবর-শিরে।
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরশী মোর। তুলি কুবলয়ে
(অতুল রতন সম) পরিতাম কেশে
সাজিতাম ফুল সাজে! হাসিতেন প্রভু
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি' কৌতুকে।

ভবভূতির উত্তররামচরিতের সীতা আর এই সীতা যেন এক।*

এই যে প্রকৃতির প্রতি গভীর মমতা—প্রকৃতির মধ্যে মহামহোৎসবের আনন্দসম্ভোগ—ইহা মৃৎজননীর কন্যার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 'বনোৎকণ্ঠা' মৈথিলী সম্বন্ধে বাল্মীকিও একথা ভুলেন নাই। এ বর্ণনা পাঠে কেবল ভবভূতি নয়, বাল্মীকিকেও মনে পড়ে।

এই যে আরণ্য প্রকৃতির প্রতি পৃথ্বী-তনয়া সীতার প্রীতি—ইহা অলস কল্পনা-বিলাসী কবিদের প্রথাগত অনুকৃতি মাত্র নয়।

ইহার মূলে আছে গভীর প্রেম। সীতা রাজপুরী হারাইয়াছিলেন—কিন্তু প্রাণবল্লভ সঙ্গেই ছিলেন। নিভৃত অরণ্যে প্রকৃতির মধ্যে রামচন্দ্রকে সীতা আদিম জীবনের পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যে একান্ত ভাবে পাইয়াছিলেন, কবি সে কথা অপূর্ব্ব ভাষায় বলিয়াছেন—

---

* সীতাদেব্যা স্বকরকলিতৈঃ শল্লকীপল্লবাগ্রে
অগ্রে লোলঃ করিকরভকো যঃ পুরা পোষিতোঽভূৎ।
বধ্বা সার্দ্ধং পয়সি বিহরৎ সোঽযমন্যেন দর্পা
দুদ্দামেন দ্বিরদপতিনা সন্নিপত্যাভিযুক্তঃ॥ ১॥

যেনোদ্গচ্ছদ্বিস-কিসলয় স্নিগ্ধদন্তাঙ্কুরেণ। ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লব. কর্ণমূলাৎ।
সোঽয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানং বিজেতা। যৎ কল্যাণং বয়সি তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ॥ ১॥
ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তি চক্ষুঃ প্রচলিত চতুরভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্ত্যমানং সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি॥ ১॥
কতিপয় কুসুমোদ্গমঃ কদম্বঃ প্রিয়তময়া পরিবর্দ্ধিতো য আসীৎ।
স্মরতি গিরিময়ূর এষ দেব্যাঃ স্বজন ইবাত্র যতঃ প্রমোদমেতি॥ ০॥
এতত্তদেব কদলীবনমধ্যবর্ত্তি কান্তাসখস্য শয়নীয় শিলাতলং তে।
অত্র স্থিতা তৃণমদাদ্বহুশো যদেভ্যঃ সীতা ততো হরিণকৈ র্ন বিমুচ্যতে স্ম॥ ২১॥

উত্তর রামচরিতম্ তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরীতীরে
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে। ছিনু ঘোর বনে
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবনসম।

পঞ্চবটী বন সাধারণ বন ছাড়া আর কিছুই নয়। গভীর প্রেমের উন্মাদনা তাহাকে সুরবনে পরিণত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, ঐ প্রেমোল্লাস এতই প্রবল, এতই প্রভূত, যে তাহা পাত্র ছাপাইয়া উচ্ছুসিত হইয়া সারা বনে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মাইকেলের ভাষায় এ প্রেম "বরিষার কালে প্রবাহ যেমতি ঢালে তীর অতিক্রমি বারিরাশি দুই পাশে"—সেই ভাবে বাঁধা পথ ছাড়িয়া জড়ে জীবে বিকীর্ণ হইয়াছে। তাই বনের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ পশুপক্ষী লতাগুল্ম পর্যন্ত সীতার কাছে এত মধুময়, এত আদরের ধন হইয়া উঠিয়াছে।

কবি এই স্মৃতিচিত্রে প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্য দিয়া প্রেমের এই গভীর সত্যটির কথাই আমাদের জানাইয়াছেন।

সীতার প্রেমোচ্ছ্বাস পঞ্চবটীবনকে কি ভাবে সুরবনে পরিণত করিয়াছিল—সীতা কি ভাবে প্রেমের আবেষ্টনীটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মাইকেল অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে বিবৃত করিয়াছেন—

অজিন (রঞ্জিত আহা কত শত রঙে)
পাতি বসিতাম—কভু দীর্ঘ তরুমূলে
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে
গাহিতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।
নব লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তার সহ, চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে
দম্পতি মঞ্জরীবৃন্দে আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে। গুঞ্জরিলে অলি
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।
কভুবা প্রভুর সঙ্গে ভ্রমিতাম সুখে—
নদীতটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগনে যেন, নব তারাবলী
নব নিশাকান্ত-কান্তি; নতুবা উঠিয়া
পর্ব্বত উপরে, সখি বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে; ব্রততী যেমতি
বিশাল রসালমূলে। কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায় ক'ব কারে? ক'ব বা কেমনে?

এই প্রেমানন্দের স্মৃতিচিত্রে অপূর্ব্ব লিরিকে পরিণত হইয়াছে। মেঘনাদবধের প্রধান মাধুর্য্য—মেঘগর্জ্জনের পর এই মধুস্বরা প্রিয়ংবদা কাদম্বার কলকূজনে।

প্রেমহীন জীবনে অভাবের অন্ত নাই। তাহাব জন্য আয়োজন আড়ম্বর কত শত। আর যেখানে প্রেমের আতিশয্য সেখানে কোন দৈন্য, কোন অভাব নাই। সেখানে অযোধ্যার রাজহর্ম্ম্যের প্রয়োজন হয় না,—মনের ঐশ্বর্য্য সেখানে বনের ঐশ্বর্য্যেব সৃষ্টি করে। তাই সীতা বলিয়াছেন—'দণ্ডক ভাণ্ডার যার ভাবি দেখ মনে কিসের অভাব তার?' আবেষ্টনী সৃষ্টির জন্য অথবা আখ্যানভাগের সঙ্গে দেশ ও কালেব সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য নানাস্থলে মাইকেল স্বভাব বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা তাঁহার ক্লাসিক্যাল ভঙ্গীরই অঙ্গীভূত। সীতার স্মৃতিচিত্রে কবি যে প্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা স্বতন্ত্র ধরণের। এখানে মানবহৃদয়ের সহিত সংযোগে প্রকৃতি জীবনময়ী, চিন্ময়ী, রসময়ী ও সুখদুঃখসমন্বিতা হইয়া উঠিয়াছে—ইহা রসাবিষ্ট দৃষ্টিতে বা রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে দেখার ফল। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে এই দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখা এই প্রথম।

অপহৃতা সীতা রাবণের ভয়ে নিষাদেব আলয়ে বন্দিনী পক্ষিণীর মত ছটফট করিয়া প্রকৃতির উদ্দেশে বলিতেছেন—

—হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ
(আরাধিনু মনে মনে,) এ দাসীর দশা
ঘোররবে কহ যথা রঘু চূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর ভুবনবিজয়ী।
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি, দূত-পদে
বরিনু তোমারে আমি।' যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু। হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী। ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে।"
হে ভ্রমর মধুলোভী, ছাড়ি ফুল কুলে
গুঞ্জর' নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী
সীতার বারতা তুমি, গাও পঞ্চস্বরে
সীতার দুঃখের গীত। তুমি মধু-সখা
কোকিল। শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে।

প্রকৃতির উদ্দেশে এইরূপ আবেদন অনেকটা কনভেনশন্যাল সন্দেহ নাই—বাল্মীকি হইতেই ইহা চলিয়া আসিতেছে। মাইকেলের এই আবেদনে সীতার অসহায়তা ও নিরুপায়তা যেরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে—তাহা অনন্যসাধারণ। প্রকৃতি-দুহিতা, প্রকৃতিব অঙ্কে দীর্ঘকাল লালিতা সীতার পক্ষে প্রকৃতির উদ্দেশে এই আবেদনে যেরূপ স্বাভাবিক হইয়াছে—সেরূপটি অন্যত্র দেখা যায় না। এই অঙ্গ কতকটা কনভেনশন্যাল হইলেও কবির রসাবিষ্ট দৃষ্টির ইহাতেও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। এই চিত্রে সীতার চরিত্রের লালিত্য, সৌকুমার্য্য, শুচিতা, সাধ্বীত্ব, সত্যনিষ্ঠা ও প্রেম-গভীরতা যে ভাবে ফুটিয়াছে এমনটি রামায়ণেও দুর্লভ।

মাইকেল বাল্মীকির পরিকল্পিত সীতার মর্য্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেন নাই। "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ" এই কথাই বোধ হয় তাঁহার মনে হইয়াছে। সহস্র বিজাতীয় ভাবের কল্পনাতেও মাইকেলের বাঙ্গালী প্রাণটি ও হিন্দু হৃদয়টি যে বৈশাখী ঝঞ্ঝার মধ্যে গৃহলক্ষ্মীর অঞ্চলের অন্তরালে রক্ষিত তুলসীমঞ্চের দীপটির মত জলন্ত ছিল—এই চিত্রটিই তাহার প্রধান প্রমাণ। বাল্মীকির সীতাচরিত্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ ত করেনই নাই—অধিকন্তু কবি সীতাকে প্রেম-মাধুর্য্যে ও শুচিতায় উজ্জ্বলতরা করিয়াই দেখাইয়াছেন। রামচরিত্রের প্রতি কবির খুব শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু সীতাচরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া কবি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন—সীতা চরিত্রের আলোকে রামচরিত্রও পরম শ্রদ্ধেয় ও মহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ভিখারী রাঘব—পরম প্রেমাঢ্য নরোত্তম হইয়া উঠিয়াছেন।

সীতাচরিত্রের প্রতি মাইকেলের আন্তরিক শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মাইকেল তাঁহার সামসময়িক বাঙ্গালী সমাজে পুরুষজাতির অধোগতি, ভীরুতা, দুর্বলতা ও পরনির্ভরতা দেখিয়া বাঙ্গালী পুরুষজাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী নারীর সৌকুমার্য্য, শুচিতা, প্রেমপ্রবণতা ও হৃদয়বত্তা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। "তুষ্ট লঙ্কাপতি কেমনে হবিল ও বরাঙ্গে অলঙ্কার।" সরমার এই উক্তির উত্তরে সীতা বলিতেছেন -"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু আভরণ।" ইহা সীতার সত্যনিষ্ঠার পরিচয়।

বাল্মীকির সীতাকে মাইকেল আপন মনের মাধুরী দিয়া মণ্ডিত করিয়া নবশুচিশ্রী দান করিয়াছেন। মারীচের মায়াজাল-বিস্তারের সময় বাল্মীকির সীতা লক্ষ্মণকে যে অতি বিষাক্ত কটুকথাগুলি বলিয়াছিলেন—মাইকেল সীতার মুখে সেগুলি পুনরাবৃত্ত করাইতে পারেন নাই। মাইকেলের সীতা মূর্ত্তিমতী করুণা। তাঁহার কুটীরে কুরঙ্গ বিহঙ্গ পশুশিশু করভকরভী সদাব্রত-ফলাহারী। বারিদ-প্রসাদে সুজলবতী মরু-স্রোতস্বতীর ন্যায় তৃষ্ণাতুরগণকে তিনি পরম যত্নে লালন করিতেন। বাঘিনীর মুখ হইতে হরিণীকে বাঁচাইবার জন্য "রক্ষ নাথ" বলিয়া সীতা রামের চরণে পতিত হইয়াছিলেন একদিন। এহো বাহ্য! কবি স্বপ্নচিত্রের একস্থলে বলিয়াছেন—

চঞ্চল হইনু সখি শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন। কহিনু মায়ে ধরি পা দু'খানি
রক্ষঃকুল দুঃখে বক্ষ ফাটে মা আমার
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতর
এ দাসী। ক্ষম মা মোরে।

সীতার কাতর আহ্বানে জননী বসুধা সীতার চোখে ভবিষ্যৎ উদ্ঘাটন করিতেছেন। সীতা দেখিতেছেন—রামের অভিযানে লঙ্কাপুরে সহস্র সহস্র বীরের পতন হইতেছে, "কাঁদিল কনক লঙ্কা হাহাকার রবে।" মহাশত্রুর দুর্গতি দেখিয়াও সীতার করুণ হৃদয় বিগলিত হইতেছে। সীতা এ শোকদৃশ্য দেখিতে না পারিয়া জননীকে বলিতেছেন "রক্ষঃকুলদুঃখে বুক ফাটে।" সীতার হৃদয়ের এই রূপশ্রী মাইকেলের নিজস্ব।

স্মৃতিচিত্রের সঙ্গে কবি সীতার একটি স্বপ্নচিত্র সংযোগ করিয়াছেন। বর, অভিশাপ, আকাশবাণী ও স্বপ্নের মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস দেওয়া প্রাচীন কবিদের একটি বিশিষ্ট রীতি। কবি এ বিষয়ে ক্লাসিক্যাল। সীতার স্বপ্নচিত্রের মধ্য দিয়া লঙ্কাযুদ্ধের কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন। কবির তাহাই কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। যে আশায় ও যে আশ্বাসে সীতা অশোকবনে দারুণ দুর্গতি ভোগ করিতেছেন তাহার একটা আশ্রয় চাই। কবি স্বপ্নের মধ্য দিয়াই সে আশার আশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহাও ত' স্বপ্নমাত্র—ইহার উপর কতটা নির্ভর করা যায়? কবি এখানে কলাকৌশলের আশ্রয় লইয়াছেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহাও স্বপ্নের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফল এই হইয়াছে যে—অধিকাংশ যখন ফলিয়াছে—তখন বাকিটুকুও ফলিবে। এ আশা স্বপ্নমাত্র নয়। আশা আশ্বাসের জন্য যে স্বপ্নের অবতারণা তাহার পরিণাম যদি অপ্রীতিকর হয়, তবে এই স্বপ্নযোজনাই ব্যর্থ হয়—সীতা স্বপ্নে দেখিতেছেন রাবণ বধ হইয়া গিয়াছে—

> কাঁদিয়া হাসিয়া সই সাজিনু সত্বরে
> হেরিনু অদূরে নাথে হায়লো যেমতি
> কনক উদয়াচলে দেব অংশুমালী।
> পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
> পদযুগ, সুবদনে। জাগিনু অমনি।

শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ধরিতে সীতা অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। এখানে স্বপ্ন না ভাঙ্গিলে কবির স্বপ্নচিত্রের যোজনাই ব্যর্থ হয়।

কারণ, তাহার পরই আছে রামের প্রত্যাখ্যান ও কঠোর বাণী। এ দৃশ্য স্বপ্নে দেখিলে সীতার আশ্বস্ত হইবার উপায় থাকে না—রাক্ষসবংশ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আশালতাও শুকাইয়া যায়—সীতার আত্মপ্রাণরক্ষা করার কোন প্রয়োজনই থাকে না। যে সীতাকে মাইকেল ভক্তির স্বর্গে পূজা করিয়াছেন—তাঁহাকে আশার স্বর্গ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না।

মাইকেলের নবপ্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দটি এই অংশের পক্ষে যেরূপ উপযোগী এমনটি যেন অন্যত্র হয় নাই বলিয়া মনে হয়। (১) নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে, (২) একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে (৩) ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে—এইরূপ যে কোন স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া খানিকটা পড়িলেই অমিত্রাক্ষরের স্বচ্ছন্দ সাবলীল প্রবাহের চমৎকারিতা অনুভূত হইবে।

এই অংশে মাইকেলের প্রযুক্ত উপমাদি অলঙ্কারগুলিতে মৌলিকতা ও রসবৈশিষ্ট্য আছে। উপমাগুলি হোমারিক সিমিলির ধরণের নয়। এইগুলিতে রূপ অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্য—সেজন্য এইগুলি রোমান্টিক রচনারীতির পক্ষে বেশ উপযোগী হইয়াছে। কয়েকটি লইয়া একটু আলোচনা করিতেছি।

১। তব অনুগামী দাস রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।

উপমাটি মৌলিক। রামায়ণই রাজৈশ্বর্য্য—রামায়ণের বিষয়বস্তু অবলম্বনই দাসের পক্ষে রাজেন্দ্রসঙ্গ। দূর তীর্থ—দেশে দেশে যুগে যুগে মানব হৃদয়ের স্মৃতিলোক।

২। কবিতা রসের সরে রাজহংসকুলে
মিলি করি কেলি আমি না শিখালে তুমি।

কালজয়ী শ্রেষ্ঠ কবিরা রাজহংসের সহিত উপমিত। সেক্‌সপীয়ার Swan of Avon. রাজহংস সরস্বতীর বাহন। চমৎকার রসানুকূল উপমা।

৩। মলিনবদনা দেবী হায়রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) সূর্যকান্তমণি।

সূর্য্যবংশের ধুরন্ধরের কান্তার সহিত সূর্যকান্তমণি উপমিত। সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যকরস্পর্শ লাভ না করিলে উজ্জ্বল হয় না। সৌরকররাশি সূর্য্যবংশের প্রতাপ ও বিক্রমের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। সূর্য্যকান্তমণি খনি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সূর্য্যকরস্পর্শে না আসিলে তাহা সাধারণ শিলার মতই নিষ্প্রভ। সীতার সহিত খনিগর্ভস্থ সূর্য্যকান্তমণির উপমা চমৎকার।

৪। কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিল ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি ললাটে আহা তারা রত্ন যথা।

এখানে সীতার মলিন ললাটখানিকে গোধূলির ললাটের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। গোধূলিকেও Personify করা হইয়াছে। গোধূলির সময় আকাশে যে তারাটির উদয় হয়—তাহা মঙ্গলগ্রহ—রক্তবর্ণ। সিন্দূরের সহিত অতি সুষ্ঠু ভাবেই উপমিত।

৫। বসিলা যুবতী
পদতলে; আহা মরি সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশদিশ।

স্বর্ণলঙ্কার রাজকুলবধূ লাবণ্যে ও ভূষাগৌরবে সুবর্ণ প্রদীপের সহিত উপমিত। সরমার ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও শুচিতা এই উপমায় দ্যোতিত হইতেছে। সীতার সহিত তুলসীর উৎপ্রেক্ষায় সীতাচরিত্রের অনন্যসাধারণ শুচিতা সূচিত হইতেছে। ইহা রূপের ঔপম্য নয়—ইহা ভাবের ঔপমা। এইরূপ ভাবের উপমা মাইকেলের কাব্যেও দুর্লভ। ইহাতে মাইকেলের হিন্দু মনটিও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

৬। আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা-দুখানি আশার সরসে
রাজীব, নয়নমণি?

চরণ-রাজীবের কথা মৌলিক নয়। কিন্তু আশার সরসে রাজীব বলায় রূপের সহিত ভাবের অপূর্ব মিলন হইয়াছে। দুইটি নয়ন মণির সহিত উপমিত হইয়াছে। ইহা ভাবের উপমা, রূপের নয়।

৭। বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি
বারিরাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।

প্লাবনপীড়নে কাতর প্রবাহের সহিত বেদনার আতিশয্যের উপমা যথোপযুক্ত। এই প্রবাহে তীরভূমিকেও পীড়িত করে। মনের এমন অবস্থা আসে যখন, তখন মনের বেদনা আর চাপিয়া রাখা যায় না। অন্যকে দুঃখের কথা বলার অর্থ—নিজের দুঃখকে আর পাঁচজনের দরদী হৃদয়ে সঞ্চারিত করা।

৮। রবিকর যবে দেবি পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে
মলিন বদন সবে তার সমাগমে।

এই উপমায় সরমার যে বিনয় প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে সরমার চরিত্র পৌর্ণমাসী নিশার মতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

৯। দেখ চেয়ে নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য-সুধা দেবি দেব সুধানিধি।

এটি উপমা নয়। স্বয়ং সুধানিধি, যাঁহার সুধার অভাব নাই—তিনিও তোমার বাক্য-সুধাকে পরমাস্বাদ্য ধন মনে করিয়া নীলাম্বরে থাকিয়া তাহা পান করিতেছেন। এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কারের প্রয়োগ হইয়াছে। সুধানিধিকে সুধাপিপাসু কল্পনা করায় অলঙ্কারের মৌলিকতা সূচিত হইতেছে।

১০। মৃদুস্বরে (হায়লো যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম কাননে
বসন্তে) কহিলা কান্ত।

কুসুমকাননে বাসন্ত সমীরণের স্বননের সহিত রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বরের উপমা দেওয়া হইয়াছে। এই উপমায় রামের সম্বন্ধে সীতার প্রেমস্নিগ্ধ রসমধুর মনোভাবটি অতিসুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

১১। হুতাশন তেজে গলে লৌহ
বারিধারা দমে কি তাহারে ?

এখানে বারিধারা সীতার অশ্রুধারা। অশ্রুতে লৌহ হৃদয় গলে না। লৌহ গলাইতে চাই হুতাশন—রামের বিক্রম ও রোষ। নিদর্শনা অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত।

১২। প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত যবে তরুকুল নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী ?

রাবণের রথচক্র নির্ঘোষ ঝঞ্ঝার সহিত উপমিত—আর সীতার আর্তনাদ কপোতীর কূজন। ব্যঞ্জনা হইতেছে—নিষাদ কি কপোতীর আবেদনে কর্ণপাত করে? মাইকেল বারবারই সীতার সহিত পক্ষিণীর উপমা দিয়াছেন—পক্ষিণীর সহিত সীতার উপমা নানাভাবে যথাযোগ্য—কপোতীর উপমাটি সর্বোৎকৃষ্ট। আর একবার কপোতীর উপমা দিয়াছেন—স্মৃতিচিত্রে—

ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরীতীরে
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।

পঞ্চবটীবনের লোকালয়-বিচ্ছিন্ন দাম্পত্যসুখবিভোর জীবনেব বিবিক্ততা এই উপমায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

১৩। যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা কহিলা জানকী
মধুরভাষিণী সতী।

গোমুখীউৎসের গঙ্গাধারার সহিত সীতাব বচনধারাব উপমায় সীতাব প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ও সীতা-চরিত্রের অপূর্ব শুচিতা সূচিত হইয়াছে।

১৪। এ পঙ্কিল জলে পদ্ম। ভুজঙ্গিনীরূপী
একাল কনকলঙ্কা শিরে শিরোমণি।

এ উপমা দুটির দ্বারা সরমার চরিত্রের মহত্ত্ব ও মাধুর্য সূচিত হইয়াছে।

এইভাবে অলঙ্কারগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—অলঙ্কারগুলি একদিকে যেমন রসের পরিপোষণ করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি সীতা ও সরমার চরিত্র দুইটিকে জীবন্ত ও জলন্ত করিয়া তুলিয়াছে। অলঙ্কারগুলিতে বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই, কোন কৃচ্ছ্র চেষ্টা বা কৃত্রিমতার প্রয়াস নাই, অতি সহজ সরল ও স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এগুলি যেন—

হঠাৎ মুখে আসে
ঢেউয়ের মুখে মোতির ঝিনুক যেন মরু বালুর তীরে।

মেঘনাদবধ

ষষ্ঠ সর্গ

মাইকেলের আদর্শ বীর মেঘনাদ—মূর্ত্তিমান পুরুষকার, কিন্তু মেঘনাদকে কাব্যে অসামান্য শৌর্য্যপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। মেঘনাদ যে দেবদৈত্য-বিজয়ী, বাসবত্রাস, ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় অপরাজেয় বীর তাহা প্রসঙ্গক্রমেই বলা হইয়াছে। কবি দেখাইয়াছেন—এমন যে অপরাজেয় বীর, সেও পরাজিত নিয়তির কাছে। নিয়তির সঙ্গে মেঘনাদের মত বিশ্বজয়ী বীরেরও সংগ্রাম চলে না—নিয়তির কাছে সে অসহায়।

মেঘনাদবধে লক্ষ্মণ উপলক্ষণ মাত্র—সে তাহার হস্তের প্রহরণের মতই উপকরণ মাত্র।—সে নিয়তির হস্তে যন্ত্রস্বরূপ। কবি এই নিয়তিকেই মায়াদেবীর রূপ দিয়াছেন। দেবতাদের সমবেত শক্তিই নিয়তি, মায়াদেবীর রূপে লক্ষ্মণের উপাসনায় তুষ্ট হইয়া বলিতেছেন—

দেবঅস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব, আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোবে শিবের আদেশে।

মায়াদেবী কেবল দেব অস্ত্র যোগাইলেন না।—তিনি লক্ষ্মণ ও তাহার পথিপ্রদর্শককে মায়াবলে অন্যের অলক্ষ্য করিয়াছিলেন। মায়াদেবীর আশ্বাসে লক্ষ্মণের গভীর প্রত্যয় জন্মিল—লক্ষ্মণের দুর্ব্বল চিত্তে সাহসের সঞ্চার হইল। মায়াদেবীর আশ্বাসদানেও দুর্ব্বলচিত্ত রাঘব ভিখারীর মনে দ্বিধা ঘুচে নাই—তাঁহার মনে ভ্রাতৃস্নেহই প্রবল হইয়া রহিল। তখন,—

উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী—
কি কারণে রঘুনাথ সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে এ ত্রিভুবনে? দেবকুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব, কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ, শৈলবালা কর্ম্মসহায়িনী—।
চেয়ে দেখ লঙ্কাপানে। কালমেঘসম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে, দেবহাস্য উজলিছে, দেখ
এ তব শিবির প্রভু, আদেশ' দাসেরে
ধরি দেব অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে।

রামচন্দ্রের মনে তখনও দ্বিধা যায় না। তখন বিভীষণ তাঁহার স্বপ্নের কাহিনী বলিলেন—"রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী স্বপ্নে আমাকে নিয়তির বিধানের কথা জানাইয়াছেন। প্রাক্তন কর্ম্মের

ফলে আমি লঙ্কার সিংহাসন লাভ করিব। বিধির বিধানে তিনি রক্ষঃকুলনাথ পদে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। কল্য লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিবে, ইহা স্থির হইয়াই আছে—রাজলক্ষ্মী আমাকে বলিয়াছেন।" অর্থাৎ বিধির বিধান বা নিয়তিই মেঘনাদকে বধ করিবে আমরা দুইজনে উপলক্ষমাত্র হইব।

তাহাতেও রামের সংশয় যায় না—তখন নিয়তি আকাশ-সম্ভবী (সম্ভবা ?) সরস্বতীর রূপে জানাইলেন—"উচিত কি তব কহ হে বৈদেহীপতি সংশয়িতে দেববাক্য ?" রামের প্রতীতির জন্য মায়াদেবী অজগর ও শিখীর সংগ্রামে মায়ার খেলা দেখাইলেন। বিভীষণ বলিলেন—

'আশু যা ঘটিবে এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে।' লক্ষ্মণ ত রামের আজ্ঞা পাইলেন। কিন্তু মায়াদেবী তখনও নিশ্চিন্ত হইলেন না। মায়াদেবী রক্ষোবধূবেশে—রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মীর কাছে গিয়া বলিলেন—"তোমার কালানলসম তেজঃ সংবরণ কর—তুমি প্রসন্ন না হইলে লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরে বৈরিভাবে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" তিনি সম্মত হইয়া বলিলেন—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ? নিয়তি যখন প্রতিকূলা, তখন আমিও প্রতিকূলা হইলাম।

এদিকে রামচন্দ্র মহামায়ার উদ্দেশে নিবেদন করিলেন

রক্ষ সতি এ রক্ষঃ সমরে
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে।

এই আবেদন—

শুনি সে সুআরাধনা নগেন্দ্রনন্দিনী
আনন্দে তথাস্তু বলি আশীষিলা মাতা।

মায়ার প্রভাবে লক্ষ্মণ শুধু অলক্ষ্য নয়—লঙ্কার সমস্ত দুয়ার লক্ষ্মণের করস্পর্শে খুলিয়া গেল। "রক্ষোরথী যত মায়ার ছলনে অন্ধ কেহ না দেখিলা।" নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দ্বার রুদ্ধ, লক্ষ্মণ তবু মায়াবলে সেখানে প্রবেশ করিল। মায়ার প্রভাবে লক্ষ্মণের স্থূলদেহ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। লক্ষ্মণ শুধু দেববলে বলী নহেন, তিনি দেবাকৃতি। মেঘনাদ ভীমনাদে কোষা ছুড়িয়া লক্ষ্মণকে প্রহার করিল কেবল এই ব্যাপারে মায়াদেবী অসতর্ক ছিলেন, লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর হইতে মায়াদেবী লক্ষ্মণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। মেঘনাদ লক্ষ্মণের হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু 'মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে ?' কোন অস্ত্রই হস্তচ্যুত করিতে পারিল না। কারণ, সবগুলিই দেব অস্ত্র।

মায়ার যতনে' লক্ষ্মণ চেতনা লাভ করিল। মেঘনাদ আহত হইয়া শঙ্খ ঘণ্টা উপহারপাত্র লক্ষ্মণের দিকে ছুড়িতে লাগিলেন—

কিন্তু মায়াময়ী মায়া বাহুপ্রসারণে
ফেলাইল দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদায় মশকবৃন্দ সুপ্তশিশু হ'তে
কর-পদ্ম-সঞ্চালনে।

মেঘনাদ লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু 'মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে—শূলপাণি, চক্রপাণি, দণ্ডপাণি' দেবতাদের। তারপর

অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ খড়গাঘাতে পড়িল ভূতলে।

নিয়তি বা মায়াই মেঘনাদকে বধ করিল, লক্ষ্মণ নিমিত্তমাত্র। লক্ষ্মণ মেঘনাদবধ করিয়া রামের সমীপে ফিরিয়া গেল—তিনি ধন্য ধন্য করিলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন—

'পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে।'
প্রিয়তম, নিজবলে দুর্বল সতত
মানব, সুফল ফলে দেবের প্রসাদে।

ষষ্ঠ সর্গে রামচন্দ্র ভ্রাতৃবৎসল দুর্ব্বলচিত্ত রাক্ষস-ভয়ত্রস্ত দেবতার চরণে ভিখারী রাঘব। মানুষের সর্ব্ববিধ দুর্বলতা রামচন্দ্রের চরিত্রে বর্ত্তমান।

লক্ষ্মণ অপেক্ষাকৃত সবলচিত্ত, কিন্তু মায়ার প্রসাদে দেবাকৃতি দেববীর্য্য দেবঅস্ত্রধারী বলিয়াই তাহার সাহস। ছন্দ ও অনুপ্রাসের অনুরোধে লক্ষ্মণ মাঝে মাঝে দুই-একটি মর্য্যাদাসূচক বিশেষণ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু লক্ষ্মণের প্রতি কবির অশ্রদ্ধাই সূচিত হইয়াছে সমগ্র সর্গে —কবি উপমা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

(ক) কুসুম রাশিতে অহি পশিল কৌশলে।
(খ) পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে।

আকাশে মায়ার খেলায় অজগরেরই বিজয় দেখাইয়া অজগরকেই লক্ষ্মণের প্রতীক কল্পনা করিয়াছেন। তাহাছাড়া মেঘনাদের মুখের তিরস্কার গুলিতে কবির নিজের অন্তরের বিদ্বেষের মুদ্রাঙ্ক আছে।—

মেঘনাদের মুখে কবি লক্ষ্মণের বিশেষণ বসাইয়াছেন—ক্ষত্রকুলগ্লানি, নির্লজ্জ, তস্কর, দুর্মতি, বীরকুলগ্লানি, পামর, নরাধম, কুমতি। মেঘনাদ বিভীষণকে বলিয়াছে—

(১) নিজগৃহপথ তাত দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার প্রাসাদে?

(২) মৃগেন্দ্রকেশরী
কবে হে বীরকেশরী সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে?

(৩) হে বিধাতঃ, নন্দনকাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস?

(৪) কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচসহ নীচ সে দুর্মতি।

মেঘনাদ যতদূর সম্ভব সংযতভাবে বিভীষণকে তিরস্কার করিয়াছে। তখনও মেঘনাদ বিভীষণের মতিপরিবর্ত্তনের ও স্বজনপ্রীতি উদ্বোধনের প্রত্যাশা করে। মেঘনাদ সংযতভাবে অনুযোগ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। বিভীষণ উত্তর দিয়াছেন—

প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মরিতে?

বিভীষণের কোন মহত্তর উদ্দেশ্য নাই—তিনি আত্মরক্ষার জন্যই রাঘবের আশ্রিত। মাইকেলের বিভীষণ আর বাল্মীকির বিভীষণ এক নহে। মেঘনাদ তাই বলিয়াছে জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব জাতি এসকলে যে জলাঞ্জলি দেয়—সে কিরূপ ধার্ম্মিক তাহা বুঝি না। মাইকেলের মতে বিভীষণ বিশ্বাসঘাতক, স্বজাতিদ্রোহী, স্বধর্ম্মদ্রোহী, দেশদ্রোহী। বিভীষণ যে স্বপ্নের কথা বলিয়াছেন তাহাতে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে—বিভীষণ রাজ্যলোভেই মেঘনাদবধের সহায়তা করিতে চান। বাল্মীকির বিভীষণের কাছে ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ও সনাতন। জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব জাতি এমন কি দারাপুত্র পরিবার সবই অনিত্য, মায়াময়।

মেঘনাদের পতনের পর বিভীষণ আক্ষেপ করিতে করিতে বলিয়াছেন—

উঠ বৎস, খুলিব এখনি,
তব অনুরোধে দ্বার। যাও অস্ত্রালয়ে
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে।

এ আক্ষেপোক্তিতে বিভীষণ-চরিত্রের মর্য্যাদা কিছুমাত্র বাড়ে নাই—বরং বিভীষণচরিত্র আরও অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছে। এই উক্তিতেই বিভীষণের শোকের পর্য্যবসান, তিনি ত এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন না।

মধুসূদন যে ভাবে ইন্দ্রজিতের হত্যাসাধন দেখাইয়াছেন—তাহাতে যুদ্ধ হয় নাই—পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহকে হত্যা করা হইয়াছে। বাল্মীকি মায়াদেবীর সাহায্যগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু নিয়তিরই যে বিধান তাহা বলিয়াছেন—'সর্বলোকপ্রভু ব্রহ্মা বরপ্রদানকালে তাহাকে কহিয়াছিলেন—তুমি যখন দেখিবে যে যাগভূমি নিকুম্ভিলায় উপনীত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই এই অবস্থায় যদি কেহ তোমাকে সশস্ত্রে আক্রমণ করে, তখনই তোমার মৃত্যু।- রাম! ব্রহ্মা তাহার বধোপায় এইরূপই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তুমি মহাবল লক্ষ্মণকে নিয়োগ কর।"

বাল্মীকির রামায়ণে রামলক্ষ্মণের কোন মায়াবল নাই। ইন্দ্রজিৎই মায়াবী, মায়াবলেই সে দুর্জ্জয়। বিভীষণ মায়াবোধে সমর্থ। অতএব লক্ষ্মণ ও বিভীষণ, বানরযূথপতিগণ ও সমস্ত বানর লইয়া ইন্দ্রজিৎ বধে অগ্রসর হইল। লঙ্কা প্রবেশে রীতিমত দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। তারপর নিকুম্ভিলা যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশের পরও রাক্ষসসৈন্যের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হইল। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে

সসৈন্তে নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া মেঘনাদ "নিকুম্ভিলাক্ষেত্রের ঘনীভূত বৃক্ষের অন্ধকার হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে পূর্ব্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন।"

হনুমান একাই সমস্ত রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিতেছে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বধ করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। হনুমান বলিলেন—"যদি বীর হোস্ তবে আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কর, আমি অস্ত্রচালনা করিতে জানি না।" বিভীষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন—"ঐ দেখ বিশাল বটবৃক্ষ, উহার মূলে আসিলেই মেঘনাদ অন্যের অদৃশ্য হইয়া অজেয় হইবে। অতএব বটমূলে যাইবার আগেই উহাকে বধ কর।" লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া রথারোহী মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। এই সময়ে মেঘনাদ বিভীষণকে দেখিতে পাইলেন। বিভীষণকে দেখিয়া মধুসূদনের মেঘনাদ যতদূর সম্ভব পিতৃব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্মীকির মেঘনাদ সুসভ্য মানুষ নহেন, রাক্ষস। রাক্ষসের মত মেঘনাদ গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিল।

"রে নির্বোধ, তুই এইস্থানে জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস। তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বল এখানে পিতৃব্য হইয়া কিরূপে ভ্রাতৃপুত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি। রে ধর্ম্মদ্রোহিন্, সৌহার্দ্দ, জাত্যভিমান, সোদরত্ব ও ধর্ম্ম তোর কার্য্যাকার্য্যের নিয়ামক নয়। তুই যখন আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছিস, তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কোথায় স্বজন সংস্রব আর কোথায় পরসংস্রব। তুই নির্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহা বুঝিতে পারিলি না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণ হয়, তাহা হইলে ঐ নির্গুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেয়, পর সে পরই। (মধুসূদন এই অংশের আক্ষরিক অনুবাদই করিয়াছেন" "শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি পরজন গুণহীন স্বজন তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা।") যে ব্যক্তি স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া পরপক্ষকে আশ্রয় করে, সে স্বপক্ষ ক্ষয় পাইলে পশ্চাৎ পরপক্ষের দ্বারা বিনষ্ট হয়। রে রাক্ষস। তুই আমাদের আপনার জন। আমায় বধ করিতে তোর যেমন নির্দ্দয়তা, আর এই কার্য্যে তোর যেরূপ যত্ন, ইহা ত্বদ্ব্যতীত আর কে করিতে পারে?"

বিভীষণ ইহার উত্তর শান্তভাবেই দিয়াছেন—"তুমি কি আমার স্বভাব জান না? তুমি অসাধু, পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার্থ তোমার এই রুক্ষভাব দূর করা কর্ত্তব্য। আমি যদিও ক্রুর রাক্ষসকুলে জন্মিয়াছি, কিন্তু যাহা মনুষ্যের প্রধান গুণ সেই রাক্ষসকুলদুর্লভ সত্ত্বই আমার স্বভাব। আমি কোন দারুণ কার্য্যে হৃষ্ট হই না, অধর্ম্মেও আমার অভিরুচি নাই। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীদূষক ব্যক্তি জলন্ত গৃহবৎ সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। এক্ষণে ভীষণ ঋষিহত্যা, দেবগণের সঙ্গে বৈরিতা, অভিমান, রোগ ও প্রতিকূলতা এই কয়টি আমার ভ্রাতাকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। বৎস, রাবণকে ত্যাগ করিবার ইহাই কারণ। এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি ও রাবণ তোমরা অচিরাৎ ছারখারে যাইবে।"

মধুসূদনের বিভীষণও এই কথাই বলিয়াছেন—কেবল 'পরদোষে কে চাহে মরিতে'?—

এই কথাটাতেই বিভীষণের চরিত্রের রূপই বদলাইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরক্ষার্থে নয়, আত্মরক্ষার্থে মধুসূদনের বিভীষণ 'রাঘবের পদাশ্রয়ে আশ্রয়ী।'

মেঘনাদ কৃষ্ণাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিল। লক্ষ্মণের রথ নাই, হনুমান বিরাট দেহধারণ করিলেন, তাহার পৃষ্ঠে লক্ষ্মণ আরোহণ করিয়া মেঘনাদের প্রতিরোধ করিলেন। প্রথমে দুইজনে কথাকাটাকাটি হইল। মধুসূদনের মেঘনাদ লক্ষ্মণকে বলিয়াছে তস্কর, কারণ সে তস্করের মতই লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। বাল্মীকির লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকেই বলিয়াছে—তস্কর, কারণ সে রণস্থলে মায়াপ্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া অস্ত্রের আঘাত এড়াইয়াছিল। 'সেইটিই তস্করের পথ, বীরের নহে।'

যুদ্ধ হইল তুমুল—সারাদিন ধরিয়াই যুদ্ধ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। মেঘনাদের সারথি ও অশ্ব নিহত হইল। মেঘনাদ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া নূতন সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। মেঘনাদ বিভীষণকেও শরাঘাতে জর্জ্জর করিয়া তুলিল, বিভীষণও ধনুঃ ধারণ করিয়া মেঘনাদের অঙ্গে তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। "মহাবীর লক্ষ্মণ অমোঘ ঐশাস্ত্র সন্ধানপূর্বক কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কহিলেন—অস্ত্রদেব, যদি রাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মশীল হ'ন, তবে তুমি ইন্দ্রজিৎকে সংহার কর। এই বলিয়া তিনি ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন"।—তাহাতেই ইন্দ্রজিৎ ছিন্নমুণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইভাবে "সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি মেঘনাদ চলি হায় গেল যমপুরে।"

বাল্মীকির লক্ষ্মণ ও বিভীষণ মেঘনাদকে সম্মুখ সমরেই আক্রমণ করিয়াছিল, কেবল মেঘনাদকে মায়ার সহায়তালাভের সুযোগ দেয় নাই—পৌরুষের সহিত পৌরুষের সমরই ঋষি-কবি চিত্রিত করিয়াছেন।

গ্রীক আদর্শ অনুসরণে মাইকেল এখানে অভিনব সৃষ্টিকৌশল দেখাইয়াছেন। গ্রীক আদর্শ অনুসারে তিনি লক্ষ্মণ বিভীষণ ও মেঘনাদ চরিত্র নূতন করিয়া গড়িয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস যেমন মহাভারতীয় কাহিনীতে দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করিয়া দুষ্মন্তচরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। মধুসূদন তেমনি মায়ার প্রভাব ও প্রসাদের অবতারণা করিয়া মেঘনাদচরিত্রের মর্য্যাদা বাড়াইয়াছেন।

বাল্মীকির মতে রাম ও মেঘনাদ দুইজনেই দৈববলে বলী, তবে রামলক্ষ্মণ দেবতাদের উপাসনা করিয়া দৈবপ্রসাদলাভ করিয়াছিলেন। আর মেঘনাদ স্বকীয় পৌরুষবলে দেবতাদের পরাজিত করিয়া দৈবীশক্তি আদায় করিয়াছিল। মেঘনাদ নিজের পৌরুষবলে দৈবীশক্তির অধিকারী হইয়াছিল বলিয়া মেঘনাদ মধুসূদনের কাছে আদর্শবীর।

মেঘনাদের পতনের পর মধুসূদনের বিভীষণ বিলাপ করিয়াছেন—বাল্মীকির বিভীষণ তাহা করেন নাই। কিন্তু বাল্মীকির বিভীষণ একস্থলে বলিয়াছেন—"আমি ইহার (মেঘনাদের) বধার্থী। কিন্তু শোকাশ্রু আমার দৃষ্টি অবরোধ করিতেছে, সুতরাং এই লক্ষ্মণই ইহাকে বধ করিবেন।"

বিভীষণের বিলাপ কাব্যের দিক হইতে চমৎকারই হইয়াছে। বিভীষণ মেঘনাদের নিধন চায়—ইহা যেমন সত্য, তাহার পতনে—একটা বিরাট পুরুষের পতনে—মহাবীর ভ্রাতুষ্পুত্রের পতনে বিভীষণের শোকও তেমনি সত্য। পরস্পরবিরোধী ভাবের দুইয়েতেই যে সত্য থাকিতে পারে—কবি তাহা এতদ্দ্বারা স্বীকার করিয়াছেন।

কৃত্তিবাস মোটামুটি বাল্মীকির অনুসরণ করিলেও মেঘনাদবধ ব্যাপারে তাঁহার নিজস্ব কল্পনার সংযোগও আছে। রামভক্ত কৃত্তিবাসের কাছে রামের শত্রুমাত্রই অশ্রদ্ধেয়। বাল্মীকি মেঘনাদের প্রতি যেটুকু শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, কৃত্তিবাস তাহাও দেখাইতে পারেন নাই। তাই ইন্দ্রজিতের পতনের পরে লিখিতে পারিয়াছেন—

ইন্দ্রজিতের কাটামুণ্ড উপরেতে চড়ি।
কোন কপি মারে লাথি কেহ মারে বাড়ি॥
কিল লাথি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া।
জীয়ন্তে না পারে কপি মড়ার উপর খাঁড়া॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে শিশুরঞ্জন রামায়ণ—ইহাতে উচ্চতর আদর্শের কথা কিছু নাই। কৃত্তিবাসের রুচিও মার্জ্জিত নয়। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তায় করিল প্রস্রাব॥
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মূতে।
ফলফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে॥

লক্ষ্মণ বানরসৈন্য লইয়া গড়ের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রথম যুদ্ধ হইল হনুমানের সঙ্গে। মধুসূদনের মেঘনাদ লক্ষ্মণকে বলিয়াছে—

নিরস্ত্র যে অরি
নহে রথিকুলপ্রথা। আঘাতিতে তারে
এ বিধি হে বীরবর, অবিদিত নহে
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে, কি কহিব আর?

লক্ষ্মণ উত্তর দিয়াছে—

জন্ম তোর রক্ষঃকুলে
তবে, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি পারি যে কৌশলে।

কৃত্তিবাসের হনুমান মেঘনাদকে এই শ্রেণীরই দোষারোপ করিয়াছে—

হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি
দেখ দেখি আজি তোরে দিব যমপুরী।
না জানি ধরিতে অস্ত্র বানরের জাতি
এ কারণে এত দিন তোর অব্যাহতি॥

মল্লযুদ্ধ কর বেটা ফেলে ধনুর্বাণ
একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ।

মেঘনাদকে কৃত্তিবাস নিরুত্তর করিয়া রাখিয়াছেন। যদি মেঘনাদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিত—তবে মেঘনাদকে দিয়া বলাইতেন—তুই পশু, তোর সঙ্গে আবার মল্লযুদ্ধ কি? পশুকে ত শিকার করিতে হয়। 'মারি পশু পারি যে কৌশলে।' কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র বালিবধের সময় ঠিক এই উত্তরই দিয়াছিলেন।

বটবৃক্ষের কথা কৃত্তিবাসও বলিয়াছেন—তবে মেঘনাদ বটবৃক্ষতলেই বসিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। কৃত্তিবাসের মেঘনাদ বিভীষণকে যে কথাগুলি বলিয়াছে মেঘনাদবধে সেইগুলিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

এক রক্তে জন্ম খুড়া রাক্ষসের কুলে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সর্ব্বলোকে বুলে॥
পিতার সমান তুমি পিতৃসহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর॥
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে॥
এত সব মারিয়াও ক্ষান্ত নহ মনে।
দিয়াছ সন্ধান বলি আমার মরণে॥
খাইলে রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠুর।
তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর॥
নির্গুণ সগুণ হয় তবু বলে জ্ঞাতি।
জ্ঞাতিবন্ধু মিলে সবে করয়ে বসতি॥
এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাই চিতে।
কোন্ লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে॥
বানর কটক খুড়া করহ অন্তর।
যজ্ঞপূর্ণ দিয়া আমি মাগি লই বর॥

বিভীষণ ইহার যে উত্তর দিলেন—তাহাতে তিনি আত্মরক্ষার জন্য রাঘবের পদাশ্রয় করিয়াছেন তাহা বলেন নাই—অনেকটা বাল্মীকির অনুসরণে ধর্মরক্ষার কথাই বলিয়াছেন।

রাক্ষস কুলেতে জন্ম নাহি কদাচার।
পরদ্রব্য না লই না করি পরদার॥
কতশত ঋষি মুনি মেরে কৈল পাপ।
অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ॥
ত্রিভুবন সনে তোর বাপের বিবাদ।
কত কাল পরে পাপ পাড়িল প্রমাদ॥

সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ—সময়েতে ফলে।
তোর বাপের ফল যে ফলিল এতকালে ॥

লক্ষ্মণের সহিত মেঘনাদের তুমুল যুদ্ধ বাধিল—ইন্দ্রজিতের সারথি ও অশ্বের সহিত রথ ধ্বংস পাইল। তখন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ক্ষণকাল দূরে গিয়া—

মায়াতে সে রথ খান করিল নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্টঘোড়া রথের যোগান ॥

মেঘনাদ ভীমমূর্ত্তিতে পুনরায় লক্ষ্মণের সম্মুখীন হইলে লক্ষ্মণ বলিল—

বেটা মায়ার নিদান
দেখেছিনু এক মূর্ত্তি এবে দেখি আন।

বিভীষণ বলিলেন—

মায়ারূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর।
মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল সত্বর ॥

ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে আকাশে উঠিয়া যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হনুমান আকাশে উঠিয়া আকাশ পাহারা দিতে লাগিল।

শূন্যে হায় ইন্দ্রজিৎ দেখে হনুমান।
দুইপায়ে ধরে তারে দিল একটান ॥
অন্তরীক্ষে দুইজনে লাগে হুড়াহুড়ি।
ভূমিতলে পড়ে দোঁহে লাগে জড়াজড়ি ॥
হেঁটে ইন্দ্রজিৎ পড়ে হনু তার পরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে।

এসব কৃত্তিবাসের শিশুরঞ্জন বর্ণনা মাত্র। বাল্মীকির সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক নাই—মেঘনাদ বধের সঙ্গে ত নাই-ই। যাহাই হউক, মেঘনাদ আবার মহাদর্পে লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিল। তখন ব্রহ্মা গত্যন্তর না দেখিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন,—লক্ষ্মণকে ব্রহ্মাস্ত্র পাঠাও। লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র পাইয়া ধনুকে ঘুড়িয়া বলিল—

যদি রঘুনাথ হ'ন বিষ্ণু অবতার।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার ॥

রাম যখন সত্যই বিষ্ণু অবতার—তখন ব্রহ্মাস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবে না কেন? এইভাবে বৈষ্ণব কৃত্তিবাস মেঘনাদের পতন দেখাইয়াছেন।

কৃত্তিবাস উত্তরা কাণ্ডে বলিয়াছেন—লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বৎসর অনশনে ও অনিদ্রায় তপস্যা করিয়াছিল এবং চতুর্দ্দশ বৎসর, নারীর মুখ দর্শন করে নাই—এই ব্রহ্মচর্য্যের বলেই লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিতে পারিয়াছিল। ইহার একটা সার্থকতা এই—মেঘনাদের মত রজোবলকে পরাজয় করিতে হইলে তদুপযোগী সত্ত্ববলের প্রয়োজন। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের মর্ম্মকথাও ইহাই।

বিদ্রোহী মধুসূদন

মাইকেলের চরিত্রে ছিল একটা সহজাত আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের দুর্দ্দান্ত বাসনা। জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু ইহাকেই বলিয়াছেন 'উচ্চাভিলাষ।' ইহা হইতেই আবাল্য তাঁহার মনে জাগিয়াছিল একটা বিদ্রোহের ভাব। তারপর তিনি যে শিক্ষাপরিবেষ্টনীর মধ্যে বিদ্যার্জ্জন করিলেন—তাহা ছিল বিদ্রোহেরই পাঠশালা, গুরুরা ছিলেন বিদ্রোহের অবতার, সতীর্থেরাও সকলেই বিদ্রোহদীক্ষায় দীক্ষিত। যে বিদ্যা মাইকেল এই পাঠশালায় লাভ করিলেন—তাহা স্বদেশীয় আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। যাহারা কেবল অর্থার্জ্জন-ক্ষমতা লাভের জন্যই বিদ্যার্জ্জন করে—বিদ্যা তাহাদের জীবনের অঙ্গীভূত হয় না—জীবনকে আমূল বিবর্ত্তিত করিতে পারে না। মাইকেল জীবিকার সুবিধার জন্য বিদ্যার্জ্জন করেন নাই—বিদ্যার জন্যই বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ঐ বিদ্যা ও গুরুর শিক্ষা তাঁহার জীবনের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। তাহার ফলে মাইকেল সে যুগে তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব চরিত্রগত বিদ্রোহভাবের সঙ্গে, যুগগত ও শিক্ষাগত বিদ্রোহভাব যুক্ত হইয়া তাঁহাকে ধূমকেতুর মত সকলের উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিল।

সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা, পারিবারিক জীবন, দাম্পত্য জীবন, আহারবিহার, বেশভূষা—সমস্তের বিরুদ্ধেই সে যুগে একটা বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছিল। মাইকেলের সহযোগীরা কোন-কোনটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, মাইকেল বিদ্রোহী হইয়াছিলেন প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে।

সেকালের শিক্ষা ছিল সাহিত্যমূলক। এই সাহিত্যমূলক শিক্ষার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন মাইকেল কতকটা হিন্দু কলেজে—অধিকাংশ নিজের সাধনায় ও অধ্যবসায়ে। মাইকেল চাহিয়াছিলেন অসাধারণ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে,—জনতার মধ্যে কিছুতেই তিনি নিজেকে হারাইতে চাহেন নাই। স্বভাবতই তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধান করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বড় সাহিত্যিক হওয়ার অর্থ ছিল বড় কবি হওয়া। একজন শ্রেষ্ঠ কবি হওয়ার জন্যই ছিল মাইকেলের সাধনা। মাইকেল যখন কবি হইলেন, তখন বিদ্রোহী মন লইয়াই কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—গতানুগতিকতা ভালো হউক, মন্দ হউক তাঁহার কাছে ছিল বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তাই তিনি যখন কাব্য রচনা করিলেন তখন তিনি ছন্দে, ভাষায়, গঠনভঙ্গীতে, ভাবাদর্শে, নৈতিক আদর্শে সর্ব্ব বিষয়ে বিদ্রোহী হইলেন। বাংলার পূর্ব্বতন কাব্যধারার সঙ্গে কিছুই মিলিল না। সবই হইল স্বতন্ত্র। মাইকেল বাল্মীকির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী হইলেন। তাঁহার নিজের চরিত্র, নিজের ভাবাদর্শ, নিজের মানস প্রকৃতি ফুটিয়া উঠিল তাঁহার কাব্যে। তাঁহার কাব্য তাই মহাকাব্য হইয়া উঠিল না, গীতিকাব্যের সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। মাইকেল কাব্যের প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন—

"গাহিব মা বীররসে ভাসি মহাগীত।"

এই সংকল্প লইয়াই মাইকেল কাব্য আরম্ভ করেন, কিন্তু যিনি জীবনে কোন সংকল্পই রাখিতে পারিতেন না—তিনি এ সংকল্পই বা কি করিয়া রাখিবেন? ফলে, কাব্যখানি বীররসে ভাসে নাই, করুণ রসে ডুবিয়াছে। মাইকেলের রাবণ সত্যই ত রাক্ষস নয়, প্রমীলা সত্যই ত রাক্ষসী নয়। মিলটনের শয়তানের অনেক বৃত্তি রাবণের ছিল, কিন্তু সত্যই ত সে শয়তান নয়। রাবণের জীবনে বিকত্থন ও আস্ফালনের উপলক্ষের চেয়ে স্নেহ প্রেম ভালবাসার কথার উপলক্ষ ছিল ঢের বেশি। মাইকেল যে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাতে বীরত্বের অবসর অপেক্ষা অশ্রুপাতের অবসর ছিল ঢের বেশি।

তাহা ছাড়া—কাব্যখানি শুধু বিয়োগান্ত নয়, বিয়োগাঢ্য। অতএব করুণরসের অধিকারই ইহাতে আয়ততর।

কেবল বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে নয়, কবির নিজের প্রকৃতির আমন্ত্রণেও কারুণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। নতুবা সীতা-সরমার চিত্রটি ত বিষয়বস্তুর পক্ষে অনিবার্য্য বা অপরিহার্য্য ছিল না—কবির নিজস্ব প্রকৃতিই সীতা-সরমাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে।

কবির নিজস্ব নৈতিক আদর্শও কাব্যখানিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। কবির চরিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে রাবণচরিত্রে। কবি তাঁহার নিজের জীবনকেই বা কি করিয়া অতিক্রম করিবেন? তাঁহার বাঙ্গালী হৃদয়কেই বা কি করিয়া অস্বীকার করিবেন? এজন্য যে দৃঢ়তা বা কঠোরতার প্রয়োজন তাহা তাঁহার পাশ্চাত্য গুরুদেব মত তাঁহারও ছিল না। আশার ছলনে প্রলুব্ধ পদে পদে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও পরাভূত জীবনের কারুণ্য তাঁহার কাব্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার করুণাঘন বাঙ্গালী হৃদয়খানিও কোটপ্যান্টে ঢাকা পড়ে নাই। আচরণের দ্বারে তিনি প্রহরী বসাইয়াছিলেন—কিন্তু লেখনীর মুখে কোন প্রহরী ছিল না। তাই তিনি মহানবমীর সংকল্প লইয়া আগাগোড়া মহাদশমীর গান গাহিয়াছেন—তাঁহার মেঘনাদবধ মহাকাব্য হয় নাই, মহাগীতই হইয়াছে।

করুণরসের প্রাবল্য ইহাতে ঘটিয়াছে বটে কিন্তু বীররসেরও ইহাতে স্থান অপ্রশস্ত নয়। যেখানে যেখানে বীররসের প্রাবল্য এবং যেখানে যেখানে বিরাট ও অলৌকিকের বর্ণনা সেখানে সেখানে এ কাব্য মহাকাব্যেরই লক্ষণযুক্ত। ফলে, ইহা গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ। মাইকেলের প্রবর্ত্তিত ছন্দই এই অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটাইতে পারিয়াছে।

মাইকেলের রাক্ষস-রাক্ষসীরা মানব-মানবী; বাল্মীকির কল্পিত রাক্ষসদের তিনি একটি বীরজাতির মানুষ বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন কিন্তু বাল্মীকির কল্পিত বানরদেরও তিনি এক শ্রেণীর বীর্য্যবান্ মানুষ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন নাই, তাহাদের কতকগুলো (দণ্ডক অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী) পশুই মনে করিয়াছেন। পশুর সাহায্যে রাম লক্ষ্মণ বীর জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন—এই কল্পনাই রাম লক্ষ্মণকে মধুসূদনের চোখে ছোট করিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া, রামলক্ষ্মণ অসহায়, কেবলমাত্র দেববলে বলী, আর বিশ্বাসঘাতক (রক্ষঃকুলকালি) বিভীষণের সাহায্যে বিজয়ী বলিয়া স্বতই রাম লক্ষ্মণ মাইকেলের কাছে হেয় হইয়া পড়িয়াছেন।

পক্ষান্তরে দেবলোকজয়ী রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ দেবগণ-পরিবেষ্টিত স্বপৌরুষে বলবান্। শেষ পর্য্যন্ত দেবতাদেরই ছলবলকৌশলে রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ দেবতার সাহায্য হইতে বঞ্চিত, নিজের বাহুবলের উপরই নির্ভরশীল। ইহাতে রাবণ ও ইন্দ্রজিৎই রামলক্ষ্মণের চেয়ে বড় ত বটেই, দেবতাদের চেয়েও বড়। বাংলা সাহিত্যে দেবতাকে বড় করিয়া বরাবর মানুষকে ছোট করিয়া আসা হইয়াছে। বিদ্রোহী মাইকেলই সর্ব্বপ্রথমে রাক্ষসদের মারফতে বাংলা সাহিত্যে মানুষকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন।

মাইকেল দেখাইয়াছেন—দেবতাদের আশ্রয় করিয়া নিয়তি শেষ পর্য্যন্ত বিজয়িনী হইতেছে বটে, কিন্তু তবু মানুষের পুরুষকারই বড়, পুরুষকারেরই জয়গান করিতে হইবে,—শেষ পর্য্যন্ত মনসার জয় হইলেও যেমন চাঁদ সদাগরই প্রাচীন সাহিত্যে নমস্য।

এখন কথা হইতেছে মানুষকে যদি বড় করিতেই হয় তবে শৌর্য্যবলকে মানদণ্ড ধরা হইল কেন? শৌর্য্যবল ত পশুবল। মাইকেল এ আদর্শ পাইয়াছেন হোমার হইতে। আমাদের বক্তব্য, শৌর্য্যবলকে মানদণ্ড করার জন্য রসের দিক হইতে কাব্যের কোন ক্ষতি হয় নাই, তপোবলকে মানদণ্ড করিয়া নৈতিক বলের জয়গান করিয়াও হেমচন্দ্র ত মাইকেলের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। আদিম যুগে শৌর্য্যবলই ত ছিল মানবতার উৎকর্ষের মানদণ্ড, বর্ত্তমান যুগের বিচারে আজ অসমীচীন মনে হইতেছে। হোমারকে অনুসরণ করিতে গিয়া কবি সেই আদিম যুগের কথা ভাবিয়াছেন—রাবণের ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ আদিম কালেরই উপযোগী। তাই মেঘনাদ জানে স্বজাতি স্বদেশ স্ববংশ রক্ষাই একমাত্র ধর্ম্ম, তাহার চেয়ে বড় ধর্ম্ম নাই। বিভীষণ তাই ধর্ম্মদ্রোহী। বাল্মীকি যে কতটা আগাইয়া ছিলেন তাহা তিনি ভাবেন নাই। যে বলই মানদণ্ড হউক, মাইকেলের উদ্দেশ্য দেবত্বের উপর মানবতার প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা।

মাইকেল মানব-সভ্যতার যে আদিম যুগের আদর্শ-অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন আবার সেই যুগই জগতে যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ জগতে এমন লোকের অভাব নাই, যাহারা মনে করে—পশুবলে বলীয়ান স্বজাতিভক্ত, পরাধর্ম্মাসহিষ্ণু, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ লোকেরাই রাজনীতিক জীবনে যথার্থ পথ অনুসরণ করিতেছে। মাইকেল ছিলেন ইঁহাদেরই দলেরই আদিগুরু। ইঁহারা রামকে এবং পতিতপাবন সীতারামের মহাভক্তকেও কৃপার পাত্রই মনে করেন।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকপাত হইলে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে বহু দোষত্রুটী, অঙ্গহানি ও কুসংস্কার ধরা পড়িয়া গেল। তখন দেশের শিক্ষিত লোকেরা উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ সংস্কারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, কেহ কেহ সেগুলির আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া হাহুতাশ করিলেন। আবার কেহ কেহ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কিছুতেই অসত্যের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন না—তাঁহারা একেবারে সমগ্র সমাজ ও ধর্ম্মকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যত হইলেন। যাহা অসত্য তাহার সঙ্গে একাশ্রয়ে অবস্থিত সত্য, যাহা কুসংস্কার তাহার সঙ্গে

সৎসংস্কার, যাহা অন্যায় তাহার সঙ্গে ন্যায্য যাহা জড়িত আছে, তাহাও যদি ধ্বংস পায় পাক, কিন্তু অসত্য, অন্যায়, কুসংস্কারের আশ্রয় আর বাথাই হইবে না। এই যে নির্বিচারে ভাঙ্গনের বাসনা—ইহার সহিত আত্মিক বলের বা নৈতিক বলের সম্পর্ক নাই—পাশবিক বলেরই সম্পর্ক। ফলে বিদ্রোহী মাইকেলের কাছে সেই যুগসন্ধির কালে পাশবিক বলটাই মানবতার আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। এই ধ্বংসমূলক পাশবিক বলটাই তাঁহার রচিত কাব্যেও আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। তাই মনে হয়, মেঘনাদ বধের নৈতিক আদর্শের সহিত সেকালের বাংলার যুগধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে।

তাছা ছাডা মাইকেলের চরিত্র যাঁহারা মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, কেন মেঘনাদ ও রাবণের চরিত্রই তাঁহার হৃদয়ের অর্ঘ্য লাভ করিয়াছে। Tragedyর সর্ব্ববিধ লক্ষণ তাঁহার ও তাঁহার কল্পিত রাবণের মধ্যেই সমান ভাবে বর্ত্তমান। মেঘনাদবধের লেখক মাইকেল না হইয়া তাঁহার বন্ধু ভূদেব হইলে রামলক্ষ্মণই বড় হইয়া উঠিত এবং বিভীষণচরিত্রেরও মহত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইত।

মধুসূদনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করি—

ত্যজিলে স্বধর্ম্ম তুমি বিসর্জ্জিলে মোদের সমাজ
আচার, জীবন ধারা। সে ত সবি বাহিরের সাজ।
অন্তর তোমার চির বাঙ্গালীর, নবনী কোমল,
মমতা-ভিখারী কবি। কপোতাক্ষ প্রবাহের জল
ফল্গুধারা রূপে চির বহিয়াছে প্রাণ-মরুতলে,
অনুতাপ অশ্রু তব গলিয়াছে যায় পলে পলে
বিন্দু বিন্দু, তাই মোরা ভুলিয়াছি ভুলভ্রান্তি সবি
তাই তোমা ভালবাসি প্রাণ ভরি', হে বিধর্ম্মী কবি।

ভুলে যেতে পারি ক্ষুব্ধ রাবণের কুপিত হুঙ্কার,
তিলোত্তমা রূপচ্ছটা, লঙ্কার সে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার,
জনার আগ্নেয়ী বাণী,—ভুলিব না সে মধু মমতা,
বাঙ্গালী প্রাণের রসে সিক্ত সীতা-সরমার কথা।

কত ভুলই করিয়াছ এ জীবনে, ভুলিয়াছি সব
ভুলের কাঁটায় ভরা মালঞ্চের কুসুম-সৌরভ
কে ভুলিবে? সে সৌরভে ভারতীর পূজার মন্দির
আজও আমোদিত করি,—প্রমুদিত আজিও সমীর।
দংশবিষ লয়ে কোথা মক্ষিকারা গেছে আজ উড়ে,
কুহরে কুহরে আজ মধুচক্রে মধু শুধু ঝুঁরে।

মধুসূদনের কাব্য-বিচার

মাইকেলের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ মাইকেলের বাল্য জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—কপোতাক্ষ তীরের পল্লী-প্রকৃতি তাঁহার অন্তরে কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ সাধন করিয়াছে। কপোতাক্ষতীরের প্রকৃতিকে তিনি বলিয়াছেন Meet nurse for a poetic child. একথা ঠিক নয়। মাইকেল সহজাত কবিশক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন—দেশবিদেশের রাশি রাশি সাহিত্য তাঁহার সেই দেবদুর্লভ কবিশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এদেশে অবিরত সাহিত্য পাঠ করিয়া যদি কেহ বড় কবি হইয়া থাকেন তবে তিনি মাইকেল। প্রকৃতির কাছে মাইকেল একটুকুও ঋণী নহেন। তাহা যদি হইত তাহা হইলে তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি সমাদরের আসন লাভ করিত। মাইকেলের কাব্যে কচিৎ কখনো প্রকৃতির সাক্ষাৎ মেলে, তাহাও নির্জীব পটভূমিকা রূপে —নয়ত মামুলী প্রথার অনুসৃতিরূপে। "তাহার মধ্যে সেই সোনার কাঠির স্পর্শ নাই যাহার স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে।" (রবীন্দ্রনাথ)। (তাঁহার দৃষ্টি প্রকৃতির দিকে ছিলনা—সাধারণ মানুষের দিকেও ছিলনা—তাঁহার দৃষ্টি ছিল অসমান্য মানুষের দিকে। এ দৃষ্টিও চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টি নয়—স্বপ্নদৃষ্টি বা কল্পদৃষ্টি।) এই দৃষ্টিতে মানুষ ও মানুষের সৃষ্টির যাহা কিছু বৃহৎ তাহা বৃহত্তর, যাহাকিছু মহৎ তাহা মহত্তর হইয়া উঠিয়াছে।) কবি তাঁহার কল্পসৃষ্টির বর্ণনা করিতে গিয়া যখন ভাষা খুঁজিয়া পান নাই—তখন অন্য কোন কবিকল্পিত —অনেকস্থলে পুরাণপ্রসিদ্ধ—ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত আনুরূপ্য দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।*

এ বিষয়ে তিনি মিলটনের অনুগামী।

দৃষ্টি যাঁহার চারিপাশে, তিনিই প্রকৃতিকে দেখিতে পান—দৃষ্টি যাঁহার দেশেকালে দূরবর্তী প্রদেশে বা কল্পলোকে তাঁহার দৃষ্টি ধাবিত হয় শূন্য পথে—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়না।

---

* যেমন—

> কনক আসনে বসি দশানন বলী
> হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
> তেজঃপুঞ্জ। শতশত পাত্রমিত্র আদি
> সভাসদ্ নতভাবে বসে চারিদিকে।
> ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত
> তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস সরসে
> সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
> শ্বেতরক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারি সারি
> ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ ফণীন্দ্র যেমতি
> বিস্তারি অযুত ফণা ধরেন আদরে
> ধরারে।

প্রকৃতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিতে হয়। প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এই ব্যবধানই তাহার মনে প্রকৃতির প্রতি গভীর মমতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

মাইকেল হিন্দুধর্ম্ম, সমাজ, পারিবারিক-জীবন ত্যাগ করিয়া 'নিজবাসভূমে পরবাসী' হইয়াছিলেন। তিনি অনুতপ্ত হইয়া নিঃসম্বল শেষ জীবনেও বাঙ্গালীর বেশভূষা আহারবিহার আচারবিচার গ্রহণ করেন নাই। খৃষ্টান থাকিয়াও তিনি খাঁটি বাঙ্গালী জীবন যাপন করিতে পারিতেন। তাঁহার কাব্যে হিন্দুর পূজার্চ্চনা, আচার সংস্কার, শুচিতানিষ্ঠা, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কথা আছে—কোথাও আলঙ্কারিক সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য—কোথাও মনোবেগের সুপ্রকাশের জন্য। ইহার জন্য অনেকে মনে করেন—মাইকেল খৃষ্টান হইলেও মনে মনে হিন্দু ছিলেন। ইহা প্রাকৃত জনের কথা। প্রকৃত পক্ষে তিনি সাহেবই বনিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি জানিতেন রসসৃষ্টি করিতে হইলে যে দেশের ভাষায় কাব্য রচনা করিতে হইবে সেই দেশের ভাষায় ও সাহিত্যিক আবেষ্টনীতে যাহা কিছু শুচি সুন্দর, যাহা কিছু সম্পৎ সম্বল, উপাদান, ও উপকরণ-স্বরূপ তাহার সবই গ্রহণ করিতে হইবে,—নতুবা কাব্য হয় না। কোন ভাষায় রস সৃষ্টি করিতে হইলে সে ভাষায়, যাহাদের ভাষা তাহাদের ঐতিহ্যে, তাহাদের মনোভূমিতে রসের অনুকূল যাহা কিছু আছে—সমস্তেরই যথাযথ বিনিয়োগ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, তিনি কেবল গৌড়জনের জন্যই মধুচক্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনের জন্য কাব্য রচনা করিয়াছেন—তিনি ব্রাহ্ম, হিন্দুসংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনিও এ সত্য ভুলেন নাই। এই সত্য অনেক মুসলমান কবি বুঝেন না বলিয়া তাঁহারা গৌড়জনের কবি হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন বিজয়াদশমীর প্রতিমা বিসর্জ্জনের কথা বলিয়াছেন —তখন ঔপম্যের জন্যই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—প্রতিমাপূজার প্রতি সত্যই তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তুলসীর তলে দেউটির কথাও উপমার খাতিরে।

তিনি যখন বলিয়াছেন—

> গঙ্গাজলে পূর্ণ ঘট হায় ঠেলি ফেলি'
> কেন অবগাহ দেব কর্ম্মনাশা জলে ?
> অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি !

তখন গঙ্গা ও ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য বলেন নাই। দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের জন্য ও হিন্দুসতী ভানুমতীর মুখের উপযোগী কথা বলিয়াই গঙ্গা ও ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। মাইকেলের বাগ্দেবী সর্ব্বদেশের কবিদের স্মরণীয়া ও বরণীয়া কাব্যলক্ষ্মী ছাড়া অন্য কেহ নহেন।

একজন সমালোচক বলিয়াছিলেন—"এ দেশে ধর্ম্মবিষয় ছাড়া উৎকৃষ্ট কাব্য হয় না। মধুসূদন তাহা বিলম্বে অনুভব করিয়াছিলেন—তাই ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখিয়া তাঁহার ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন করিয়াছিলেন।"

দুঃখের বিষয় সমালোচকের ধারণাই ভ্রান্ত। মেঘনাদবধই যে মাইকেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট

কাব্য তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। উৎকৃষ্ট কাব্য রচনায় ধর্ম বাধাই জন্মায়, সহায় হয় না। আর ব্রজাঙ্গনাও ধর্মমূলক কাব্যও নয়, উৎকৃষ্ট কাব্যও নয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া রচিত হইলেও এই কাব্যে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত নাই। এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ প্রেমিক, রাধা একজন প্রেমিকা মাত্র। কবিতাগুলি মিষ্টিক প্রকৃতির নয়, সম্পূর্ণ রোমান্টিক প্রকৃতির। কবিতাগুলিতে প্রেমের গূঢ়তা বা গাঢ়তাও প্রকাশিত হয় নাই। এইগুলির দ্বারা মধুসূদন বাংলায় গীতি কবিতার একটা অভিনব আকৃতি ও প্রকৃতিরই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা পাঁচালী, কবির গান ও সখী-সংবাদ শ্রেণীর সঙ্গীতে গ্রাম্যতা লাভ করিয়াছিল—মধুসূদন ঐ লীলাকে আবার সাহিত্যের শিষ্ট গোষ্ঠীতে স্থান দিলেন। এই হিসাবে ব্রজাঙ্গনাকে বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে যোগসূত্র বলা যাইতে পারে।

(মাইকেলের রাবণ ধর্ম্মাধর্ম্মবোধহীন আদিম মানবজাতির অতিমানব। পাশবিক বলই আদিম মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ বল ও সম্পদ। এই পাশবিক বলের চূড়ান্ত নিদর্শনই রাবণ চরিত্রে রূপ লাভ করিয়াছে। সে জানে পাশবিক বলের চূড়ান্ত প্রকাশই তাহার আত্মাভিব্যক্তি—তাহাই তাহার পৌরুষ। ইহাকেই সে মানবধর্ম্ম বলিয়া জানে। সভ্য মানবের সূক্ষ্ম ধর্ম্মবোধ তাহার নাই। এই বোধ তাহার অনুগত রাক্ষসগণেরও নাই। বিভীষণের এই সূক্ষ্ম ধর্ম্মবোধ ছিল—তাহাকে সে পদাঘাতের যোগ্যই ভাবিয়াছিল।) সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়া সে যে কোন পাপ করিয়াছে তাহা সে মনে করিত না। সে জানিত যে রক্ষা করিতে পারে না—তাহার সুন্দরী রমণীর অধিকারী হইবার অধিকার নাই, দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা বোধও তাহার নাই, তাহার মতে ভিখারী রাঘবের সঙ্গিনী হইবার উপযুক্তা নয় সীতা, তাহার যথাস্থান লঙ্কেশ্বরের সিংহাসনের বামার্দ্ধ-ভাগ। তাহার মতে সীতাকে সে-ই উদ্ধার করিয়াছে। সামান্য মানুষের এ কি কম স্পর্দ্ধা যে কতকগুলো বনের পশু সঙ্গে করিয়া সে আসে তাহার বনবাস সঙ্গিনীকে সুরাসুরত্রাস বিশ্বজয়ী বীরের গ্রাস হইতে ছিনাইয়া লইতে। এই স্পর্দ্ধার জন্য রামই অপরাধী। সে বীরধর্ম্মই পালন করিয়াছে। তাহা ছাড়া, সূর্পণখার লাঞ্ছনার জন্য রাম লক্ষ্মণ দণ্ডনীয়, কেবল সীতা হরণ করায় তাহাদের গুরু পাপে লঘু দণ্ডই হইয়াছে। সূর্পণখা কোন অপরাধ করিয়াছে রাবণ তাহা মনেই করে না। কারণ, যে ধর্ম্মবোধ থাকিলে সূর্পণখাকে অপরাধিনী মনে করা যাইতে পারে সে ধর্ম্মবোধ তাহার স্বভাবতই ছিল না। এমন যে রাবণ, আর্য্যজাতির ধর্ম্মবোধ তাহার মধ্যে জন্মে নাই বটে কিন্তু তাহারও স্নেহ ভালবাসা ছিল। তাঁহার অধিনায়কতা করিবার সকল গুণই ছিল। তাই রাক্ষসগণ ছিল তাহার বশীভূত, তাহার জন্য তাহার দলেদলে প্রাণ দিয়াছিল—তাহারাও ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করে নাই।

রাবণ দুইজন মানুষ ও তাহার বানরবাহিনীকে গ্রাহ্যই করে নাই—তাই সাগর বাঁধিয়া তাহারা লঙ্কায় উপস্থিত হইল। রাবণ ক্রমে বুঝিল নরবানর উপেক্ষণীয় নয়। তাহারা দেহে ও অস্ত্রে তাহার এবং তাহার পুত্রপৌত্র ও অনুচরগণের মত বলশালী নয় বটে, কিন্তু অন্য কোন অদৃষ্ট শক্তি তাহাদের অসাধ্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। এই শক্তির কতকটা আধিদৈবিক

কতকটা আধিভৌতিক। এই শক্তিই নিয়তি। রাবণ ধর্ম্ম মানে নাই, কিন্তু নিয়তিকে মানিতে বাধ্য হইয়াছে। এই নিয়তির সহিতও রাবণ যুঝিতে চাহিয়াছে। কারণ, সে জানে পাশবিক বলের দ্বারা বিশ্বে সমস্তের সঙ্গেই যুদ্ধ করা চলে। কিন্তু যত বড় বড় দুর্জ্জয় বীরগণের পতন হইতে লাগিল—ততই তাঁহার কণ্ঠে আস্ফালনের তেজ কমিয়া আসিতে লাগিল—বীর রস ক্রমে করুণ রসে পরিণত হইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত রাবণকে নিয়তির শক্তির অজেয়তা স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু তবু সে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল না—কারণ, তাহার বিশ্বাস ছিল 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।'

মেঘনাদ রাবণেরই আত্মজ, রাবণেরই অংশীভূত। অতএব মেঘনাদ সম্বন্ধে পৃথক করিয়া কিছুই বলিবার নাই। এই যে রাবণ আদিম মনুষ্য জাতির প্রতিনিধি—ইহার প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য কবির সহানুভূতি কেন? (মাইকেল রাবণকে সার্ব্বভৌম মানবতার প্রতীকস্বরূপ ধরিয়াছেন নিয়তির সহিত সংগ্রামে আজিকার মানুষ কেবল পশুবলে বলীয়ান নয়, তাহার সম্বল এখন বহু প্রকারের বল। তবু নিয়তির বিরুদ্ধে তাহার সকল বলের পরিণতি রাবণ-মেঘনাদেরই মত। নিয়তির সহিত সংগ্রামে শতশত ঐরাবতের বলও নিষ্ফল, দুর্বল মানুষের ত কথাই নাই। মানুষের এই অসহায়তাই কবির চিত্তকে—ও কবির নিজের বারংবার পরাজিত পুরুষকারকে ব্যথিত করিয়াছে। এই ব্যথাই পুরুষকারের মূর্ত্তপ্রতীক রাবণ-মেঘনাদের প্রতি সমব্যথা বা সহানুভূতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সমবেদনাই কাব্যের পক্ষে ভূষণ হইয়াছে, দূষণ হইয়া উঠে নাই।) কবি রাবণাশ্রিত পুরুষকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন—তাহাতে স্বভাবতই "নিজ বলে সতত দুর্ব্বল দেবের প্রসাদে সুফলভোগী দৈববলে বলী" রাম লক্ষ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকটিত হইয়াছে। বাল্মীকি বিভীষণকে পরম ধার্ম্মিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—তিনি ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের অনুরোধে রাবণকে ত্যাগ করিয়া রামপক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন—মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের দাসীপুত্র যুযুৎসুর মত। বাংলাদেশের লোকে এই বিভীষণের এই চরিত্রমাহাত্ম্য উপলব্ধি করে নাই। বাঙ্গালীরা বিভীষণকে বিশ্বাসঘাতক, স্বজনবিদ্বেষী—স্বার্থপর ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছে। 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' বলিয়া প্রবাদবচনের সৃষ্টি হইয়াছে—বিশ্বাসঘাতক ও বিভীষণ একার্থক হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীরা রামকে ভগবানের অবতার মনে করে। রাবণকে মহাপাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করে, কিন্তু 'রাঘবের পদাশ্রয়ী' বিভীষণকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে নাই—বিভীষণ সম্বন্ধে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার একেবারেই করে নাই।

মাইকেল তাঁহার কাব্যের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই বিভীষণকে ঘৃণিত চরিত্র বলিয়া পরিকল্পিত করিয়াছেন। মাইকেলের বিভীষণ স্বার্থপর, রাবণকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সে লঙ্কার রাজা হইতে চায়। তাহাছাড়া, লঙ্কা পাপভারে ডুবিবে, অতএব সে কেন অগ্রজের পাপে ডুবিতে চায়, আত্মরক্ষার জন্য সে রামের চরণে আশ্রয় লইয়াছে।

বিভীষণ আগে হইতেই বাঙ্গালীর মনে শ্রদ্ধার আসন পায় নাই। কাজেই বিভীষণ-চরিত্র অঙ্কনে মাইকেলের কোন সঙ্কোচ ছিল না—ইহার জন্য তাঁহাকে কোন জবাবদিহি দিতে হয় নাই।

মাইকেলের মতে রাক্ষসদের সূক্ষ্ম ধর্ম্মবোধ নাই—কিন্তু তাহাদেরও একটা সভ্যতা আছে। সেই সভ্যতার আদর্শে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, স্বজাতিপ্রীতি সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। যাহারা ইহার চেয়েও বড় কোন আদর্শকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে—তাহারা অসভ্য বর্ব্বর। মেঘনাদ তাই বলিতেছে—বন্য বর্ব্বর রাম লক্ষ্মণের সহবাসে সুসভ্য রাক্ষস বিভীষণও বর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে। আচারে আচরণে আহারে বিহারে সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে ইউরোপীয় হইলেও কবি যে বাঙ্গালী তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। (তাঁহার চারিপাশের বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা অনেকরূপেই তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু এই জাতির জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠাও ছিল। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বাঙ্গালী ধর্ম্মভীরু, শান্তিপ্রিয়, হৃদয়বান্, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান্ জাতি। এত গুণ থাকিতেও জীবনসংগ্রামে বাঙ্গালী অনুপযুক্ত, তাহার সংকল্পে দৃঢ়তা নাই, শৌর্য্য নাই, সাহস নাই, তাহার চরিত্রে পৌরুষবলের অভাব, পদে পদে ধর্ম্মের বিধিনিষেধ মানিয়া চলে বলিয়া বাঙ্গালীরা আগাইতে পারিতেছে না। বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে কবির এই ধারণা হইতে কবির মনে মনুষ্যত্বের একটা অভিনব আদর্শ প্রবল হইয়া উঠে। ইহা মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ আদর্শ নয়। বাঙ্গালী চরিত্রে যে যে বৃত্তির অভাব সেই সেই বৃত্তির সমবায়ে এই আদর্শের সৃষ্টি।) তাঁহার এই আদর্শে অতিরিক্ত Emphasis দেওয়ার ফলে রাবণ চরিত্রের রূপান্তর সাধন। বাণিজ্যবিমুখ জাতিকে একদিন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা মাড়োয়ারী হও।" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই এই উক্তির উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিয়াছিলেন। মাইকেল যদি বাঙ্গালী জাতিকে বলিতেন—"তোমরা রাবণ হও।" তাহা হইলে তাহার লক্ষ্যার্থ ঐ ভাবেই বুঝিতে হইত। (রাবণের আদর্শেও একটা জাতীয় সত্য আছে,—কবি তাহাকে কাব্যকল্পনার অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন বলিয়া অনেকের চোখে বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।)

এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে, বাঙ্গালী চরিত্রে যে যে বৃত্তি নাই—সেই সেই বৃত্তির সমবায়ে যে চরিত্রের সৃষ্টি, তাহাত বাঙ্গালীর পক্ষে অবাস্তব। এইরূপ চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া যে কাব্য রচিত—তাহা বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ কেমন করিয়া হইল? একটি কথা বলিতে ভুল হইয়াছে। কবি রাবণ চরিত্র গঠনে বাঙ্গালীর হৃদয়বত্তা—তাহার পারিবারিক জীবনের সৌকুমার্য্য বর্জ্জন করেন নাই। বাঙ্গালীর সঙ্গে রাবণ চরিত্রের ঐখানে সংযোগ। তাই রাবণচরিত্র বাঙ্গালীর কাছে অবাস্তব হইয়া উঠে নাই। এই জন্যই মেঘনাদ-বধ গ্রীক কাব্যের অনুগামী হইয়াও বাঙ্গালীর নিজস্ব কাব্য হইয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গালী হৃদয়ের কারুণ্য মেঘনাদ-বধকে গীতিকাব্যের উচ্ছ্বাসে বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। তবে এ কথাও ঠিক, মধুসূদন খৃষ্টান হইলেও আজিকার তথাকথিত ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরা যতটা অবাঙ্গালী ও অহিন্দু হইয়াছেন—তিনি ততটা হইতে পারেন নাই। (তাঁহার ম্লেচ্ছ জীবনের ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীন দ্বাদশ শিব মন্দিরের চূড়াগুলি দেখা যাইত। কাব্যের প্রয়োজনে তিনি হিন্দু সংস্কার ইত্যাদির প্রয়োগ করিয়াছেন না বলিয়া বরং বলা যায়, কাব্যের রসসৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি হিন্দু মনটিকে ও বাঙ্গালী স্বভাবটিকে ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন। "বহু বৎসরের বহু বিরুদ্ধ ভাব-চিন্তা নানা বিজাতীয় সংস্কারের

উপরিসঞ্চিত স্তরভেদ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার জীবনের সেই নিম্নতলের ভাণ্ডারে পৌঁছিতে হইয়াছিল।"—মোহিত লাল।)

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন 'দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।' বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রকে জয়দেব ও মধুসূদনের সমশ্রেণীভুক্ত মনে করেন নাই। কবি বলিতে এখানে বঙ্কিম যুগপ্রবর্ত্তক কবিগুরু মনে করিয়াছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস,—জয়দেবেরই অনুকারক। ভারতচন্দ্র তাঁহার মতে শব্দশিল্পী, মুকুন্দরাম সমাজচিত্রশিল্পী। মাইকেল নবযুগের প্রবর্ত্তক।

(বঙ্গ সাহিত্যে সনেট মাইকেলের একটি অপূর্ব দান। তিনি পেট্রার্কা প্রবর্ত্তিত সনেটের রূপই বাংলায় প্রবর্ত্তন করেন। সংহত পরিসরের মধ্যে একটি ভাবকে প্রকাশ করার পক্ষে ইহা সুন্দর ব্যবস্থা। গীতিকবিতার প্রেরণা দেয় মনের আবেগ, কিন্তু আবেগে সংযম না থাকিলে সর্বাঙ্গসুন্দর গীতিকবিতা হয় না। সনেট বাধ্যতামূলক সংযমের বন্ধন। মাইকেলের ভাবোচ্ছ্বাসে স্বাভাবিক সংযম ছিল না, হয়ত তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়াই এই সনেটের বন্ধন বরণ করিয়া লইয়াছেন। কয়েকটি সনেট বেশ রস ঘন হইয়াছে।

মাইকেলের সর্বোৎকৃষ্ট গীতিকবিতাগুলি সনেটের আকারেই লিখিত। সনেটের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, প্রীতি, কারুণ্য, অনুতাপ ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কবি তাঁহার কবিজীবনের জন্য যে স্বদেশীয় কবিগণের নিকট ঋণী—তাঁহাদের উদ্দেশে একটি করিয়া তিনি সনেট রচনা করিয়াছেন। কবি অবশ্য প্রথমেই পেট্রার্কার গুণগান করিয়াছেন—"বাগ্দেবীর বরে বড়ই যশস্বী সাধু" বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বঙ্গ সরস্বতীর চরণে তাঁহার দান নিবেদন করিয়াছেন। বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব, কাশীরাম, কৃত্তিবাস ইত্যাদি যে সকল কবির কাছে মাইকেল ঋণী তাঁহাদের উদ্দেশে তিনি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। মুকুন্দরাম 'শ্রীমন্তের টোপর' ও 'কমলে কামিনীর' এবং ভারতচন্দ্র 'ঈশ্বর পাটনী' ও 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপির' মারফতে কবির কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উদ্দেশে সনেটে কবিকে কাব্য-ব্রজধামে রাখালরাজ বলিয়াছেন—দেশ ক্রমে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতেছে বলিয়া কবি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য মাইকেল নিজেই দায়ী, তিনিই দেশবাসীকে গুপ্ত কবির কথা ভুলাইয়া দিয়াছেন। এই সনেট লিখিয়া কবি যেন তাঁহার তথাকথিত অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে সনেট গভীর কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য খুব বড় একটা পরিসরের প্রয়োজন হয় না—সনেটের পরিসরই যথেষ্ট। কবি শ্রদ্ধানিবেদন ও প্রশস্তির একটি সুন্দর অঞ্জলিরূপ সনেটের ছলে আমাদের দান করিয়া গিয়াছেন।

সনেটগুলি আবদ্ধ হইয়াছে—'বঙ্গভাষা' দিয়া। অনুতাপের আন্তরিকতায় ইহা সাফল্য-লাভ করিয়াছে। 'মিত্রাক্ষর' সনেটটিও বঙ্গভাষার উদ্দেশে। বঙ্গভাষাকে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিয়াছেন—যে তোমার চরণে মিত্রাক্ষর বেড়ী পরাইয়াছে সে বড়ই নিষ্ঠুর। কবি এই আক্ষেপ টুকু অমিত্রাক্ষরে করিলেই ভালো করিতেন। যাহারা মিত্রাক্ষর বেড়ী পরাইয়াছে তাহারা ত

নিষ্ঠুর। কবি সে হিসাবে ঘোরতর নিষ্ঠুর হইয়া পড়িলেন। সনেটের মিত্রাক্ষর যে বেড়ীর উপর বেড়ী—কঠোরতর বেড়ী। যাক—কবির শেষ সনেটটি কাব্যলক্ষ্মী বরদার উদ্দেশে। মাইকেলের গীতি কবিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে ইহা উৎকলন করি।

বিসর্জ্জিব আজি মাগো বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়মণ্ডপ হায় অন্ধকার করি)
ও প্রতিমা। নিবাইল দেখ হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি।
শুকাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্ম। ডুবিল সে তরী
কাব্যনদে, খেলাইনু যারে পদবলে
অল্পদিন। ন'বিনু মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে-অবোধ আমি। ডাকিলা যৌবনে,
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভোলে তারে ?)
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে।
এই বর হে বরদে, মাগি শেষবারে
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত রতনে।

অনুতাপ দিয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর আরম্ভ অনুতাপেই শেষ। এই সনেটটিতে কবির হৃদয় বেদনা আভাসিত হইয়াছে, পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। সনেটের ক্ষুদ্র পরিসরে তাহা সম্ভব নয়। কবি যেখানে হৃদয়বেদনার অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তি দিতে চাহিয়াছেন সেখানে তিনি প্রচলিত ছন্দোরূপই গ্রহণ করিয়াছেন—যেমন—'রেখ মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে' অথবা 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।' কোন ব্যথাঘন সনেট এই কবিতা দুইটির সমকক্ষ হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন—"চতুর্দ্দশ-পদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে অল্পকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে, যে তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না।"

পদরচনার জন্য বিদ্যাপতি প্রচলিত মৈথিলী ভাষা ছাড়িয়া ব্রজবুলি ভাষার প্রবর্ত্তন করেন। এই ভাষায় গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ইত্যাদি বৈষ্ণব কবিরা পদ রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। মধুসূদন ও তাঁহার কাব্য রচনার জন্য প্রচলিত ভাষা ত্যাগ করিয়া নিজস্ব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই ভাষার অনুকারকও কম হয় নাই, (কিন্তু কেহই মাইকেলের ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে কেহই জ্যা আরোপণ করিতে পারে নাই।) এই ভাষায় কেহ কাব্য লিখিতে পারেন নাই বা এই ভাষা কাব্যে চলে নাই বলিয়া কেহ কেহ বলেন—উহা খাঁটি বাংলা ভাষাই নয়। বাংলা ভাষার মধ্যে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের আবির্ভাবে বাংলাভাষা যদি তাহার জাতি হারায় তাহা

হইলে অজস্র ফারসী আরবী শব্দের আবির্ভাবে বাংলা ভাষা কি তাহার রক্তবিশুদ্ধি রাখিতে পারিয়াছে? যদি উহা প্রচলিত ভাষা নাই-ই হয় উহা মহত্তর শিল্পসৃষ্টির উপযোগী ভাষা। তাজমহলের উপাদান ও গঠনভঙ্গী সারা দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাই বলিয়া উহার উপাদান ও গঠন-ভঙ্গীর কে নিন্দা করিবে?

মাইকেল যে যুক্তাক্ষর-ঘন সংস্কৃত শব্দগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহা নিরর্থক নয়। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য ঐরূপ শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন আছে বঙ্কিমও তাহা মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—"প্রয়োজন হইলে আপত্তি নাই। নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।" রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—"সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা এবং যুক্তাক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত-ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি ও তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।" যেখানে গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি করিতে হইবে, পৌরুষ সবলতা প্রকাশ করিতে হইবে—যেখানে রাজশ্রী গরিমা প্রকাশ করিতে হইবে, যেখানে ভাবানুগত ধ্বনির সৃষ্টি করিতে হইবে, মাইকেল সাধারণতঃ সেখানেই ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতেন। প্রচলিত সর্বজনোচ্ছিষ্ট শব্দে সেখানে ভাব প্রকাশিত হইলেও তাহার যথাযথ আবেষ্টনীর সৃষ্টি হয় না। তাহা ছাড়া, ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টির জন্যও এইরূপ শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন হইয়াছে। যেমন—

(১) যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।

(২) কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।

(৩) রুষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি
কহিলা বীরেন্দ্র বলী।

(৪) গাণ্ডীব কোদণ্ডোপম ইরম্মদতেজঃ।
দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে।

(৫) প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুলি টঙ্কারে হুঙ্কারে
দহিলা খাণ্ডব বণে।

যাঁহারা মনে করেন কেবল ভাবপ্রকাশের জন্যই শব্দ, তাঁহারা একথা বুঝিবেন না—কাব্যে ধ্বনির জন্যও শব্দের প্রয়োজন। ভাবানুগ ধ্বনি যে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইবে কাব্যে সেই শব্দই চাই।* বঙ্গসাহিত্যে মেঘনাদবধের ভাব, ভঙ্গী, আদর্শ, ছন্দ সবই নূতন—কাজেই প্রচলিত ভাষাতে কুলায় নাই—নূতন নূতন শব্দকেও আমন্ত্রণ করিতে হইয়াছে।

* সপ্তমসর্গ হইতে ভাবানুযায়ী ধ্বনি সৃষ্টির একটি উদাহরণ। রণযাত্রার বর্ণনা—
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ, ধূমবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে; বাহিরিল হ্রেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া

মাইকেল নামধাতুর পদ অজস্র রচনা করিয়াছেন। চলতি বাংলায় নামধাতুর বহু পদ প্রচলিত আছে—প্রাচীন বাংলাতেও ২।৫টির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নবরচিত বলিয়া অস্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু ইহাতে বাংলা ভাষার সম্পদ বাড়িয়া গিয়াছে। প্রতিভাবান্ সাহসী সাহিত্যিক ছাড়া অন্য কেহ নূতন কিছুর প্রবর্ত্তন করিতে পারে না। মাইকেলের প্রবর্ত্তিত সব নামধাতুর পদ চলে নাই বটে, কিন্তু নামধাতুর পদ গঠনের প্রথা কাব্য-সাহিত্যে চলিয়া গিয়াছে।

মাইকেলের ভাষা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের মণিমুক্তায় ঝলমল করিতেছে। মাইকেলের অনুপ্রাস প্রচলিত ধরণের নয়—ইহাকে অনুস্যূত অনুপ্রাস বলা যাইতে পারে। একই বর্ণ চরণের প্রত্যেক শব্দের প্রথমে না বসিয়া শব্দের মাঝে মাঝে বসে। যেমন—'একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে।' তাঁহার অমিত্রাক্ষরে মিল ছিল না, কিন্তু যে দুইটি শব্দে মিল ঘটে সেই শব্দ দুইটিকে চরণের মধ্যে বসাইয়া তিনি সমস্ত চরণকে হিল্লোলিত করিতেন—যেমন—দোষী আমি নহি বৎস বৃথা ভর্ৎস মোরে। নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী ঊষার চরণে। রোহিণীর স্বর্ণকান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি। অম্বুরাশিনাদসম কম্বুরাশি রবে। যুক্তাক্ষরের অনুপ্রাস অনেক সময় নগর সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গের মত বাজিতে বাজিতে চলে—

(১) উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে।
বাজিছে নূপুর পায়ে নিতম্বে মেখলা
মৃদঙ্গের রঙ্গে বীণা রবাব মন্দিরা
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে
সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।

(২) গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে লঙ্কাপুরে শুনলো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী সম এবে
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা।

মাইকেল অর্দ্ধ যমকের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাকে ছেকানুপ্রাসও বলে। যমকে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে পুনরাবৃত্ত হয়—অর্থের বিশেষ পার্থক্য না ঘটাইয়া মাইকেল একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেন। যেমন—

চামর, অমর ত্রাস ; রথিবৃন্দ সহ
উদগ্র সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূত বৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূত বাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে।
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমাবলী
অশ্বপতি, বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে।

বীরাঙ্গনা কাব্য

মধুসূদনের কাব্যভাণ্ডারে মেঘনাদের পর বীরাঙ্গনার স্থান। বীরাঙ্গনা কাব্যে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দোরচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা লাভ করিয়াছে। রোমক কবি ওভিদের হেরোইদায় কাব্যের অনুসরণে ইহা রচিত। ওভিদ পত্রাকারে (Epistles) তাঁহার কাব্যের কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন। মাইকেল তদনুসরণে বাংলায় পত্রাকারে এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। বীরাঙ্গনা নামটিও ওভিদের হেরোইদায়েরই অনুবর্ত্তন। ওভিদের কাব্যে ২১টি পত্র আছে—মাইকেল ১১টি সম্পূর্ণ করিয়াছেন—১০টি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে মাইকেল বীরাঙ্গনা-চরিত্রের সন্ধান করিয়াছিলেন। সাধারণ বুদ্ধিতে একমাত্র জনাকেই বীরাঙ্গনা বলিয়া মনে হইবে। বীরাঙ্গনার অর্থ মাইকেলের মতে যে নারী তাহার নারীত্বের স্বাতন্ত্র্য ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পতিকে বা প্রণয়ীকে অকুণ্ঠ ভাবে মনের কথা জানাইয়াছেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিয়া রাজপুরীতে ফিরিয়া শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। শকুন্তলার পত্র কাতরোক্তিতে পূর্ণ—তাহা হইলেও এইরূপ পত্রদ্বারা রাজরাজেশ্বরকে প্রেমাকুলতা জ্ঞাপনে বনবাসিনী ঋষিবালার অল্প সাহস প্রকাশ পায় নাই। সোমের প্রতি তারা একখানি চমৎকার পত্রকবিতা। গুরুপত্নী তারা পতির শিষ্য সোমকে প্রেম নিবেদন করিতেছে—ইহা অত্যন্ত সাহসিকার কাজ। যাঁহারা সাহিত্যরসের রসিক নহেন তাঁহারা বলিবেন—'যাহা শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয় তাহা লইয়া কবিতা খৃষ্টান মাইকেলই লিখিতে পারিয়াছেন।' কিন্তু এই কাহিনী যে মহাকবি রসালো করিয়া পুরাণে রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিবেন? সোম আদর্শ রূপবান্ সুন্দর যুবক, তারা সুন্দরী তরুণী, তারার স্বামী বৃহস্পতি পুরাণের 'চন্দ্রশেখর'। তারা 'শৈবলিনী।' সংস্কারমুক্ত মনে বিচার করিলে দেখা যাইবে সোমের রূপে তারার বিমুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কাব্যের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সামাজিক সংস্কারের বাহিরে প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করিয়া এই কবিতা উপভোগ করিতে হইবে। এইরূপ সংঘটন বাঞ্ছনীয় নয় বটে, কিন্তু জগতে এইরূপ ঘটে। যদি ঘটে, তাহা হইলে কাব্যের বিষয়ীভূত না হইবে কেন? পঙ্ক ও মৃণালকে ভুলিয়া যেমন পদ্মের সৌন্দর্য্য আমরা উপভোগ করি—এ কবিতা সেই ভাবেই উপভোগ করিতে হইবে। সমাজসংস্কার ও পারিবারিক সংস্কার এমন কি দাম্পত্য সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী তারা বীরাঙ্গনা।

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী কবিতায় রুক্মিণী বীরাঙ্গনা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রুক্মী শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন—রুক্মিণী অসহায়া কুমারী হইয়াও পারিবারিক বিধানের বিরুদ্ধে নিজের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য পত্র প্রেরণ করিতেছেন—রুক্মিণী তাই বীরাঙ্গনা।

দশরথের প্রতি কৈকেয়ী একটি চমৎকার গীতি-কবিতা। কৈকেয়ী নিজ পুত্রের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিতেছেন। কৈকেয়ীকে বাল্মীকি দানবীরূপে চিত্রিতা করিয়াছেন। এই

কৈকেয়ীকে বীরাঙ্গনা বলিলে আমরা আঘাত পাই। ভাবিয়া দেখিতে হইবে কৈকেয়ী অসামান্য পতিনিষ্ঠতা ও সেবাপরায়ণতার দ্বারা দশরথকে বশীভূত করিয়া বরের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিল। কৈকেয়ী সময় পাইয়া এই বর চাহিয়া লইতেছে। রামচন্দ্র তাহার স্নেহের পাত্র, কিন্তু ভরত তাহার গর্ভজাত সন্তান—এখানে মাতৃত্বই প্রবল হইয়া অন্য সমস্ত বিচার-বিবেচনাকে জয় করিয়া উঠিতেছে। রামচন্দ্র দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্বগুণান্বিত, রঘুকুলধুরন্ধর। প্রজা-সাধারণ তাঁহাকেই চায়, দশরথের নয়নের মণি সে। এইরূপক্ষেত্রে রামচন্দ্রের স্থলে ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনায় অত্যন্ত বেশি সাহসের প্রয়োজন হইয়াছে। এজন্য কৈকেয়ী বীরাঙ্গনা।

মাইকেলের এই কবিতা পড়িলে মনে হয় ভরতকে রাজ্যদানের প্রতিশ্রুতি দশরথ এক সময় কৈকেয়ীর রূপমোহে ও সেবা যত্নে মুগ্ধ হইয়াই দিয়া রাখিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে আছে—দশরথ বৃদ্ধবয়সে যখন কৈকেয়ীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পিতা অশ্বপতির কাছে তাহার পাণিপ্রার্থনা করেন, তখনই অশ্বপতি দশরথকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন—কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্যদান করিতে হইবে। মাইকেল সম্ভবতঃ এ সংবাদ জানিতেন না—তাহা জানিলে মাইকেলের কাব্যে কৈকেয়ীর অভিযোগ ও অভিযান আরো জোরালো হইত। দশরথই অপরাধী। এইজন্য দশরথ ধিক্‌কারের যোগ্য। কৈকেয়ী দশরথকে ক্ষমা করিয়া দেবী হইতে পারিত,—আমাদের চোখে সে দানবী। মাইকেলের আদর্শে সে মানবী—তাহার সপত্নীবিদ্বেষ স্বাভাবিক, তাহার পক্ষে নিজ পুত্রের জন্য রাজ্যকামনা স্বাভাবিক এবং প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য দশরথকে 'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি' বলিয়া ধিক্কার দেওয়াও স্বাভাবিক। এবং তাহার অসামান্য সাহসের জন্য সে বীরাঙ্গনা। কৈকেয়ীর এই পত্রোক্তি রামবনবাস নাটকের অঙ্গীভূত হইলে আমরা যেভাবে উপভোগ করিতাম, সেইভাবেই উপভোগ করিতে হইবে।

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা। মাইকেল রাবণকে একজন অতিমানব বীরাগ্রগণ্য রাজ-রাজেশ্বর বলিয়া মনে করিতেন। সূর্পণখা তাঁহার কল্পনায় বীভৎসা রাক্ষসী নয়, রাজরাজেশ্বর রাবণের ভগিনী। অতএব সূর্পণখা বাল্মীকিবর্ণিত সূর্পণখা নয়, সে স্বৈরচারিণী রূপসী রাজভগিনী। সে লক্ষ্মণের শুধু রূপে নয়, গুণেও মুগ্ধ। সে লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করিতেছে। কবি লক্ষ্মণকে ছোট করেন নাই—বরং মেঘনাদবধের লক্ষ্মণের চেয়ে এ লক্ষ্মণ অনেক বড়। তিনি সূর্পণখাকেই রূপান্তরিত করিয়াছেন। সূর্পণখা বিধবা, সে সামাজিক সংস্কার প্রেমের জন্য জয় করিতেছে। সে ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণের মনের কথা না জানিয়াই তাহাকে প্রেম নিবেদন করিতেছে—সেজন্য তাহার সাহসের প্রয়োজন হইয়াছে। বিশেষতঃ সে বলিয়াছে—'প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কিহে দিতে জলাঞ্জলি মঞ্জুকেশি কুলমানধনে প্রেমলাভলোভে কভু ?—' এজন্যই সে বীরাঙ্গনা।

অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী কবিতায় দ্রৌপদী স্বর্গপ্রবাসী অর্জ্জুনকে নিজের বিরহবেদনা জানাইতেছে। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী, একা অর্জ্জুনের পত্নী নহেন। অর্জ্জুনই বাহুবলে দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছিলেন—অর্জ্জুনই পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যোগ্যতম বীরশ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব থাকা স্বাভাবিক। চারিজন স্বামীর নিকটে বাস করিয়াও দ্রৌপদী

অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে কাতরা হইয়া এক ঋষিপুত্রের হাত দিয়া পত্র প্রেরণ করিতেছেন। অর্জ্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকৃতির অনুমোদিত, কিন্তু পাণ্ডব-পরিবারের অনুমোদিত নয়—সম্ভবতঃ অর্জ্জুনেরও অনুমোদিত নয়। সেজন্য দ্রৌপদীকে খুবই সাহসিকা হইতে হইয়াছে। তাই দ্রৌপদী বীরাঙ্গনা। যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মবলে কেহই বলী ছিলেন না—দৈহিক বলে ভীমসেন অপ্রতিরথ, বুদ্ধিবলে সহদেবের সমকক্ষ কেহ ছিল না, নকুল ছিলেন রূপে কন্দর্প। দ্রৌপদী ছিলেন তেজস্বিনী আদর্শ ক্ষত্রকন্যা, শৌর্য্যের পূজারিণী; অর্জ্জুনই তাঁহার উপযুক্ত দয়িত। দ্রৌপদীই মহাভারতেও আদর্শ বীরাঙ্গনা।

দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী কবিতায় ভানুমতী বীরাঙ্গনা। অসহিষ্ণু মন্যুময় দুর্য্যোধনের উদ্দেশে ভানুমতী কতকগুলি কঠোর সত্যকথা বলিয়াছেন এই পত্রে। শকুনি যে 'কাল কলি-রূপে' কুরুকুলে প্রবেশ করিয়া দুর্য্যোধনকে 'পাপ অক্ষবিদ্যা' শিখাইয়াছিল একথা দুর্য্যোধনের কাছে কর্ণকটু। সূতপুত্রের চেয়ে দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু কেহই ছিল না। ভানুমতী বলিলেন—'শৃগালে কি কভু পারে বিমুখিতে কহ মৃগেন্দ্র সিংহেরে সূতপুত্রসখা তব কি লজ্জা নৃমণি!' যে পাণ্ডবগণের বিন্দুমাত্র প্রশংসা দুর্য্যোধন সহ্য করিতে পারে না—ভানুমতী অকুণ্ঠিত-ভাবে তাহাদের প্রশংসা করিলেন। বিশেষতঃ অর্জ্জুনের অসামান্য গুণিপণার কথা আর ফুরায় না—দুর্য্যোধনের বক্ষে ইহা শেলসম। সব চেয়ে কঠোর কথা ঘোষযাত্রায় চিত্রসেন গন্ধর্বের হাতে পুরনারীগণসহ দুর্য্যোধনের বন্ধনের কথা। ইহার চেয়ে অগৌরবের কথা আর দুর্য্যোধনের নাই। ভানুমতী সেই কথা স্মরণ করাইতেছেন—ইহা মন্যুময় কুরুরাজের মর্ম্মে দারুণ আঘাত। তারপর শোচনীয় পরিণামের প্রসঙ্গ। ভানুমতী কুরুসংসারে নারীর মর্য্যাদা যে কত তাহা ভাল করিয়াই জানেন। এই পত্রে ভানুমতী অসমসাহসিকতারই পরিচয় দিয়াছেন, ভানুমতী তাই বীরাঙ্গনা।

'জয়দ্রথের প্রতি' দুঃশলা কবিতায় দুঃশলা ভানুমতীর মতই জয়দ্রথকে অনেক সত্য কথা শুনাইয়াছেন। দুর্য্যোধনের সহোদরা হইয়া তিনি, দুর্য্যোধনই যে সকল অনর্থের মূল—নারীর অবমাননাকারী একথা অকুণ্ঠিতভাবে ব্যক্ত করিতেছেন। ইহা নৈতিক সাহসের নিদর্শন। এজন্য অর্জ্জুনের ভয়ে ভীতা হইয়াও দুঃশলা বীরাঙ্গনা।

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী কবিতায় জাহ্নবী শান্তনুকে প্রকৃতিস্থ হইতে বলিতেছেন। তিনি মানবী নহেন, তিনি দেবী। তিনি সবলে মায়াজাল ছেদন করিয়াছেন। তিনি অকপটে নিজের ব্যভিচার স্বীকার করিতেছেন। ইনিও বীরাঙ্গনা।

উর্ব্বসী মানবের প্রেমে স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথ্বীতলে যাইতেছেন, উর্ব্বসী পুরুরবার শৌর্য্যে মুগ্ধ—উর্ব্বসীও বীরাঙ্গনা।

√'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতায় জনা যে বীরাঙ্গনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনা-প্রবীরের কাহিনী মাইকেল কাশীরামদাসের মহাভারতে পাইয়াছিলেন। অহিংসাব্রতী বৈষ্ণব নীলধ্বজ পুত্রহন্তা পার্থের সহিত সন্ধি করিলেন। জনার মাতৃহৃদয় ইহাতে সায় দিল না। নীলধ্বজের কাছে অর্জ্জুন নরনারায়ণ, জনার কাছে সে স্বৈরিণীসুত। স্বামী ও পত্নীর মতবাদে

দারুণ দ্বন্দ্ব। জনা পতিব্রতা, কিন্তু সে তাহার নারীত্ব ও ব্যক্তিত্ব স্বামীর চরণে অর্পণ করিতে পারে না। জনা পতিব্রতা, কিন্তু সে জননী। সে তাহার জননীত্ব বিস্মৃত হইতে পারে নাই। প্রবীরের শোকই তাহার একমাত্র বেদনা নয়, স্বামী পুত্রহন্তার সঙ্গে সন্ধি করিয়াছে—এই দারুণ অপমান তাহার অসহ্য। জনা বলিয়াছে—

ক্ষত্রকুলবালা আমি ক্ষত্রকুলবধূ
কেমনে এ অপমান স'ব ধৈর্য্য ধরি?

এই কবিতাটিতে মধুসূদন ক্ষুব্ধ মাতৃহৃদয়ের যে অভিব্যক্তিকে রূপদান করিয়াছেন—তাহা বঙ্গসাহিত্যে অনন্যসাধারণ। এই কবিতা হইতেই গিরিশচন্দ্র জনা নাটকের প্রেরণা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

মধুসূদনের এই কাব্যের নায়িকাগুলি যে সকলেই বীরাঙ্গনা তাহা বুঝাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন কাব্যের হিরোইন শব্দেরই প্রতিশব্দ হিসাবে বীরাঙ্গনা কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজিতে নায়িকামাত্রেই হিরোইন: বীরের অনুরাগিণী বা বীরের জায়াও বীরাঙ্গনা, একথা মনে রাখিতে হইবে।

বীরাঙ্গনা কাব্যের উপাদান প্রধানতঃ মহাভারত হইতেই গৃহীত। মধুসূদন কাশীরামের মহাভারতকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া এই কয়টি বীরাঙ্গনা পাইয়াছেন। তিনি যদি ব্যাসদেবের মূল মহাভারত খুঁজিতেন আরও কয়েকটি বীরাঙ্গনা পাইতেন। মধুসূদন মহাভারত ও রামায়ণ হইতে নারীচরিত্রগুলি পাইয়াছেন—কিন্তু তিনি স্বকীয় আদর্শ অনুসারে তাহাদের পুনর্বিরচন করিয়া লইয়াছেন,—এমন কি চরিত্রগুলিকে মাইকেলের সৃষ্টিও বলা যাইতে পারে।

বীরাঙ্গনা মাইকেলের শেষকাব্য। মাইকেলের রচনাভঙ্গী, ভাষাবিন্যাস ও ছন্দগঠন এই কাব্যেই চূড়ান্তসীমায় পৌঁছিয়াছে—এককথায় মাইকেল যে-ভাষাচ্ছন্দের জন্য এত সংগ্রাম করিতেছিলেন এই কাব্যেই তাহার সাক্ষাৎকার পাইয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য-মাইকেল তাঁহার সারস্বত তপস্যার ফল লাভ করার পর আর কোন শ্রেষ্ঠ অবদান গৌড়জনকে দিবার অবসর পান নাই। রোগে শোকে দারিদ্র্যে অকাল জরায় জীর্ণ ও অভিভূত হইয়া তিনি বীরলোক লাভ করিলেন।

তিলোত্তমা-সম্ভবে মাইকেলের নূতন ছন্দ সুপরিণতি লাভ করে নাই; যতিপাতে দোষ ঘটিয়াছে স্থলে স্থলে। শব্দচয়নে ও বয়নেও বহু ত্রুটি, তাহা ছাড়া সাবলীল প্রবাহ নাই।

মেঘনাদবধে এ সকল দোষ অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু অনেকস্থলে অনাবশ্যক শ্রুতিকটু শব্দের প্রয়োগ আছে, নামধাতুর প্রয়োগও খুব বেশি, অলস বিশেষণের প্রাচুর্য্য আছে, অলস সম্বোধনপদের প্রয়োগে অনেক স্থলে ছন্দঃপ্রবাহ খণ্ডিত। নিস্তেজ, সুলভ দৃষ্টান্ত, উপমা, উৎপ্রেক্ষার সংখ্যাও অল্প নয়।

বীরাঙ্গনায় উপরিলিখিত দোষগুলি নাই, গূঢ় ও গাঢ় অনুভূতি রচনার ভাষাকে জোরালো করিয়াছে, অলস বাগ্‌বিলাস নাই বলিলেই হয়। মাইকেল মেঘনাদের চতুর্থ সর্গে ভাষার যে পারিপাট্য দেখাইয়াছিলেন—বীরাঙ্গনায় তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। মেঘনাদবধের ভাষা ও

ছন্দের গুণগুলি সবই আছে—কেবল দোষগুলি নাই। তবে একটা বড় প্রভেদ মেঘনাদবধের সঙ্গে এই—মেঘনাদবধের ছন্দঃস্পন্দ (Rhythm) বীরাঙ্গনায় নাই।

মধুসূদন যুক্তাক্ষরময় শব্দের সাহায্যে ছন্দঃস্পন্দ-সৃষ্টিকে বাংলাভাষার পক্ষে অনুপযোগী বলিয়াই বোধ হয় ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই বীরাঙ্গনায় তিনি ঐরূপ কৃত্রিম উপায়ে ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই। বীরাঙ্গনায় তাঁহার ভাষা বাংলা কবিতায় প্রচলিত ভাষার কাছাকাছি হইয়া উঠিয়াছে।

গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে
দূরবনে সুরমণি ভ্রমিতে একাকী
বহুদিন অহরহঃ বিরহদহনে
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে,
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জা ভয়ে ?
গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে
সুধানিধি! মুদি আঁখি ভাবিতাম মনে
মানিনী যুবতী আমি। তুমি প্রাণপতি
মানভঙ্গ আশে নত দাসীর চরণে।
আশীর্ব্বাদচ্ছলে আমি নমিতাম মনে।

এই অংশ পড়িয়া মেঘনাদ বধের মাইকেলের রচনা বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। 'ক'ব তা কাহারে'—এই বাক্যাংশ দেখিয়া ঐ মাইকেলকে ধরা যায়। এইরূপ চরণবিন্যাসের দ্বারাই প্রধানতঃ বীরাঙ্গনা রচিত। মধুসূদন ছন্দঃস্পন্দসৃষ্টির কৃত্রিমতা বীরাঙ্গনায় বর্জ্জন করিয়াছেন—হৃদয়ের সুকুমার আকূতিই এখানে যে হৃৎস্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছে—ছন্দঃস্পন্দ তাহার কাছে তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। মাইকেলের শেকস্পীয়ারী ঢঙের ভাষায় বলিতে গেলে—

কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজরূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে।
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত বাসে ?

বাংলাভাষা কি সত্যই ছন্দঃস্পন্দের পক্ষে অনুপযোগী ? যুক্তাক্ষরের সহিত স্বরান্ত অযুক্তাক্ষরের সমবায়ে ছন্দঃস্পন্দসৃষ্টি খাঁটি বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু হসন্ত অক্ষরের সহিত স্বরান্ত অক্ষরের সমবায়ে ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টি বাংলাভাষার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দুই চারিটি যুক্তাক্ষর ইহার সঙ্গেও চলে, যুক্তাক্ষর, হসন্ত+স্বরান্তের কাজ করে। এইভাবে ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টি করিতে হইলে চলতি ভাষার ক্রিয়ার প্রয়োগ করিতে হব। ভাষাকেও চলতিভাষায় পরিণত করিতে হয়, স্বরান্ত শব্দের বদলে হসন্ত শব্দের ভূরি

ছুরি প্রয়োগ করিতে হয়। ছন্দের রূপই হইয়া যায় অন্তবিধ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্যও হয় না। কাজেই মাইকেল সে পথে যান নাই।

বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকাগুলির কোন কোনটির নাম ও প্রেমাস্পদের সহিত সম্বন্ধের পরিস্থিতিটুকু কবি পুরাণ হইতে লইয়াছেন কিন্তু কবি নিজের আদর্শে তাহাদের পুনর্বিচরণ করিয়া লইয়াছেন। প্রত্যেক নায়িকার মুখের উক্তি (পত্রোক্তি) কবির রচিত। তাহাদের চরিত্র, আচরণ ও তাৎকালিক অবস্থার অনুগামী করিয়া কবি তাহাদের মুখে কথা বসাইয়াছেন। প্রসঙ্গচ্ছলে তাহারা পুরাণে উক্ত ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতেছে—তাহার ফলে তাহারা পৌরাণিক নায়িকা হইয়া উঠিতেছে। নতুবা সবগুলিকেই মাইকেলের পরিকল্পিত বলা যাইতে পারিত।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরুদ্ধের প্রতি উষা, যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী, নলের প্রতি দময়ন্তী—এই পত্রগুলি অসম্পূর্ণ। এইগুলির মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী অসম্পূর্ণ হইলেও বীরাঙ্গনাকাব্যে স্থান পাইতে পারিত। পতি ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ শুনিয়া গান্ধারী নিজে দুই চোখের উপর সাত ভাঁজ আঁচল বাঁধিলেন—স্বামী যে ইন্দ্রিয় হইতে বঞ্চিত সে ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগ গান্ধারী চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিলেন—মহাভারত পাতিব্রত্যের এই আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। এই বিচিত্র সুন্দর সৃষ্টি হইতে দৃষ্টির চির বিদায়ের যে গভীর বেদনা মধুসূদন তাহাই আশ্রয় করিয়া ইহাকে কবিতায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কবিতার বৃত্তাংশ দেখিয়া মনে হয় কবিতার সমগ্র বৃত্তমণ্ডলটি কত চমৎকার হইয়া উঠিতে পারিত!

বীরাঙ্গনার পত্রকবিতাগুলির স্থায়ী ভাব প্রণয় বা রতি। এই স্থায়ী ভাবই পুরাণ হইতে প্রাপ্ত। যে সঞ্চারী ভাবের দ্বারা ঐ স্থায়ী ভাব পুষ্ট হইয়াছে তাহা মধুসূদনের নিজেরই যোজনা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিণতি

মাইকেলের সর্ব্বপ্রধান কবিকীর্ত্তি—অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন। এ ছন্দের যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাহা সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী ধাতুর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। সে জন্য তাহা বেশি দিন চলে নাই। কিন্তু মাইকেলের এই সৃষ্টি নিষ্ফল হয় নাই। এই ছন্দ বঙ্গকাব্য-সাহিত্যে নানা ভাবে রূপান্তর লাভ করিয়া বহু উৎকৃষ্ট রচনার বাহন হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মাইকেলের কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতির তুলনা করিলে বিশেষ কোন সাম্য দৃষ্ট হয় না। মাইকেলের মত রবীন্দ্রনাথও যুগ-প্রবর্ত্তক কবি, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য লইয়া আবির্ভূত হইয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে নব নব ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারাকেই অনুসরণ করিয়া তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত, সমৃদ্ধ ও সুপরিচালিত করিয়াছেন—এ কথা বলিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। বরং তিনি বাঙ্গালার বৈষ্ণব গীতিকবিতার ধারাকে আংশিকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন বলা যাইতে পারে,—বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালার বাউল কবিদের কাছে গীতশিল্পী রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে ঋণী।

তবে কি উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একেবারেই নাই? 'প্রভাব একেবারেই নাই' বলিলেও অসঙ্গত হইবে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের নিকটে আত্মকেন্দ্রীয় দৃষ্টি-ভঙ্গির জন্য ঋণী—বিহারীলালের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বহু চিত্রে ও বৈচিত্র্যে নব নব রূপ লাভ করিয়াছে। হেমচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার প্রথম জীবনের রচনায় ছিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যে রবির উদয়ের আগে শুকতারার আভাস পাওয়া যায়। নবীনচন্দ্রের "কীর্ত্তিনাশা" নবীনচন্দ্রের রসভূমি হইতে রবীন্দ্রনাথের রসভূমিতে আসিবার পথেই পড়ে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ সকল ঋণ সামান্যই, পাঠশালার গুরুমহাশয়ের কাছে কৃতবিদ্য কৃতী ব্যক্তির ঋণের মত। অন্তঃপ্রকৃতি বা রসাদর্শের দিক্ হইতে রবীন্দ্র-কাব্যের সহিত ইঁহাদের কাব্যের মিল বিশেষ কিছু নাই।

কাব্যগঠনের পক্ষে উপাদান, উপকরণ, বহিঃপ্রকৃতি, আকৃতি, রচনা-ভঙ্গি ইত্যাদির মূল্য অল্প নয়। গঠন-কলার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের অনেকের কাছে ঋণী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ-ঋণ এড়াইবার উপায় ছিল না।

ছন্দের দিক্ হইতে রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের নিকট কতটা ঋণী এ প্রবন্ধে কেবল তাহাই দেখানো হইবে। সেই সঙ্গে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ কি ভাবে পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যে রূপান্তর লাভ করিয়াছে তৎসম্বন্ধেও আলোচনা করা যাইবে।

'মেঘনাদ বধ' হইতে যদৃচ্ছাক্রমে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

স্বর্গের কনকদ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী। স্বনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিশ্ব-বিমোহিনী
স্বপন দেবীরে স্মরি' কহিলা সুস্বরে
যাও তুমি লঙ্কাধামে। যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও রঙ্গিণি,
এই কথা, উঠ বৎস পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজি মাঝে
শোভে সরঃ, কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়, স্নান করি সেই সরোবরে
তুলিয়া বিবিধ ফুল পূজ ভক্তিভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে।

মাইকেলের এই অমিত্রাক্ষর পদ বিন্যাস আর রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র অংশের উদ্ধৃত পদ-বিন্যাসে প্রভেদ নাই।

পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়,
হা রে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্দ্ধা তোর। যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে। কি ভাবিতেছিনু, মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি গেল
বীর বন অন্তরালে। উঠিনু চমকি
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা, আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার।

নবীনচন্দ্রও মাইকেলের ছন্দের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে রক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন :—

মূর্চ্ছিত বিরাটপতি, স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু শরের শয্যায়
সিদ্ধকাম মহাশিশু। ক্ষত কলেবর
রক্তজবাসমাবৃত। সস্মিত বদন

মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত
সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা, মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা
সহকার-সহ ছিন্না ব্রততীর মত।

নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাহিতেছে কৃষ্ণনাম। মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ, বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ "অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
আমরা বীরের জাতি বীর-ধর্ম্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক তব! এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
একবিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি
বীরশোক অশ্রু নয়, অসির ঝঙ্কার।" (কুরুক্ষেত্র)

এই সকল অংশ হেমচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশের মত মিলহীন পয়ার নয়।

হেথায় সুমেরু শৈল ছাড়িয়া বাসব
ইন্দ্রায়ুধ অস্ত্রাদিতে হইয়া সজ্জিত
চলিলা কৈলাস ধামে নিয়তি আদেশে
নিত্য বিরাজিত যেথা উমা, উমাপতি,
উঠিতে লাগিলা শূন্যে নিম্নে ধরাতল
জলধি পর্ব্বতমালা তরুতে সজ্জিত
দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন,
বিভূষিত বেশ ভূষা চারু অবয়ব। (বৃত্রসংহার)

অথবা

কহিলা "হে দেবদূত সুসন্দেশবহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গল-দায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন যেখানে,
কহ গে তাদেরে দূত এই সুবারতা।

কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাজ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এতদিনে হইল জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তারে হইল সাক্ষাৎ
কহিল বিদিত বৃত্র-বিনাশ যেরূপে।" (বৃত্রসংহার)

কবি 'সুবারতা' 'সুসন্দেশবহ' ইত্যাদি শব্দ-প্রয়োগে মাইকেলের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য একেবারেই রক্ষা করিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্রের হাতে মাইকেলের ছন্দ মিলহীন পয়ারের রূপ ধরিয়াছে। হেমচন্দ্র কোথাও যে মাইকেলের ছন্দের অনুসরণ করিতে পারেন নাই এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে। নিম্নোক্ত অংশে তিনি অনেকটা মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়ঃ—

হেরিয়া দনুজপতি কাতর হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি
"হা শম্ভু, তুমিও বাম।" দগ্ধ হতাশ্বাসে
ছুটিলা উন্মত্ত প্রায় হুঙ্কারি' ভীষণ
ছিন্নমস্ত রাহু যেন। অগ্নি চক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্রে ঘোর, দন্তে কড় নাদ।
প্রলয়-ঝটিকা-গতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি' বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি'
ইন্দ্রকরে ভীম বজ্র। বজ্রদেহে আলো
জ্বলিতে লাগিলা ধকধক। সে দহন
মহাসুর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি' বজ্র ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি',
লম্ফে ঝম্পে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি'
ছিঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে বাসবে আঘাতি',
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়। কাঁপিল জগৎ।
উজাড় স্বর্গের বন। কাঁপিতে লাগিলা
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে।
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার।

এই অংশ পাঠ করিলে 'মেঘনাদ বধে'র কোন কোন অংশ স্বভাবতই মনে পড়িবে। হেমচন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে পাইয়াছেন—মিল দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি।

রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের ছন্দে পাইলেন, পদবিন্যাসের স্বাধীনতা, ছত্র হইতে ছত্রান্তরে ভাবধারার অবাধ গতি, প্রয়োজন-মত ছত্রের মধ্যে থামিবার অধিকার, ভাবানুযায়ী বাক্যসমূহে হ্রস্ব-দীর্ঘতা, যতির তুলনায় ছেদের প্রাধান্য ইত্যাদি। মাইকেল যে অনুপ্রাস ও যুক্তাক্ষরের যথাবিহিত প্রয়োগে আয়াস স্বীকার করিয়া একটা ছন্দহিল্লোলের (rhythm) সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র দুই জনের কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের কাব্যের ছন্দহিল্লোলের অভাবটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু মুহুর্মুহুঃ অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে ছন্দহিল্লোল সৃষ্টি তাঁহার কাছে রোচনীয় হইল না। তিনি তাঁহার নিজস্ব সঙ্গীত-প্রবাহটি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া এবং মিলের পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিয়া ছন্দোহিল্লোলের ক্ষতিপূরণ করিতে চাহিয়াছেন। ফলে, তাঁহার হাতে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সচ্ছন্দ পয়ারের রূপ ধরিয়াছে। এই সচ্ছন্দ পয়ারে তিনি 'বিদায় অভিশাপ', 'মানসসুন্দরী', 'সুখ', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে মাইকেলের ছন্দের সমস্ত অঙ্গই গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল গ্রহণ করেন নাই মাইকেলের আয়াসসৃষ্ট ছন্দহিল্লোল (rhythm)। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দ মিল-দেওয়া মাইকেলী ছন্দ।

মাইকেলের যে অংশ আগে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে মিল দিলেই রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছন্দ পয়ার হইবে।

স্বর্গের কনকদ্বারে মায়া উতরিলা
মহাদেবী। সুনিনাদে আপনি খুলিলা
সেই দ্বার। বাহিরিয়া বিশ্ব-বিমোহিনী
স্বপনদেবীরে স্মরি' কহিলা,—"নন্দিনি,
যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার সাজে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও রঙ্গিনি,
এই কথা, 'উঠ বৎস পোহাল যামিনী,
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজি মাঝে
শোভে সরঃ চণ্ডীর দেউল কূলে রাজে
স্বর্ণময়, স্নান করি সেই সরোবরে
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি ভরে
দানবদমনী মায়। তাঁর কৃপাবশে
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে।' "

অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্যান্য সকল ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেবল ছত্রগুলিকে মিত্রাক্ষরী করা হইল। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত সচ্ছন্দ পয়ারের জন্ম।

রবীন্দ্রনাথ পরে লক্ষ্য করিলেন, ছত্র হইতে ছত্রান্তরে অবিরাম যাত্রার ফলে এ-ছন্দে অনেক মিলই কোন কাজে লাগে না। প্রত্যেক ছত্র চৌদ্দ অক্ষরে গঠিত হইলেই এই অসুবিধা ঘটে। প্রত্যেক ছত্রকে চৌদ্দ অক্ষরে রচনা করিতে হইবে, ছন্দের অন্তঃ-প্রকৃতির এমন কোন দাবী নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পর ছত্রশেষে যখন বিরতি-সৃষ্টির প্রয়োজন নাই, তখন ভাব ও সঙ্গীতের সুরের অনুবর্ত্তী করিয়া বাক্যগুলিকে সাজাইলে অনায়াসে মিলের সহায়তা পরিপূর্ণ ভাবেই লাভ করা যায়। ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের অসমমাত্রিক তাজমহলী ছন্দের আবির্ভাব। মাইকেলের মেঘনাদ বধ হইতে উদ্ধৃত ঐ অংশগুলিকে সেই ভাবে সাজাইলেই রবীন্দ্রনাথের তাজমহলী ছন্দের কাঠামোটি পাওয়া যাইবে।

স্বর্গের কনকদ্বারে মহাদেবী মায়া উত্তরিলা
সুনিনাদে হৈমদ্বার আপনি খুলিলা।
বাহিরিয়া বিশ্ব-বিমোহিনী
স্বপন দেবীরে স্মরি' কহিলা "নন্দিনি,
যাও তুমি লঙ্কা মাঝে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর যথায় বিরাজে।
সুমিত্রার বেশে
বসি তার শিরোদেশে
এই কথা কহিও রঙ্গিণি,
'উঠ বৎস, পোহাল যামিনী
লঙ্কার উত্তর দ্বারে শোভে সরঃ বনরাজি মাঝে,
কূলে তার স্বর্ণময় চণ্ডীর দেউলখানি রাজে
স্নান করি সেই সরোবরে
তুলিয়া বিবিধ ফুল পূজ ভক্তিভরে
দানব দমনী মায়,
বিনাশিবে অনায়াসে রাক্ষসেরে তাঁহার কৃপায়।"

বলা বাহুল্য, ইহাতে কেবল ছন্দের কাঠামোটা (formal structure) দেখানো হইল। বিপরীত পথে রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অসমমাত্রিক ছন্দের কবিতার অংশ-বিশেষের চরণগুলিকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পুনর্বিন্যস্ত করিলে কিরূপে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দেই পৌঁছানো যায়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই:

এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন ধনমান
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক—সম্রাটের ছিল এ সাধনা।

রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যা-রক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন।
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
শুধু থাক
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

আবার শিশির রাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি
হায় রে হৃদয়!
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়,
নাই, নাই, নাই যে সময়!
হে সম্রাট্, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে!
রহে না যে অবকাশ
বারো মাস
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে,
চিরমৌনজাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।

এই অংশ দুটিকে অনায়াসে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে সাজানো যায়। সামান্য একটি কথার এদিক্ ওদিক্ করিলেই চলিবে।

একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর
শাজাহান। জীবন যৌবন ধন মান
ভেসে যায় কালস্রোতে। অন্তর বেদনা
শুধু তব হোক্ চিরন্তন, ছিল তব
এ সাধনা। রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগ-সম লীন হয় হোক্
তন্দ্রাতলে। দীর্ঘশ্বাস একটি কেবল
নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে করুক আকাশ
সকরুণ। এই তব আশ ছিল মনে।
হীরা-মুক্তা মাণিক্যের ঘটা যেন শূন্য
দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্র-ধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক, শুধু থাক
কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
একবিন্দু অশ্রুজল, এ তাজমহল।

আবার শিশির রাত্রে তাই, হেমন্তের
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো সিত কুন্দরাজি
সাজাইতে অশ্রুভরা সাজি আনন্দের।
হায় রে হৃদয় (হায়) তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে
যেতে হয়। নাই, নাই, নাই যে সময়।
হে সম্রাট তাই তব হৃদয় শঙ্কিত
চেয়েছিল করিবারে হৃদয় হরণ
সময়ের, সৌন্দর্য্য ভুলায়ে। কণ্ঠে তার
কী মালিকা দুলাইয়া করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন সাজে
অপরূপ। রহে না যে এই বসুধায়
বিলাপের অবকাশ, হায়, বারো মাস,
অশান্ত ক্রন্দনে তব তাই বেঁধে দিলে
চির মৌনজাল দিয়ে কঠিন বন্ধনে।

বলা বাহুল্য, ইহাতে মাইকেলের ছন্দের সহিত কেবল আকৃতিগত বৈষম্যই দেখানো হইল।

এই ভাবে মাইকেলের ছন্দ হইতেই রবীন্দ্রনাথের অসমমাত্রিক তাজমহলী ছন্দের ক্রমবিকাশ দেখানো যাইতে পারে। অনেকে বলেন, ইতালির free verse হইতে রবীন্দ্রনাথের অসমমাত্রিক ছন্দের উৎপত্তি ; এ কথার কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উভয়ের মধ্যে আনুরূপ্য দেখান যাইতে পারে, কিন্তু গঠন-ভঙ্গী ও সুর কোথা হইতে আসিল ? আপনার দেশেই আপন ভাষা হইতেই তিনি নব নব ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই স্বাভাবিক। আর যখন মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলি তাঁহার রচনাতেই পাওয়া যাইতেছে, তখন বিদেশ হইতে আমদানী এ কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

মাইকেলের ছন্দ গিরিশচন্দ্রের নাটকে কি রূপান্তর লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করি।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে মাইকেল-প্রবর্ত্তিত ছন্দের পংক্তিগুলিকে ছোট ছোট পংক্তিতে ভাঙ্গিয়া নূতন ছন্দের রূপ দিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা নূতন নয়। গিরিশচন্দ্রের এ ছন্দও অমিত্রাক্ষর, কিন্তু ইহাতে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর-তরঙ্গ ও প্রবাহ দুই-ই নাই।

মাইকেলের কয়েক পংক্তি প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি।

> কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ বাসব কহিলা
> "পরম অধর্ম্মচারী নিশাচরপতি
> দেবদ্রোহী। আপনি হে নগেন্দ্রনন্দিনি
> দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
> হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
> কভু কি উচিত, মাতঃ ? সুশীল রাঘব
> পিতৃসত্য রক্ষা হেতু, সুখভোগ ত্যজি,
> পশিল ভিখারী বেশে নিবিড় কাননে।
> একটি রতন মাত্র তাহার আছিল
> অমূল্য, যতন কত করিত সে তারে
> কি আর কহিবে দাস ? সে রতন পাতি
> মায়াজাল হরে দুষ্ট। হায় তা স্মরিলে
> কোপানলে দহে মনঃ। ত্রিশূলীর বরে
> বলী রক্ষঃ, তৃণজ্ঞান করে দেবগণে।

এই অংশকে গিরিশচন্দ্রের ছন্দে সাজাইতে পারা যায়—

বাসব (কৃতাঞ্জলিপুটে)

> পরম অধর্ম্মাচারী নিশাচরপতি
> দেবদ্রোহী

আপনি হে নগেন্দ্রনন্দিনি
তব কৃপা তার প্রতি কভু কি উচিত ?
মাতঃ সুশীল রাঘব
পিতৃসত্য রক্ষা হেতু, সুখভোগ ত্যজি'
পশিল ভিখারী বেশে নিবিড় কাননে।
আছিল তাহার
একটি রতন মাত্র মহামূল্য,
কত যত্ন করিত সে তারে
কি আর কহিবে দাস ?
পাতি মায়াজাল
সে রতন হবে দুষ্ট।
হায় মা! স্মরিলে কোপানলে দহে মনঃ!
ত্রিশূলীর বলে বলী রক্ষঃ
তৃণজ্ঞান করে দেবগণে।

আবার গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরবের' কিয়দংশ লইয়া দেখান যাইতে পারে, ইহাকে চৌদ্দ অক্ষরের পংক্তির আকারে সাজাইলে কিরূপে মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দের—প্রকৃতি না হোক—আকৃতিটা পাইতে পারি।

গিরিশচন্দ্রের—

নারদ। হরগৌরী কোন্দল দেখিতে হৈল সাধ
গেলাম কৈলাস ধামে ;
হেরিলাম বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বরী সনে
আনন্দে করেন গান।
করিয়ে প্রণাম, তুলিলাম কত কথা
গাহিলাম কুচনি আখ্যান
তাহে মহামায়া ঈষৎ হাসিল
বাধিল না কোন্দল দু'জনে।
যাও তুমি দুর্ব্বাসা সদনে
বহুদিন তত্ত্ব নাই তার
দেখা হলে পাঠায়ো কৌশলে।
বহুদিন করি অন্বেষণ
অবশেষে এসেছি এ বনে।

দুর্ব্বাসা। রুদ্রেশ্বর এতদিনে
পড়েছে কি মনে, দীনহীন দাসে তব ?
যাই তবে ঋষিরাজ
ভেটিতে ভোলায়। (পাণ্ডব-গৌরব)

ইহাকে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রূপান্তরিত করিলে দাঁড়ায়—

"হৈল সাধ হরগৌরী-কোন্দল দেখিতে
গেলাম কৈলাস ধামে।" কহিলা নারদ—
"হেরিলাম বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী সনে
আনন্দে করেন গান। করিয়ে প্রণাম
তুলিলাম কত কথা, কুচনি আখ্যান
গাহিলাম, মহামায়া হাসিল ঈষৎ,
বাধিল না কোন্দল দু'জনে। অবশেষে
কহিলা মহেশ, যাও দুর্ব্বাসা সদনে,
বহুদিন তত্ত্ব নাই, পাঠায়ো কৈলাসে
দেখা হলে, বহুদিন করি অন্বেষণ
এ বনে এসেছি শেষে।" কহিলা দুর্ব্বাসা—
"রুদ্রেশ্বর এতদিনে পড়েছে কি মনে
দীনহীন দাসে তব ?" কহিলা নারদে
"যাই তবে ঋষিরাজ ভেটিতে ভোলায়।"

দীনবন্ধু

(১)

ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য ছিলেন সেকালের অনেকগুলি প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক। তন্মধ্যে দীনবন্ধুই ঈশ্বরগুপ্তের আসল শিষ্য। দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্য ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যধারারই অনুসরণ। ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন রঙ্গরসের কবি—দীনবন্ধু ঈশ্বরগুপ্তের রঙ্গরসিকতায় দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শিষ্য গুরুর চেয়ে প্রতিভাবান্ ছিলেন তাই শুধু রঙ্গব্যঙ্গে দীক্ষালাভ করিয়া শিষ্য আসল সাহিত্য রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরগুপ্ত সেকালের সমাজে যে সকল ব্যাপারকে ব্যঙ্গের বস্তু মনে করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন—দীনবন্ধু সেইগুলিকে লইয়া প্রহসন রচনা করিয়াছেন। দীনবন্ধু ব্যঙ্গের বিষয়কে কতকগুলি চরিত্রে রূপদান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে কল্পনারও বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় নাই—তিনি তাঁহার সামাজিক জীবনের চারিপাশে ঐরূপ চরিত্র স্বচক্ষেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই চরিত্রগুলি লইয়া তিনি উপন্যাস রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু উপন্যাসরচনার শান্ত সংযত অধ্যবসায় তাঁহার ছিল না, কাব্যপ্রতিভাও তাঁহার বিশেষ ছিল না, তাঁহার ছিল চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা। তাই তিনি সেই চরিত্রগুলি লইয়া কতকগুলি চিত্র আঁকিয়াছিলেন। এই চিত্রগুলির একত্র গুম্ফনই নাট্যরূপ ধরিয়াছে। আসল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটকের পরিকল্পনা, নাটকীয় রূপসৃষ্টি বা ক্রমোন্মেষসাধনের ধৈর্য্য ও প্রতিভা তাঁহার ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আসল নাটকের কোন কোন অঙ্ক ও প্রকরণ এইগুলিতে অতি উৎকৃষ্ট ভঙ্গীতেই রূপায়িত হইয়াছে।

ঈশ্বরগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গীও দীনবন্ধু পাইয়াছিলেন। গুপ্তকবি নিজে কূটস্থ থাকিয়া সমাজ-সংসারের সব জিনিসেই একটা ব্যঙ্গরসের প্রেরণা পাইতেন। দীনবন্ধুও ছিলেন অনেকটা সেই ধরণের শিল্পী। যাহাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে 'রগড় দেখা ও মজা মারা' ঠিক তাহাই ছিল গুরুশিষ্য দুইজনেরই সাহিত্যানুশীলনের উদ্দেশ্য। আর কোন অবাস্তব উদ্দেশ্য ছিল না।

তবে দীনবন্ধু কেবল ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য নহেন,বঙ্কিমেরও সহযোগী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই তিনি সমস্ত জীবন হৃদয়হীন দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের পানে চাহিতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর হৃদয়ে যে গভীর প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ ছিল, ক্রমে তাহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই বেদনাবোধ লিরিক কবিতায় কিংবা উপন্যাসে রূপলাভ করিতে পারিত, কিন্তু দীনবন্ধু, মাইকেল বঙ্কিমের মত সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন না। তাহা ছাড়া, তিনি দেখিলেন—উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিম, কাব্যের ক্ষেত্রে মাইকেল রাজত্ব করিতেছেন—নাট্যের রাজ্যে সিংহাসন শূন্য ছিল—তিনি তাহাই দখল করিলেন। নারীর অসহায়তাই তাঁহাকে সবচেয়ে বেশি ব্যথিত করিয়াছিল। তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যেও তাই আমরা দেখি অসহায়া নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রহসনের হাস্যোচ্ছ্বাসকেও স্থলে স্থলে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। নীলদর্পণে ক্ষেত্রমণির জীবন-

মরণের চিত্রে তিনি নারীর অসহায়তার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। এরূপ করুণ দৃশ্য বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় আর নাই। নীলদর্পণের এই দৃশ্য পড়িয়া মনে হয়—যিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারেন—তিনিই মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে পারেন।

নারীর অসহায়তাই প্রথমে তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল। তারপর তাঁহার মনে হইয়াছে—শুধু নারী কেন, বিদেশী শাসনে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই ত অসহায়। এই অসহায়তার জন্য যে গভীর বেদনাবোধ—তাহারই ফলেই নীলদর্পণের জন্ম। এই বাঙ্গালীজাতির একপ্রান্তে হিন্দু নবীন মাধব—আর এক প্রান্তে মুসলমান তোরাব।

দীনবন্ধুর রচনার বহু স্থলেই সাক্ষ্য দেয়—তাঁহার প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অসামান্য প্রতিভাকে তদুপযোগী সৃষ্টিতে সার্থক করিয়া যাইতে পারেন নাই।

(২)

বিলাতের বাড়ীগুলি নীলরঙে রাঙাইবার জন্য যে এক সময় শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ কুঠিয়ালরা কালা আদমীদের লালরঙকে নীলরঙে পরিণত করিত—এ কাহিনী সুসভ্য ইংরাজজাতির মস্ত একটি কলঙ্ক। যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে অমুদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে নীলরঙ আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে হয়ত বাংলায় ইংরাজের এ কলঙ্ক সহজে অপনীত হইত না। রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল রঙ উৎপাদন আবিষ্কৃত হওয়ায় বাংলার ধানের জমিতে নীল গাছের উৎপাদন বন্ধ হইল—তারপর দেশের লোক নীলকরদের অত্যাচার ক্রমে ভুলিয়া গেল। বাংলা সাহিত্যে এ কলঙ্ককে অবিস্মরনীয় করিয়া রাখিয়াছেন দীনবন্ধু তাঁহার নীলদর্পণে। একটি জাতির ঘরবাড়ীতে রঙের জৌলুসের জন্য আর একটি জাতির হাজার লোকের মুখের অন্ন কাড়িয়া লওয়া—তাহাদের উদ্বাস্তু করা, তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা—ইহা যে মানব সভ্যতার পক্ষে কতদূর পাশবিকতার ও হৃদয়হীনতার পরিচয়—তাহা ইতিহাসও ভুলিয়া যাইতে পারে, সামসময়িক সাহিত্য তাহা ভুলিতে পারে না। এইরূপ হৃদয়বিদারক ব্যাপার যদি সাহিত্যিকের মর্মস্পর্শ না করে—তবে আর কোন্ মানবদুঃখ তাহাকে বিচলিত করিবে? ভূমিকায় দীনবন্ধু বলিয়াছিলেন, "তোমাদের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরেজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপ ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ?"

দীনবন্ধু নীলকর সাহেবদের আহ্বান করিয়াই একথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু নীলদর্পণে দেখাইয়াছেন—নীলকররাই শুধু দায়ী নয়—সেকালে ইংরাজ রাজকর্মচারীদেরও ইহাতে সমর্থন ছিল—তাঁহারা অত্যাচারী নীলকরদের সহায়তা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যে সকল ইংরাজের অধীন হইয়া দীনবন্ধু কর্ম করিতেন তাঁহারা নীলকরদের সুহৃদ্।" ইহা ছাড়া বহুদিন ধরিয়া নীলকরদের অত্যাচার যেভাবে চলিয়াছিল তাহাতে মনে হয় সেকালের রাজসরকার 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকরকে' রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলিয়াছেন—"যে যে ব্যক্তি ইহাতে (অর্থাৎ নীলদর্পণের অনুবাদ ও প্রচারে) লিপ্ত ছিলেন প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া

লঙ্-সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তিনি জীবন-নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকরী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" ইহাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক—নীলকরদের প্রতি বহু ইংরাজের সহানুভূতি ছিল এবং ইহা ইংরাজের জাতীয় কলঙ্ক,—কতকগুলি কুঠিয়ালদের উপদ্রব মাত্র নয়।

দীনবন্ধু নিজে অবশ্য একথা বলেন নাই। তিনি নিজে একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন—তাঁহার চাকরী যায় নাই অথবা তিনি এজন্য বিপন্ন হ'ন নাই। তাঁহার উপরওয়ালা সাহেবরাও তাঁহাকে দণ্ডিত করেন নাই। নীলদর্পণে ইংরাজ পাদরি ও ডাক্তারচরিত্রের আভাস দিয়া তিনি রায়তদের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—"এক ঝাড়ের বাঁশ বটে ; কোনখানায় দুর্গাঠাকরুণের কাঠামো, কোন খানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

যাহাই হউক উৎপীড়িত দরিদ্র চাষীদের বেদনা ও নীলকরদের অত্যাচার তাঁহার কবিহৃদয়কে এতদূর বিচলিত করিয়াছিল যে, তিনি যে একজন ইংরাজের অধীনে রাজকর্ম্মচারী —তাঁহার জীবিকা যে নীলকরদের সজাতি ও বান্ধবদের হাতে, একথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এতদূর নির্ভীকতা বঙ্গসাহিত্যে সেকালে আর কেহ দেখাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি যে এই পুস্তক লিখিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন তাহা একটী অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। বহুপ্রকারে তাঁহার বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, বঙ্কিমের ভাষায়, 'এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রচারে পরাঙ্মুখ হ'ন নাই।'

দীনবন্ধু সত্যই ছিলেন 'দীনবন্ধু'—দীনের প্রতি দয়ার তাঁহার অবধি ছিল না। দীনের কল্যাণসাধনের জন্যই তিনি নিজের সর্ব্বস্ব বিপন্ন করিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করেন। বঙ্কিম বলিয়াছেন, "দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীলদর্পণ এই গুণের ফল।" দীনবন্ধু নীলদর্পণের নবীনমাধবে তাঁহার দরদী হৃদয়খানি সঞ্চারিত করিয়াছেন। দীনবন্ধুর অন্তর্গূঢ় বেদনাই নীলদর্পণের হতভাগ্য পাত্রপাত্রীগুলির মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া আছে।

নীলদর্পণের শোচনীয় দৃশ্য নীলকরদের অত্যাচারের একটি প্রতিনিধিমূলক চিত্র। একই কুঠি হইতে অতি অল্পদিনের মধ্যে এতগুলি অত্যাচার নাও হইতে পারে। বঙ্কিম বলিয়াছেন, "নীলদর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত।" দীনবন্ধু কয়েকটি প্রকৃত ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি সম্ভাবিত ও সুসমঞ্জস ঘটনার যোগে এই চিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন। এই চিত্রটিকে সাহিত্যের রূপ দেওয়ার জন্যই তিনি নাটকীয় ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে, ইহা সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক হইয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু নাটকীয় চিত্র হিসাবে ইহা সরস, বিশ্বাস্য ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও ইহার ভিত্তিমূলক মূল্য যথেষ্ট। নীলদর্পণে তিনি পরবর্ত্তী নাট্যসাহিত্যের পথের নির্দ্দেশও দিয়াছেন নানাভাবে। নীলদর্পণে তিনি যে চরিত্রগুলি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা ব্যক্তিমূলক নহে, জাতিমূলক। এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া তিনি দুইটি জাতির চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ইংরাজ জাতির চরিত্রেও দুইদিক আছে—বাঙ্গালী চরিত্রেও দুইদিক আছে।

ইংরাজের চরিত্রের একদিকের তিনি আভাসমাত্র দিয়াছেন—জঘন্য দিকটারই অঙ্কন করিয়াছেন দুইটি কুঠিয়াল ও একটি ম্যাজিস্ট্রেটের চরিত্রের মারফতে। এই চরিত্রচিত্রণ এমনই অবিকল ও বাস্তবমূলক যে ইহা সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হইয়াছে। আমরা এ যুগে এ শ্রেণীর সাহেব দেখি নাই, কিন্তু অনায়াসে গত শতাব্দীর কুঠীয়াল সাহেবের চরিত্র ইহা হইতে অনুমান করিয়া লইতে পারি। এজন্য ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালী চরিত্রের দুইদিকই তিনি দেখাইয়াছেন—তাঁহার গোলোক, নবীনমাধব, সাধু, তোরাব, সৈরিন্ধ্রী, সাবিত্রী ইত্যাদি চরিত্রে একদিক ফুটিয়াছে—আবার গোপী দেওয়ান, আমিন, পদী ময়রাণী ইত্যাদি চরিত্রে আর একদিক ফুটিয়াছে। দীনবন্ধু দেখাইয়াছেন বাঙ্গালী সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়, ধর্ম্মভীরু, সে স্নেহপ্রেমভক্তি ভালবাসাকে আশ্রয় করিয়া সাধুভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে চায়। তাহার সহিষ্ণুতার অন্ত নাই, চিরদিনই মুখ বুজিয়া সে বহু অত্যাচারই সহ্য করিয়াছে— অত্যাচারীর সহিত সন্ধি করিয়াও সে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে চায়। কিন্তু এই সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে—সে সীমা অতিক্রান্ত হইলে সে জীবন উৎসর্গ করে—আর সন্ধি করিতে পারে না।

অপর এক শ্রেণীর বাঙ্গালী আছে যাহারা স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা আত্মরক্ষার জন্য চরম অপমান সহ্য করিতে রাজী। বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, ইতরতা, অসাধুতা, নির্ম্মমতা, ইত্যাদিই তাহাদের আশ্রয়। এই শ্রেণীর বাঙ্গালীরাই যুগে যুগে অত্যাচারী নরপশুদের সহায়ক। কেবল স্বার্থের জন্য ইহারাই স্বজাতির সর্বনাশ করে—পরম উপকারী নিষ্কলঙ্ক সাধুব্যক্তিকেও জেলে পাঠাইতে বা সর্ব্বস্বান্ত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহারাই সাহেবের লাথি খাইয়া জিজ্ঞাসা করে—"হুজুরের পায়ে লাগে নি ত!" East India Companyর সময় হইতে এই শ্রেণীর বাঙ্গালীরাই সাহেবদের দুষ্কর্ম্মের বুদ্ধিদাতা ও সহায়ক। ইহাদের জন্যই সাহেবদেরও এদেশে এত দুর্নাম, এত নৈতিক অধঃপতন। গ্রামবাসীদের যে চরিত্রের পরিচয় এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়—সাধুসজ্জন পরোপকারী ব্যক্তির উপর অযথা অত্যাচার হইলে গ্রামবাসীরা হায়-হায় করে, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। তাহাদের চরিত্রের মূলমন্ত্র—"আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

নীলদর্পণে মোক্তারদের আবেদনগুলি সুরচিত। নাটকের স্থলে স্থলে গিরীশচন্দ্রের টেকনিকের পূর্ব্বাভাস দেখা যায়। ক্ষেত্রমণির চিত্রটিতে বিন্দুমাত্র অবাস্তব কল্পনার সহায়তা আছে বলিয়া মনে হয় না—রচনাগুণে ইহা অতিকরুণ বাস্তবচিত্রে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, হয়ত প্রকৃত ঘটনা।

সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বস্তু নীলদর্পণের ভাষা। যশোহর জেলায় নীলকুঠি ছিল খুব বেশী। যশোহর জেলার চাষীদের কথাই ইহাতে আছে। দীনবন্ধু নিজেও ছিলেন যশোহর জেলার লোক। এই চাষীমজুরশ্রেণীর নরনারী যে ভাষায় কথা বলে দীনবন্ধু হুবহু সেই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের বুঝিতে অসুবিধা হয় সত্য, কিন্তু নাটকের নিজস্ব ধর্ম্ম ইহাতে অক্ষুন্ন থাকিয়া গিয়াছে। সাহেবদের মুখের স্বাভাবিক বাংলা

নিশ্চয়ই আরো বিকৃত এবং ইংরাজী শব্দ তাহারা আরো বেশী নিশ্চয়ই ব্যবহার করিত। তাই এ ভাষা যথাযথ বলিয়া মনে হয় না। তবে তাহাদের মুখের গালাগালিগুলি যথাযথই বটে। ভদ্রজাতীয় পুরুষদের মুখের ভাষা দীনবন্ধু অতিরিক্ত সংস্কৃতানুগ করিয়া তুলিয়াছেন—ভাষায় সংস্কৃত-রূপক প্রয়োগও হইয়াছে অজস্র। সে যুগেও ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা নিশ্চয়ই এ ভাষা ব্যবহার করিত না। এ ভাষাও সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। কেবল পঠনীয় নাট্যরচনা হিসাবে চাষীর মুখের ভাষা ও সংস্কৃতানুগ ভাষা আয়াসবোধ্য হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু বঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের সময় এই দুই ভাষ ই অচল, কারণ শ্রুতিমাত্র অর্থবোধ না হইলে অভিনয় উপভোগ্য হয় না।

বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় অশ্লীলতা সমর্থনের জন্য অনেক কথা বলিয়াছেন। গুপ্ত কবির অশ্লীলতা-দুষ্ট রচনাগুলি পরে বর্জ্জিত হইয়াছে—গ্রন্থাবলীতে আমরা পাই না। বঙ্কিম নীলদর্পণের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন—তাহাতে নীলদর্পণের ভাষার কথাও আছে। তিনি নীলদর্পণের ভাষার অশ্লীলতা সম্বন্ধে একটা জবাবদিহি দিতে পারিতেন। কোন জবাবদিহি না দিয়া মৌনের দ্বারা তিনি ঐ ভাষাকে পাংক্তেয় বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। দীনবন্ধু নীলদর্পণে রায়তদের যে জীবনচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা কল্পিত নয় বাস্তব। ভাষাগত অশ্লীলতা ঐরূপ জীবন চিত্রের অঙ্গীভূত, কাজেই অপরিহার্য্য।

সঞ্জীববাবুর ভাষায় বলিতে হয়, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' বর্বরের ভাষা বর্বরের মুখে অসুন্দর নয়।

নীলদর্পণের সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক—দরিদ্র বাঙ্গালী জাতির উপর একশ্রেণীর সাহেব ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের চরম সাক্ষী হইয়া বঙ্গসাহিত্যে ইহা অমরত্ব লাভ করিবে।

৩

দীনবন্ধু হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেকালে হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র কিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা রাজনারায়ণ বসুর 'একাল ও সেকাল' ও রামতনু লাহিড়ীর আত্মজীবনচরিত যাঁহারা পড়িয়াছেন—তাঁহারাই জানেন। বিলাতি শিক্ষা পাইয়া সেকালের কলেজের ছাত্রগণ প্রকৃত বিলাতি সভ্যতা অধিগত করিতে পারে নাই। হিন্দু সমাজের যাহা কিছু ভালো তাহারই বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। বিলাতি শিক্ষার সহিত তাহারা দেশী ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতার যোগ দিয়া কিম্ভূতকিমাকার হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে ২।৪ জন ছাড়া অধিকাংশই তাহাদের শিক্ষার সুপ্রয়োগের ক্ষেত্র লাভ করে নাই। দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র একটি চমৎকার উপমা দিয়াছেন—"দুইটি জলীয় পদার্থবিশেষকে একত্র মিশ্রিত করিলে যেমন ফেনপুঞ্জের আবির্ভাব হয়—শিক্ষিত সমাজের সেই অবস্থা তখন ছিল।" অর্থাৎ বিলাতি শিক্ষার সার তাহারা পায় নাই—দেশী শিক্ষাও তাহারা বর্জ্জন করিয়াছিল। দুই সভ্যতার মিশ্রণে যে অসার ফেনের উদ্গম হইয়াছিল—ইহারা পাইয়াছিল তাহাই।

এইরূপ শিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খলদের চরিত্র এবং তাহাদের আচরণের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন মাইকেল প্রথমে 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক প্রহসনে। মাইকেল নিজে সেকালের একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। বিলাতি শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সুরাপান, অমিতব্যয়িতা, স্বধর্মভ্রংশ ইত্যাদি কতকগুলি দোষও তাঁহার চরিত্রে সংক্রমিত হইয়াছিল, কিন্তু দেশী ধরনের ইতরতা, অসত্যাচরণ ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন। সে জন্যই 'একেই কি বলে সভ্যতা রচনা করিতে তাঁহার লেখনী কম্পিত হয় নাই। আর দীনবন্ধুর 'নিমেদত্ত' চরিত্র মাইকেলকে দেখিয়া অঙ্কিত হইয়াছে—যাহারা মনে করে, তাহারাও ভ্রান্ত। নিমে দত্তের চরিত্রে ইংরাজি ভাষার সঙ্গে ইংরাজি সভ্যতার নামগন্ধও নাই—দেশী ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রবল নিমেদত্ত তাঁহার বিলাতি বিদ্যার সুপ্রয়োগের কোন ক্ষেত্রও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সে শুধু সুরাপানের ফাঁকে ফাঁকে সেক্সপীয়র, মিলটন হইতে বাক্যাবলী মুখস্থ বলিতে পারিত। মনীষী দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বলিয়াছেন—

"নিমচাঁদ কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই। সাময়িক ভারতীয় নিম একত্রে বাটিয়া ছানিয়া এই অপূর্ব্ব চাঁদের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিমচাঁদ যতই ইংরাজি মুখস্থ বলুক প্রকৃত বিদেশী শিক্ষাও সে পায় নাই। তাহা পাইলে তাহার মুখের ভাষা—বিশেষতঃ গালাগালিগুলো, রসিকতাগুলো এদেশের ইতর লোকের মুখের মত হইত না। সুরাপান এদেশেও প্রচলিত ছিল, বিদেশী শিক্ষা সুরাপানের প্রবৃত্তিটা বাড়াইয়াছিল এবং সুরাপানটা যে দেশের লজ্জার বিষয় সে ধারণা দূর করিয়া ইহাকে সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল। বিদেশী শিক্ষা না পাইয়াও যে বহু ব্যক্তি সুরাপান করিয়া উৎছন্নে যাইত—তাহার একটা দৃষ্টান্ত দীনবন্ধুর পরে গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে দেখাইয়াছেন। মোটের উপর দীনবন্ধু সুরাপান ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য কুক্রিয়ায় তাঁহার সময়ের বাংলার নাগরিক জীবন কিরূপ কলঙ্কিত হইয়াছিল তাহারই চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। অবশ্য সেকালের ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অনুকরণেই সমাজে এ কলঙ্কের বিস্তার হয়। দীনবন্ধু দেখাইয়াছেন এই অনুচিকীর্ষা ইংরাজি ভাষায় অতি-অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নাগরিকদিগকেও আক্রমণ করিয়াছিল। দূর পল্লীগ্রামের ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকও 'কলকাত্তাই' ও সভ্য হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কলিকাতার উচ্ছৃঙ্খল সমাজের অনুকরণ করিত। রামমাণিক্য চরিত্রের অবতারণা শুধু ব্যঙ্গ করিবার জন্য নয়। দূর পল্লীগ্রাম হইতে চরিত্র আমদানির জন্যই তিনি ঢাকা জিলায় গিয়াছেন—আর তাহার মুখে পূর্ব্ব বঙ্গীয় ভাষণ বসাইবার কারণ চরিত্রের স্বাভাবিকতা ও যথাযথতা রক্ষা এবং চরিত্রটিকে জীবন্ত করিয়া তোলা।"

দীনবন্ধু দেখাইয়াছেন—সমগ্র সমাজেই একটা দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহার ফলে দুর্ব্বল চিত্ত লোকেরা উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছিল, সবলচিত্ত লোকদের চরিত্রেও মানসিক বলের দৈন্য ও শিথিলতা আসিয়াছিল। কেনারাম, নকুল ইত্যাদি চরিত্রের অবতারণা সেই জন্যই।

এই দূষিত প্রভাবের প্রতিক্রিয়াও একটা দেখা গিয়াছিল ব্রাহ্ম সমাজে। ব্রাহ্মসমাজ

বঙ্গীয় সমাজকে বিলাতি কদাচারের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল—দীনবন্ধু তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন—দীনবন্ধু লোকশিক্ষার জন্যই প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। মনে হয়, তাহা ঠিক নয়। দীনবন্ধু ছিলেন আসল সাহিত্যিক—তাঁহার সাহিত্যরচনায় সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যই প্রেরণা ছিল বলিয়া মনে হয় না।

তাহা হইলে তিনি কেবল নিমচাঁদ, অটল ইত্যাদির চারিত্রিক অধোগতি দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতেন না—সর্ব্ব প্রকারে দুর্গতিই দেখাইতেন, রোগ, কারাবাস, আর্থিক দুর্গতি ইত্যাদি শোচনীয় পরিণাম দেখাইবার চেষ্টা করিতেন। দীনবন্ধু সেকালের সমাজের একটা অবিকল চিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন। প্রত্যেক চিত্র হইতেই একটা নৈতিক উপদেশ বা শিক্ষা আকর্ষণ করা যাইতে পারে। যদি শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল মনে করা হয়—তাহা হইলে দেশের জননীদেরই ইহাতে শিখিবার যথেষ্ট আছে বলিতে হয়। স্নেহাতিশয্যও একপ্রকারের সুরা। এই সুরা পিতা অপেক্ষা মাতাকেই অপ্রকৃতিস্থ করে সব চেয়ে বেশী। অটলের মাতার স্নেহাতিশয্যই তাহার পতনের কারণ বলিতে হয়। সন্তানের বাল্যকাল হইতেই প্রত্যেক জননীর স্নেহাতি সংযমই সন্তানের পক্ষে মঙ্গলজনক। বাঙ্গালী জননীর পক্ষে এই প্রহসন হইতেই ইহাই শিক্ষণীয় বুঝিতে হয়। জননীর মত প্রত্যেক শ্বশুরেরও শিক্ষণীয় আছে। কন্যাদান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চরিত্রই দেখিতে হয় কেবল ধনসম্পদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধনীর একমাত্র সন্তানকে কন্যাদান ফণীর মুখে কন্যাসমর্পণ। এই প্রহসন সেই শিক্ষাও দিতেছে বলিতে হয়।

দীনবন্ধু দেখাইয়াছেন নিমে দত্তের মাঝে মাঝে চৈতন্য ফিরিয়া আসিতেছে—তাঁহার মনে আত্মধিক্কার জন্মিতেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন দীনবন্ধু দেখান নাই। চরিত্রের পরিবর্ত্তন দেখাইলে প্রহসনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই নষ্ট হইয়া যাইত, রসাভাস ঘটিত। উচ্ছৃঙ্খল দুশ্চরিত্র ব্যক্তির সাধুতালাভ নাটকের বিষয়ীভূত, প্রহসনের নয়। যাহা হাসাইবে—তাহা শেষ পর্য্যন্তই হাসাইবে, কোথাও গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করিবে না। দীনবন্ধুর রচনায় পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারী চরিত্রগুলি অধিকতর জীবন্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী নারীর মর্ম্মকথা সেযুগে এমন অবিকল ভাবে কাহারও রচনায় পরিস্ফুট হয় নাই, বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের এমন কৌতুকোচ্ছল চিত্র বঙ্কিমের ইন্দিরা ছাড়া অন্য কোন পুস্তকে সে যুগে দেখা যায় না।

দীনবন্ধুর কৌতুক জ্ঞান ছিল অসাধারণ। সধবার একাদশী হইতে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে দিই। রামবাবু নিমেদত্তকে ধরিয়া প্রহার দিতেছেন। নিমেদত্ত সমগ্র নাটকখানিতে দর্শককে নিজের দুর্গতির বিনিময়ে যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে। সে বেচারা যখন প্রহৃত হইতেছে—তখন দর্শকের মুখে হাসি শুকাইয়া যাইবার কথা—ভাবান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা। অসাধারণ শিল্পী দীনবন্ধু এই সময়ে নিমেদত্তের মুখে যে কথাগুলি বসাইয়াছেন—তাহাতে দর্শকের চিত্তে ভাবান্তর ঘটিতে পায় নাই—তাহার মুখের হাসি এবং মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নিমেদত্ত ছিল খাটের তলায় লুকাইয়া। রামবাবু তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন—

রাম—হারামজাদা, মদ খেলে চোখে কানে দেখতে পাও না ?

নিমে—(রামধনের কিল খাইতে খাইতে) once, twice, thrice, আউট আবার মারে— দূর ব্যাটাচ্ছেলে তোর যে আউট হয়ে গিয়েছে ।

রাম—তোর মাৎলামিটা বের করছি (কানমলন)

নিম—As tedious as a twice told tale-কানমলা যে একবার হয়ে গেছে—ও আর ভালো লাগবে কেন ?

রাম—দূর ব্যাটা পাজি (গলাটিপি)

নিম—That's repetition too, গলাটিপি হয়ে গেছে বাবা। আর কিছু টেপো ।

রাম—এখন তোমাকে সন্দেশ কিনে দিই ।

নিম—কেন বাবা জিনিসগুলো নষ্ট করবে—মদের মুখে কোন শালা সন্দেশ খেতে পারে না ।

রাম—হারামজাদা ব্যাটারা কেবল বসে বসে মদ মারবেন আর লোকের সর্বনাশ করবেন ।

নিম—আমরা তো মদ মারি—আপনি যে মাতাল মারেন ।

রাম—মেরে মেরে তোর হাড় গুঁড়া করবো । (প্রহার)

নিম—ইতি কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে । মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্য্যন্ত জ্ঞানপদ, তা যারা অধ্যয়ন করেছে তারাই বলতে পারে—আপনার পদাঘাতপুঞ্জ প্রকৃত পীযূষ, And the last, though not the least আপনার অর্দ্ধচন্দ্রগুলি যারপর নাই edifying আপনার অর্দ্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হয়েছে Lock on Human Understanding পড়ে ওরূপ হয়নি ।

সধবার একাদশীতে দীনবন্ধু পত্নীর প্রতি অবিচারের এবং জামাইবারিকে পতির প্রতি পত্নীর অবিচারের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। পতির সংসারের গৃহলক্ষ্মী যাহারা তাহারা পতির প্রতি নিষ্ঠুর নিষ্প্রেম আচরণ করিবে ইহা স্বাভাবিক নয়। সেজন্য তিনি ধনিকন্যার ঘরজামাই মূর্খ অপদার্থ পত্নীপতিপালনে অক্ষম পতির এবং একাধিক বিবাহকারী কুলীন পতির লাঞ্ছনার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। আজ সমাজে এই দুই শ্রেণীর পতির অভাব হইয়াছে—কিন্তু দীনবন্ধুর সময়ে এই শ্রেণীর পতি গ্রামে গ্রামেই মিলিত। বর্ত্তমান সময়েও লাঞ্ছিত পতির অভাব নাই, কিন্তু তাহারা মূর্খ বা পত্নী-প্রতিপালনে অক্ষম নয়, তাহারা বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত, বিদেশী আচারে দীক্ষিত, প্রচুর উপার্জ্জনে সক্ষম। তাহা ছাড়া, সব দেশে সব যুগেই স্ত্রৈণ পুরুষগণ স্ত্রীর দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। দ্বিপত্নীক পদ্মলোচন ও ঘরজামাই অভয়চরণ দুইজনের লাঞ্ছনা লইয়া এই প্রহসন রচিত হইয়াছে। কোন নিরপরাধ ব্যক্তির লাঞ্ছনা লইয়া প্রহসন জমে না—দীনবন্ধু তাহা বুঝিতেন—তাই অভয়চরণকে করিয়াছেন নেশাখোর ও সংসার ভারবহনেপরাঙ্মুখ। সে নিঃস্ব, মূর্খ ও কর্ম্মকুণ্ঠ—অথচ সে ধনিকন্যাকে

বিবাহ করিয়া গৃহপালিত জামাতা হইয়া সুখে নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইতে চায়—কাজেই সে সহানুভূতির পাত্র নয়। তাহার লাঞ্ছনা উপভোগ্যই হইয়াছে। আর পদ্মলোচন একজন পত্নীকেই স্বচ্ছন্দে পালন করিতে পারে না—সে পত্নীর সন্তান হয় নাই বলিয়া ৫।৭ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াই আর একটি পত্নী গ্রহণ করিয়াছিল। কাজেই সেও সহানুভূতির পাত্র নয়—অতএব তাহার লাঞ্ছনাতেও বেশ রস জমিয়াছে।

প্রহসনের অন্তরালে সমাজসংস্কারের আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রহসনের পক্ষে রসানুকূল নয়। সেকালের সকল প্রহসনেই এই আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকিত। সেইরূপ একটা উদ্দেশ্য জামাই বারিকে নাই তাহা নহে, তবে দীনবন্ধু যতদূর সম্ভব তাহাকে প্রকট হইতে দেন নাই। জামাইদের ব্যারাকের চিত্রটি আঁকিয়া প্রহসনের একটি চমৎকার আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রহসনের পাত্র পাত্রীর চরিত্রে ও আচরণে একটু বেশী Emphasis দিতে হয়। ইহা প্রহসনকে সহায়তাই করে। কাজেই প্রহসনে যথাযথতা বা স্বাভাবিকতা অক্ষরে অক্ষরে সন্ধান করিবার কথা নয়। সপত্নীরা পতির উপর অতটা অত্যাচার করিতে পারে না—ধনিকন্যা হইলেও স্বামীকে লাথি মারিতে পারে না এবং ঘরজামাইএর সংখ্যা ৫৪।৫৫ জন হইতে পারে না। ধনিকন্যা একজন বুড়ো ময়রার সঙ্গে স্বামীর খোঁজে বৃন্দাবন যাত্রা করিতে পারে না। এইরূপ আপত্তি তোলা বেরসিকের কাজ। মনে রাখিতে হইবে—দীনবন্ধুর প্রহসন পাত্রপাত্রীর আচরণের উপর নির্ভর করে না—পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষণের উপরই নির্ভর করে। জামাইদের ব্যারাকের এক নিশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ও মাণিকপীরের গানের অবতারণা উৎকৃষ্ট প্রহসন কলার নিদর্শন।

ব্যথিত নারীর আক্ষেপ চিরদিনই পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রহসনের নারীর আক্ষেপ তাহা করিলে রসাভাস ঘটে। জামাইবারিকের ব্যথিতা নায়িকা হাস্যরসকেই পুষ্ট করিবে—করুণরসকে নয়, ইহাই স্বাভাবিক। দীনবন্ধুর এ বিষয়ে কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঘরজামাইয়ের বধূর আক্ষেপানুরাগের একটি পদ এখানে উৎকলন করি—

কেন বা বাঁধিনু চুল কেন মল্লিকার ফুল
ঘিরে দিনু কবরীর গায় ?
মুক্তাপুঞ্জ অলকায় কেন দোলাইনু হায়
কেন আল্‌তা দিনু রাঙা পায় ?
কটিতটে চন্দ্রহার মরি মরি কি বাহার
কিবা হার পয়োধর' পরে।
ছাঁচিপানে দিয়ে খয় রঞ্জিয়াছি ওষ্ঠাধর
মেদি পাতা দিছি পদ্মকরে।
নীলনেত্র মনোহর যেন দুটি ইন্দীবর
যোগভঙ্গ অপাঙ্গের ধাম,

নবীন যৌবন ধন কারে করি বিতরণ
পরিণেতা পোড়া বাঙ্গারাম।
ঘরজামায়ে অন্নদাস প'ড়ে গুলী খাচ্ছে ঘাস
বারোমাস করে জ্বালাতন।
এখনি নিকটে ব'সে মাথা খাবে দাদ ঘোষে
ফাটা পায় ছিঁড়িবে বসন।
থাকে যবে নিজ ঘরে স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে
মাথায় বিচালি বাঁধি আনে।
এমন চাষার কাছে আমার কি সুখ আছে ?
কি আছে কপালে কেবা জানে।

———

রঙ্গলাল

মাইকেলের পর উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে রঙ্গলালের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইনি ইংরাজিনবিশ ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ কবিদের চিন্তাধারার প্রভাব ইঁহার রচনায় বিশেষ কিছু দৃষ্ট হয় না। ইনি সেকালের কবিগুরু ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন এবং তাঁহার সম্পাদিত সংবাদ-প্রভাকরেই ইঁহার প্রথম যৌবনের রচনা প্রকাশিত হইত। রচনার বহিরঙ্গের দিক হইতে ইনি ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন। যদিও ভারতচন্দ্রের মত ইনি বিবিধ ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন, ইঁহার রচনার প্রধান ছন্দ ছিল—দীর্ঘত্রিপদী। এই দীর্ঘত্রিপদী ছন্দ রঙ্গলালের হাতে সর্ব্বাঙ্গীণ পারিপাট্য লাভ করিয়াছিল। সামসময়িক কবি মধুসূদনের প্রভাব ইঁহার রচনায় সঞ্চারিত হয় নাই। কাব্যের বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইনি পূর্ব্বগামী বঙ্গীয় কবিদের অনুসরণ করেন নাই। ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া কাব্য-রচনা-পদ্ধতির সূত্রপাত হইয়াছিল ভারতচন্দ্রেই—কিন্তু তাহা ধর্ম্মমূলক মঙ্গলকাব্যের অঙ্গীভূত হইয়া। খাঁটি ঐতিহাসিক কাব্য-রচনার প্রবর্ত্তক এই রঙ্গলাল। বাঙ্গালার ইতিহাসে বৈচিত্র্য নাই এবং তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তথ্যগুলি আবিষ্কৃতই হয় নাই। এদিকে টড সাহেবের কৃপায় রাজপুত-জাতির ইতিহাস বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের অধিগত হইয়াছিল। রঙ্গলাল রাজপুতনার ইতিহাস হইতে তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাজপুতানার ইতিহাস হইতে বিষয়বস্তু-নির্বাচনের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। রঙ্গলাল ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতা হইতে যে দেশপ্রীতি, শৌর্য্য, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন—তাহাই তাঁহাকে কাব্য-রচনার প্রেরণা দিয়াছিল। এই আদর্শের অভিব্যক্তির জন্যও তিনি রাজপুতানার ইতিহাস হইতে বিষয়-বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে তাঁহার আদর্শানুযায়ী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই উপাদানগুলি লইয়া তিনি কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি সেগুলিকে খণ্ড-কাব্যের আকার দান করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপাদান লইয়া পদ্মিনী উপাখ্যান, শূরসুন্দরী ও কর্ম্মদেবী এই তিনখানি খণ্ডকাব্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন। পদ্মিনীর ভূমিকায় তিনি ঐতিহাসিক কাব্য রচনার কৈফেয়ৎ দিয়া বলিয়াছেন—সেকালের কোন কোন মহাত্মা 'এদেশের অশ্লীল ও অপবিত্র কাব্য পাঠে বালবৃদ্ধবনিতার অনুরক্তিতে পরিখেদিত হইয়া' তাঁহাকে বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্য রচনায় অনুরোধ করেন, সেজন্য তিনি এশ্রেণীর কাব্য লিখিয়াছেন। আমাদের দেশের পুরাণে 'অদ্ভুত-রসাশ্রিত অলৌকিক বর্ণনার' আতিশয্য থাকায় তিনি পুরাণ বর্জ্জন করিয়া ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন। রাজপুত জাতির ইতিহাস অবলম্বন করার কারণ তিনি দেখাইয়া বলিয়াছেন—

"বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদুষীত্ব ও সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন—এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুতেতিহাস অবলম্বনে মৎকর্ত্তৃক রচিত হইল।"

রঙ্গলাল নিজে বলিয়াছেন—তিনি ইংরাজি কবিদের অনুসরণে বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্য রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার মধ্যে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে। ইহার জন্য তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—তাহা এ যুগে উপহাস্য হইবে। যাহাই হউক তাঁহার রচনায় ইংরাজী কবিতার ভাবাকর্ষণ যতই থাকুক এবং তাঁহার রচনা-প্রণালী যতই বিশুদ্ধ হউক—ইংরাজী কবিতার অন্তরাত্মা তাঁহার কাব্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই—ইংরাজ কবিদের চিন্তার আদর্শ ও আর্ট তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনাভঙ্গী সম্পূর্ণ দেশীয় প্রকৃতির—পার্থক্যের মধ্যে গতানুগতিক দেশীয় ধারার রসবস্তু তিনি বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন। যেমন—ভারতচন্দ্রের রচনাভঙ্গী তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের "ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের প্রতি আসক্তিকে" তিনি সর্ব্ব প্রযত্নে বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন।

প্রকৃত কাব্যের লক্ষণের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"কাব্য ভাবকুসুমের সৌরভ মাত্র—কবির রচনা-শক্তি তাহার মলয়ানিল।" কাব্যের সংজ্ঞা ইহা হইতে চমৎকার আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাব্যের এই সংজ্ঞাকে তিনি নিজের রচনায় অনুসরণ করিতে পারেন নাই। কাব্যের বাকি যে লক্ষণগুলির কথা তিনি বলিয়াছেন—সেগুলির সমস্তই মানব-মনের উৎকর্ষ সাধনে ও মানব-জীবনের কল্যাণ সাধনে সহায়তার কথা অর্থাৎ "কাব্যং শিবেতর-ক্ষতয়ে।" সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "কবিতা সুষুপ্তপ্রায় মানসিক বৃত্তিচয়কে সহসা জাগরিত ও উত্তেজিত করিতে পারে।" এই প্রসঙ্গে চারণ কবিদের উল্লেখও করিয়াছেন। রঙ্গলালের নিজের কবিতার সহিত এই লক্ষণের বেশ মিল হয়। রঙ্গলাল বঙ্গদেশের প্রথম চারণ কবি। রঙ্গলালের কবিতা রসোদ্বোধনে সহায়তা করে না—"ভাবকুসুমের সৌরভে" আমাদের মন আমোদিত করে না, ইহা আমাদের অন্তরে প্রসুপ্ত কতকগুলি মানসিক বৃত্তিকে উদ্দীপিত করে।

রঙ্গলালের কাঞ্চী-কাবেরী কাব্যখানি সুপরিচিত নয়। অথচ কাব্যাংশে ইহা পদ্মিনী ও কর্ম্মদেবী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। ইহার বিষয়বস্তু পুরা ঐতিহাসিক নয়, রোমান্টিক।—সামান্য কিছু ঐতিহাসিকতার মিশ্রণ আছে। উড়িষ্যার মাদলাপঞ্জী নামক প্রাচীন গ্রন্থে এই কাহিনীটি সংরক্ষিত আছে। এই গল্প লইয়া উড়িষ্যার কোন কবি কাঞ্চীকাবেরী নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—রঙ্গলাল সেই কাব্যপাঠে বাংলায় এই কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের বর্ণনা-চাতুরী প্রশংসনীয়। পদ্মিনীর ভূমিকায় রঙ্গলাল বলিয়াছিলেন—অলৌকিক ব্যাপারের জন্য তিনি পৌরাণিক বিষয় বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাঞ্চীকাবেরীর ঐতিহাসিক

উপাখ্যানেও তিনি অলৌকিক আখ্যানবস্তু সংযোজনা করিয়াছেন। পৌরাণিক উপাখ্যানে অলৌকিক সংঘটনার সমাবেশ আদৌ সঙ্গত নয়—রসের প্রতিকূলও নয়। ঐতিহাসিক ব্যাপারেই সঙ্গতি থাকে না। রঙ্গলাল ইহা লক্ষ্য করেন নাই, অথবা পরিণত বয়সে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

রঙ্গলালের সাহিত্যসেবা বহুমুখী ছিল। ইনি একাধিক সাময়িকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। একসময় রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি কবিকঙ্কণ চণ্ডী সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। বীমস্ সাহেবকে ভারতীয় ভাষায় ব্যাকরণ রচনায় সাহায্য করেন এবং কালিদাসের কুমার-সম্ভব কাব্যের অনুবাদ করেন। রঙ্গলালের পূর্ব্বে কোন সংস্কৃত কাব্যের বোধ হয় কাব্যানুবাদ হয় নাই—গদ্যানুবাদ হইয়াছিল। রঙ্গলালই প্রথম এই প্রথার প্রবর্ত্তক। রঙ্গলাল ভূমিকায় এই অনুবাদের যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা কাব্যরস-সম্ভোগের পক্ষে অনুকূল নয়। মাইকেলের আবির্ভাবের পর সাধারণ পয়ারের দিন ফুরাইয়া গিয়াছিল। রঙ্গলাল পয়ার ছন্দে কাব্য লিখিয়া মাইকেলের যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহার শূরসুন্দরীর সে যুগেও আদর হয় নাই। রঙ্গলাল দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবি। এই ছন্দ রঙ্গলালের হাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া দেখা দিয়াছে। অনুবাদে যেখানে তিনি দীর্ঘত্রিপদী ব্যবহার করিয়াছেন—সেখানে অনুবাদ চমৎকারই হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ অনূদিত কুমারসম্ভবের পরিশিষ্টে সংযোজিত ও কর্ম্মদেবীকাব্যমধ্যস্থ সন্ধ্যাবর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রঙ্গলাল দশমাত্রার অন্তরা যোগে দীর্ঘত্রিপদীর স্তবক গঠন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। পদ্মিনী-প্রদর্শন ও বাদলের যুদ্ধ এইরূপ স্তবকিত দীর্ঘ-ত্রিপদীতে রচিত। রঙ্গলাল মালঝাঁপ ছন্দো-রচনাতেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

কবির 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' বিখ্যাত কবিতা। ইহা পদ্মিনী উপাখ্যানের ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ-বাক্য। বোধহয় ইহাই বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম দেশাত্মবোধমূলক কবিতা। কবি এই কাব্যে সর্ব্বত্রই ভারতের দুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন

কোথা সে বীরত্ব আর বিক্রম বিশাল। সকলি করেছে গ্রাস সর্ব্বভুক কাল।

কবি শেষ পর্য্যন্ত পাঠানের ধ্বংসাভিযানের কথা ভুলিয়া কালেরই ধ্বংসলীলার কথা বলিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছেন—যতই বীরকীর্ত্তি থাকুক সবই বিস্মরণীর গভীর নীরে মগ্ন হইত—একমাত্র কবিই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখে।

করাল কালের কাণ্ড যেন সব ক্রীড়াভাণ্ড
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহান্ কিবা ক্ষুদ্র কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র
তার কাছে সব একাকার।

সিংহাসন অধিষ্ঠাতা শিরোপবে হেমছাতা
ধাতা প্রায় প্রতাপ যাঁহাব,
তাঁহাব যেরূপ গতি অন্নদাস ছন্নমতি
মবণেতে তাবো সে প্রকার।
যে পথে মান্ধাতা গত কোটি কোটি শত শত
সেই পথে যায় দীনগণ,
মান্ধাতা মনুর জন্য নাহি আর পথ অন্য
একপথ আছে চিরন্তন।
থাকে কিছু কীর্ত্তিলেশ নামমাত্র থাকে শেষ
সেই শুধু কবির কল্যাণে।
কে জানিত যুধিষ্ঠিরে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।

কবি পবাধীন ভারতে একমাত্র চিতোবেব উপরই ভরসা করিয়াছিলেন—কাবণ, হিন্দুর প্রতাপলেশ যাহা কিছু অবশেষ ছিল মাত্র চিতোব নগবে।

যথা ঘোব অমানিশা তমঃ পূর্ণ দশদিশা
আকাশে জলদ আড়ম্বর'
মেঘহীন একদেশে বিমল উজ্জ্বল বেশে
দীপ্তি দেয় তাবকা সুন্দব।
অথবা তবঙ্গ ভঙ্গ জলধিব অঙ্গসঙ্গ
স্রোতে হয় তৃণ তিনখান।
তমোময় সমুদয় কিছু দৃষ্ট নাহি হয়
পরিশ্রান্ত পোতপতিপ্রাণ।
বিপদবাবণহেতু শৈলোপরি যেন কেতু
প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায়।
সেরূপ ভারতদেশে স্বাধীনতা সুখ, শেষে
ছিল মাত্র রাজপুতনায়।

সেই শিবরাত্রিব শলিতাও নিভিয়া গেল বলিয়া কবির আক্ষেপ।

পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকৃতপক্ষে উপাখ্যানই—পদ্মিনীকাব্য ইহাকে বলা চলে না। কবি উপাখ্যানের দিকেই খরদৃষ্টি রাখিয়াছেন—স্থলে স্থলে কবিত্বেরও স্ফুরণ আছে। যেমন—পদ্মিনীর রূপের পরিচয়ে। যে রূপসীর জন্য দিল্লীর বাদশাহ নিজের সাম্রাজ্যকেও বিপন্ন করিয়াছিলেন—মামুলী প্রথায় সে রূপের বর্ণনা চলে না। কবি তাই পদ্মিনীর রূপবর্ণনার নিষ্প্রয়োজনতা প্রমাণের ছলে রূপ গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

অতুলনা রাজকন্যা ভুবনে ভামিনী ধন্যা
অগ্রগণ্যা রূপসী সমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ কি বর্ণিব অপরূপ
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে।
কোন মূঢ় চিত্রকরে পদ্মদেহ চিত্র করে
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিংবা সেই কোকনদে মাখাইলে মৃগমদে
অতিসুখ লভে মধুলোভা ?
কষিত কাঞ্চন কায় কিবা কার্য্য জ্যোছনায়
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
কোন মূর্খ আছে কে হে দিবে ইন্দ্র-ধনু-দেহে
অভিনব রূপরঙ্গ-ঘটা।
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি প্রখর ভাস্কর ভাতি
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল,
কি কাজ সিন্দূরে মাজি গজমুক্তা ফলরাজি
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ?

এই অংশ যে Shakespeare এর King John নাটকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে অনূদিত তাহা রচনার গুণে বুঝিবার উপায় নাই।

To gild refined gold. to paint the lily,
To throw a perfume on a voilet,
To smooth the ice or add another hue,
Unto the rainbow or with taper light
To seek the beauteous eye of heaven to garnish
Is wasteful and ridiculous excess.

রঙ্গলাল ইংরাজি কবিতার বাংলায় কেবল রূপান্তর নয়, জন্মান্তর দান করিতে পারিতেন। তাঁহার সুবিখ্যাত কবিতা 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়' Thomas Moore এর একটি কবিতার আংশিক অনুবাদ। কবিতা পড়িয়া অনুবাদ বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। এখানে দুই চরণ তুলিয়া দিই।

From life without feedom oh ! who would not fly ?
For one day of freedom oh ! who would not die ?

রঙ্গলাল ইংরাজি কাব্য হইতে প্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করিতেন। Byron, Moore এবং Scottই ছিল তাঁহার আদর্শ কবি। মাইকেল মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে এক-

পত্রে লিখিয়াছিলেন—"Rangalal is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore and Scott form the highest heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what hills peep over hills—what Alps on Alps arise !"

রঙ্গলাল ছিলেন মাইকেলের পরমবন্ধু। রঙ্গলালের কাব্য সম্বন্ধে মাইকেলের কি অভিমত ছিল, রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিত আর একখানি পত্র হইতে তাহা জানা যায়।

"My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve" এই পত্রেই তিনি বলিয়াছেন—I ought to hang my hat a peg or two higher than he ২।১ পেগ কেন বহু পেগ উঁচুতেই মাইকেলের হ্যাট বিরাজ করিতেছে। কিন্তু সব চেয়ে কৌতুকাবহ মাইকেলের মন্তব্য রঙ্গলালের রচনারীতির সম্বন্ধে। কাহার style বেশি affected ?

মাইকেলের মেঘনাদ বধ প্রকাশের আগে রঙ্গলালের পদ্মিনী প্রকাশিত হয়। প্রমীলা চরিত্রে Virgil এর Camilla ও Tasso র Clorinda এই দুইটি বিদেশী বীরাঙ্গনার চরিত্রের সঙ্গে স্বদেশী পদ্মিনী-চরিত্রেরও মিশ্রণ আছে বলিয়া মনে হয়।

কবির কর্ম্মদেবীর উপাখ্যানভাগ সুন্দর। রচনা-ভঙ্গী পদ্মিনী উপাখ্যানের মতই। মাইকেল যে আশা করিয়াছিলেন—রঙ্গলাল Improve করিবেন—তাহার লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় না। স্থলে স্থলে কবিত্বের মঞ্জরী আছে, কিন্তু কবি তাহাকে ফুটাইয়া তুলেন নাই। আসন্ন সমরের পূর্ব্বে দিবাবসানের বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য—

দিবা অবসান হয় নভোলোক তমোময়
ধূসরবরণা দিগঙ্গনা।
স্থির নেত্রে দেখা যায় শোভা পায় দীপপ্রায়
দুই এক তারা খ-ভূষণা।
যেন নায়িকার আশ প্রেমিকার হৃদাকাশে
দুই এক ভরসার ভাতি।
একবার একবার ভাব-পথে অবতার
হ'য়ে পুনঃ নিভায় সে বাতি।
তপনের তাপ হরে হিমকর হিমকরে
সুশীতল করিছে সকলে।
বহে স্নিগ্ধ সমীরণ দিনে ছিল হুতাশন,
সঙ্গগুণে দোষগুণ ফলে।

কবিগুরু বিহারীলাল

১

উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যলোকে বিহারীলাল একেবারে দলছাড়া, Like a star that dwelt apart, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উন্নতশীর্ষ একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বিহারীলাল হইতেই এ দেশে বর্তমান যুগে প্রকৃত গীতি কবিতার সূত্রপাত। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনও গীতিকবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি কোন-না-কোন বস্তুকে উপজীব্য করিয়া এবং জীবনের বহিরঙ্গকে আশ্রয় করিয়া। এ যুগের প্রকৃত গীতিকবিতা ভাবকে আশ্রয় করিয়া জীবনের অন্তরঙ্গের সংবাদ বহন করে। বিহারীলালের মধ্যে আমরা পাই সেই আত্মসমাহিত আত্মকেন্দ্রীয় বহির্নিরপেক্ষ ভাবমগ্নতা যাহা গীতি কবিতার প্রাণ স্বরূপ। হেমনবীন কবিতায় বহির্জগতের পরিচয় দিয়া তাহার সহিত আত্মানুভূতির যোগ সাধন করিয়াছেন, আর বিহারীলাল আত্মানুভূতির বহির্নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন। বিহারীলালের রচনা আত্মবিকাশ মাত্র—বহির্জগৎ তাহারা প্রেরণা দেয় নাই বা রসের উৎসমুখ খুলিয়া দেয় নাই—বাহিরের তাড়নায় তাঁহার কবি বুদ্ধিও সচেতন হয় নাই। কবি নিজের কবিমনটিকেই বহির্জগতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। আপন কাব্যে তিনি নিজের কবিমানস দিয়াই বহির্জগৎকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন।

ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয় তিনি তাহা অপেক্ষাও বড় কবি।' বিহারীলাল সম্বন্ধে ইহাই সার কথা। বিহারীলালের রচনা পড়িলে তাঁহার কবিমনটি যে কত বড় তাহা বুঝা যায়। তাঁহার কাব্যে তাঁহার কবিমনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয় নাই। কবি তাঁহার আত্মপ্রকাশের ভাষা যেন খুঁজিয়া পান নাই—রচনায় তাঁহার আত্মপ্রকাশের আকুলতাই ও অবরুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাসের অস্থিরতাই প্রকাশিত হইয়াছে। কবির ভাবকেন্দ্রিক পরিকল্পনা কাব্য গভীর অনুভূতি, অন্তর্গূঢ় রসাকূতি, পরিচিত ভাষায় রূপ লাভ করিতে পারে নাই। বিহারীলালের কাব্যলক্ষ্মী তাঁহার রচনায় গুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া রচনার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়াছেন, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে আমাদের চোখের সম্মুখে দাঁড়ান নাই। তাঁহার রচনার অন্তরালে যে বিরাট মানসটি ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া আছে তাহা এবং রচনায় তাহার যতটুকু প্রকাশলাভ করিয়াছে তাহা এক নহে। রবীন্দ্রনাথকে বিহারীলালের শিষ্য বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রসের প্রেরণা লাভ করিয়াছেন বিহারীলালের ভাবতন্ময় বিশ্বভোলা কবিমানসের কাছে, তাঁহার রচনার বহিরঙ্গ হইতে নয়।

ভাবতন্ময় কবির কাছে এই পৃথিবী কোন দিন পুরাতন হয় নাই, সৃষ্টি তাহার অপূর্ব্বতা হারায় নাই। যে চক্ষু সর্ব্বদা ভাবে নিমীলিত, সে চক্ষু বিশ্বের পানে সর্ব্বদা চাহিয়া থাকিবার অবসর পায় না—বহির্বিশ্ব মাঝে মাঝে তাহার চোখে পড়ে মাত্র। তাই কবি যখনই বিশ্বের পানে চাহিয়াছেন, তখনই তাহা তাঁহার কাছে অপূর্ব্ব, নবীন, রহস্যময় ও বিস্ময়ঘন বলিয়া

মনে হইয়াছে। রসাবেশে মুগ্ধ, ভাবাবেশে তরল, বিস্ময়ানন্দে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কবি এই সৃষ্টিকে দেখিয়াছেন। তাই এই সৃষ্টি ছিল তাঁহার চোখে চিররসমণ্ডিত, কখনও তাহার অপূর্ব্বতা হারায় নাই।

মাইকেল সকলের কবি—বিহারীলাল কবিদের কবি। রবীন্দ্রনাথ হইতে মোহিতলাল পর্য্যন্ত কবিরাই তাঁহার কাব্যের মর্ম্মরস গ্রহণ করিয়াছেন, সাধারণ পাঠক তাঁহার কাব্যের মর্য্যাদা বুঝে নাই। তাই বিহারীলালের কাব্য সাধারণের পরিচিত নয়।

কবির জীবদ্দশাতেও দুইএকজন কবি, রসজ্ঞ ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছাড়া কেহ বড় তাঁহার রচনার সন্ধান রাখিত না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক সমাজের দ্বারবর্ত্তী হইত না।"*

রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলিয়াছেন—

ভোরের পাখী ডাকেরে ঐ ভোরের পাখী ডাকে।
ভোর না হ'তে কেমন ক'রে ভোরের খবর রাখে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে রবির উদয়ে যে সুপ্রভাত হইল তাহার ভোরের পাখী এই বিহারীলাল। তাঁহার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন—

"যে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুস্পষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি একটা গভীর মমত্ববোধ দেখিতে পাই। এমনকি ইহাই রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই মমত্ববোধ প্রবোধনের একটা কারণ বাল্যে কবি প্রকৃতির রাজ্য হইতে বহুদূরে মহানগরীর বহুপ্রাচীরবেষ্টিত কক্ষে লালিত হইয়াছিলেন—প্রকৃতির সহিত ব্যবধানই প্রকৃতিকে কবির কাছে আকর্ষিকা করিয়া তুলিয়াছিল। কবি প্রকৃতির আহ্বান প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেন। কাব্যের মধ্য দিয়া এই আহ্বান তিনি প্রথম শুনিতে পান বিহারীলালের রচনা পড়িয়া। কবিগুরু নিজের কথায়

---

* রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে রসদৃষ্টির উন্মীলক বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় তাঁহার কাব্যগ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার সারদামঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে। বিহারীলালের কাব্য স্কুলকলেজে পড়ানো যে চলে না কর্তৃপক্ষ তাহা বোধহয় লক্ষ্য করেন নাই। যদি পাঠ্য রাখিতেই হয়, তাহা হইলে কোন কবিকে তাহার পাঠনার ভার দিতে হয়।

তাহাতেই বা কি লাভ হইবে? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "সারদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা অরসিক লোকের নিকট তালোরূপে প্রমাণ করা বড়ই কঠিন হইত। যে বলিত আমি বুঝিলাম না, আমাকে বুঝাইয়া দাও, তাহার নিকট হার মানিতে হইত।" রবীন্দ্রনাথকেই হার মানিতে হইয়াছে।

বলিয়াছেন—"বিহারী লালের বর্ণনা পাঠ করিয়া একটি বালক পাঠকের মন হুহু করিয়া উঠিত।" প্রকৃতির সহিত মিলনের আকুলতাকে যে সৃষ্টিতে সার্থক করিয়া তুলিতে পারা যায়—রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবিতা পড়িয়াই তাহা প্রথম উপলব্ধি করেন। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কতকগুলি শ্লোক তুলিয়া বলিয়াছেন এই সকল শ্লোকের মধ্য দিয়া "সমুদ্র পর্বত অরণ্যের আহ্বান বালক পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল।" অজানা, অচেনার জন্য, দূরের জন্য যে ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বহুস্থলে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে—সেই ব্যাকুলতার পরিচয়ও বালক রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বিহারীলালের কাব্যেই পান। কবিগুরু বলিয়াছেন—"যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস মনে হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

"যে সোনার কাঠির স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে"- সেই সোনার কাঠির স্পর্শ রবীন্দ্রনাথ প্রথম অনুভব করেন বিহারীলালের প্রকৃতি-বর্ণনায়।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের রচনাভঙ্গীর অনুসরণ করেন নাই। বিহারীলাল ছিলেন শুধুই কবি—রবীন্দ্রনাথ কবি ও শিল্পী। বিহারীলাল তাঁহার প্রাণের কথা নিরাবরণ নিরাভরণ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সতর্কতা ছিলনা, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাণের কথা সাজাইয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাকে সাজাইতে গুছাইতে পারেন নাই তাহাকে তিনি প্রকাশ দানই করেন নাই। তবে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের ভাষাকে কবিতার আদর্শ ভাষা বলিয়া মনে করিতেন এবং বিহারীলালের বিদ্যালয়েই তিনি কবিতার ভাষার প্রথম পাঠগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বর্ত্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বলা যায়না। কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ী ভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ। ছন্দে ও ভাষায় সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।"

মীনরাজ রোহিত যেমন গভীর জলে মগ্ন হইয়া থাকে, ক্বচিৎ কখনো তাহার অস্তিত্ব জলের উপর হিল্লোলিত হয়। বিহারীলাল তেমনি আপনার গভীর ভাবসাধনায় মগ্ন থাকিতেন, ক্বচিৎ কখনো সেই সাধনার আভাস ইঙ্গিত তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত হইত। তাঁহার রচনায় তাই তাঁহার ভাবানন্দের আভাস ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কবিরা ভাবলোকে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহাতে তাঁহারা তৃপ্ত হ'ন না। সেই আনন্দের অংশ সকলকে দিতে চাহেন। সৃষ্টিতে রূপদান করিয়া এই আনন্দ পরিবেষণ করিতে হয়। কবিদের কাছে সৃষ্টির আনন্দই ভাবমগ্নতার আনন্দের চেয়ে ঢের বেশী।

এই সৃষ্টির আনন্দই আত্মাভিব্যক্তি বা আত্মবিস্তারেরও আনন্দ। বিহারীলাল সাধারণ কবিদের মত ছিলেন না। তিনি ভাবলোকে আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহাতেই তদ্গত

হইয়া থাকিতেন—দশজনকে সে আনন্দ বিতরণের আকুলতা তাঁহার বিশেষ ছিল না, সৃষ্টির মধ্য দিয়া আত্মবিস্তারের প্রবৃত্তি তাঁহার প্রবল ছিল না। তবু যখনই তাঁহার ভাবানন্দ উথলাইয়া উঠিত—তখনই তাহা যেন স্বভাবতই একটা বাণীরূপ লাভ করিত। এই সৃষ্টির মূলে বাসনার দৃঢ়তা না থাকায় রচনা হইয়াছে কতকটা অপূর্ণ, অসম্যক্। কবি হিসাবে তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন পাঠক হিসাবে তাহা পরখ করিয়া দেখেন নাই। পাঠকদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি কখনও কিছু লেখেন নাই। তাই পাঠকের পক্ষে তাঁহার কবিতার রসগ্রহণ করা কঠিন। তবে যতটুকু আমরা পাই—তাহা হইতে বুঝিতে পারি কত বড় ভাবতন্ময় সাধকের অনবহিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত বাণী এইগুলি। বিহারীলাল সাধক কবি, কবি শিল্পী নহেন। সৃষ্টির আনন্দে তিনি মুগ্ধ করেন না, তিনি নবনব চিন্তার প্রেরণা দেন, দৃষ্টিকে করেন গহনাভিমুখী, দৃষ্টির ভঙ্গীই দেন পরিবর্ত্তিত করিয়া।

মিষ্টিক সাধকেরা অধিকাংশ সময় থাকেন ভাবে বিভোর, মাঝে মাঝে তাঁহাদের মুখে ভাষা ফুটে। সে ভাষায় কোন ঘটাছটা অলঙ্কার-পারিপাট্য কিছুই থাকে না। সে ভাষা বালকের মত—অয়ত্ন অসংবদ্ধ। কিন্তু যাহারা ভক্ত, যাহারা সাধনপথে কিছু দূর অগ্রসর, তাহারা সেই ভাষার অন্তরালে পান গূঢ় গভীরতত্ত্ব, তথ্য বা রস। বিহারীলালের রচনা ঐরূপ সাধকের বাণীর মত। তাই বলিয়াছি বিহারীলাল কবিদের কবি, সাধককবি।

শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার মূলে থাকে ভাববিহ্বলতা, গাঢ় অনুভূতি, গভীর প্রেম ও সৌন্দর্য্য-মুগ্ধতা। এইগুলিকে বাক্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ যিনি দিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। বিহারীলাল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুপরিচ্ছন্ন রূপ দান করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ তাঁহার বিহ্বলতায়, অনুভূতিতে ও মুগ্ধতায় শিল্পিজনোচিত সংযম-শৃঙ্খলা ছিল না। কিন্তু গীতিকাব্য রচনার মূল তথ্যটি তিনি কথিত বচন অপেক্ষা অকথিত বচনের দ্বারা, এমন কি অনেক সময় অক্ষমতার দ্বারাও শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনিই শিখাইয়া গিয়াছেন—ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু নেত্রে বিশ্বের দিকে চাহিতে না পারিলে কাব্যের জগৎটির সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনিই শিখাইয়া গিয়াছেন আপন মনের মাধুরী বিশ্বময় বিস্তার করিলেই এই সৃষ্টি মধুময় হইয়া উঠে। বিধাতার সৃষ্টি তখন হয় কবির নিজেরই সৃষ্টি, কবির মনের মাধুরী দিয়া পুনর্বিরচিত রূপে। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কবিকে বলিয়াছেন 'প্রজাপতি'। এই সত্যের দীক্ষা তিনি রবীন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন—তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের গুরুস্থানীয়, বঙ্গ-কাব্য-সাহিত্যে নব ধারার প্রবর্ত্তক। তিনি মহাকবি নহেন, তিনি কবিগুরু। তিনি যদি মীননাথ হ'ন, তবে রবীন্দ্রনাথ গোরক্ষনাথ।

বিহারীলালের কাব্যের বিশেষজ্ঞ সাহিত্যাচার্য্য মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন—"অত্যুগ্র কামনার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিও যেমন কাব্যের গৌরবহানি করে, তেমনই কামনাকে অতীন্দ্রিয়-লোকে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিছক সৌন্দর্য্যের সাধনাও মানুষের আত্মাকে আশ্বস্ত করে না। বরং বাস্তব হৃদয়-বেদনা যখন সুষমময় হইয়া উঠে তখন যে রসের উদ্রেক হয়, তাহাতে জীবনের সহিত, তথা নিজ গূঢ়তম সত্তার সহিত গভীরতর পরিচয়ের একটা আনন্দ আছে। কিন্তু

পূর্ব্বোক্ত সৌন্দর্য্যবাদের মূলে আছে কবির মনে প্রথমে একটা Principle of Beautyর স্বগত উপলব্ধি ; পরে, জগতের মধ্যে সেই আদর্শের অনুযায়ী সৌন্দর্য্যের উদ্ভাবনা ; অর্থাৎ, জগতের যেটুকু কবির সেই মানস-আদর্শের অনুগত সেইটুকুই স্বীকার করিয়া, অথবা বস্তুসকলের উপর যতদূর সম্ভব সেই সৌন্দর্য্য আরোপ করিয়া, তাহা হইতেই একটি সুসঙ্গত মনোজগৎ সৃষ্টি করা। কবি-মানসের এই প্রবৃত্তিই আধুনিক। বাংলা কাব্যে এই আধুনিক ভঙ্গি সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট দেখা দিয়াছে বিহারীলালের কবিতায়। কিন্তু বিহারীলালের কল্পনায় বাস্তব-প্রীতি ও অবাস্তব সৌন্দর্য্য-ধ্যান একটি অতি অভিনব যোগসূত্রে—যোগসাধনার মত—কাব্যসাধনায় নির্ব্বন্ধ হইতে চাহিয়াছে। আমি অতঃপর, সেই সূত্রটির সন্ধান করিয়া বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র সারদাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

বাংলা কাব্যে, বিশেষতঃ মাইকেল হেমচন্দ্রের যুগে, কবিমানসের এই ভঙ্গি যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর। একালে কাব্যের আদর্শ বিচলিত হইয়াছিল, প্রাচীন আদর্শকে বর্জ্জন না করিয়া উপায় ছিল না। কিন্তু য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণে যে নব-সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্যোগ চলিয়াছিল, তাহাতে অনুকরণসর্ব্বস্ব কবি-প্রতিভার প্রাণের ফাঁকি বিহারীলালের মত কবির পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছিল, কারণ, য়ুরোপীয় আদর্শের প্রভাবে একালের অধিকাংশ কবি একটা বাহিরের উত্তেজনা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার ফলে, কবিগণ আন্তরিকতা হারাইতেছিলেন, প্রকৃত ভাবানুভূতির পরিবর্ত্তে গুরুগম্ভীর বাক্যযোজনা ও কতকগুলি অতিসুলভ ভাবের উদ্দীপনাই তখন সকল কাব্যের প্রেরণা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিহারীলাল প্রথম হইতেই ইহার বিরোধী ছিলেন।

বাহিরের সকল প্রথার রীতি বা ফ্যাশন একেবারে বর্জ্জন করিয়া, বাহিরের প্রতিষ্ঠা, নিন্দাপ্রশংসা, অগ্রাহ্য করিয়া বিহারীলাল আপনার প্রাণকেই প্রামাণ্য করিয়া নিজের সঙ্গে নিজেই নিভৃতে আলাপ করিতে বসিলেন, কাব্যের—কি দেশী কি বিদেশী—বাহিরের কোন আদর্শ গ্রাহ্য করিলেন না।

অতি সহজ ও অতি সাধারণ জীবনযাত্রার পথে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন ও প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, তাহাই হইল তাঁহার কাব্যসাধনার দীক্ষা-মন্ত্র। তিনি কবিতার কোনও আদর্শ চিন্তা করেন নাই ; কবির লক্ষ্য বা কাব্যরচনার কলা-কৌশল সম্বন্ধেও তিনি কোনও বিশেষ ধারণার ধার ধারিতেন না। ধর্ম্মনীতি বা দর্শনের কোনও তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ের স্বধর্মকে বিচলিত করে নাই। মানুষের সঙ্গে নানা সম্পর্কে তিনি যে তৃপ্তি পাইতেন, সরল স্বার্থহীন অকপট প্রীতির পরিচয়ে তাঁহার প্রাণে মনুষ্যজীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে পুলক-রোমাঞ্চ ও বিস্ময় বোধ হইত, তাহাতেই তিনি একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন প্রীতির যে অপূর্ব্ব পুলক—অতিশয় সরল স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে রসমাধুরী—মানুষের প্রতি মানুষের অতিশয় সহজ কল্পনালেশহীন ভালোবাসার আবেগে নানা ভঙ্গিতে উৎসারিত হয়, তাহার মধ্যেই জগৎ-রহস্য নিহিত আছে। কোন সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য নয় যাহা এই প্রীতির রসে সিঞ্চিত নয়—কারণ, মানুষ যদি ভাল না বাসে, তবে সৌন্দর্য্য যেমন হউক,

তাহাকে উপলব্ধি করিবে কোন্ বুদ্ধির দ্বারা? প্রাণ যদি না জাগে তবে চোখে সেই দৃষ্টি আসিবে কোথা হইতে? এই প্রীতিমন্ত্রের সাধনায় বিহারীলাল যে সৌন্দর্য্যের আদর্শ সন্ধান করিয়াছিলেন তাহাতে বাহিরের রূপ বা বিশ্বপ্রকৃতির শোভা, ও অন্তরের অনুভূতি—বাস্তব ও কল্পনা, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও হৃদয়বৃত্তি—একই রসচেতনায় নির্ব্বিরোধ নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বে আমি সৌন্দর্য্যবাদের দুইদিক আলোচনা করিয়াছি, একটিতে মানুষের কামনাকে, রক্তমাংসের সংস্কারকে দেহ ও মনের ক্ষুধাকেই সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠাভূমি করিয়াছে—বিষপুষ্পের গন্ধ-মাধুরীর মত মানুষের প্রাণে সে একটি সান্ত্বনাহীন তীব্র উৎকণ্ঠার উদ্রেক করে, অপরটিতে মানুষের কামনা বা রক্তমাংসের বিক্ষোভকে অস্বীকার করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-বিলাসে পরিণত করিয়া, কামের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া তাহাকে হৃদয়হীন রূপ-মোহে পরিণত করিয়া মানুষের সত্যকার সুখদুঃখকে আর্টের বিষয়ীভূত করিয়া নিশ্চিন্ত আনন্দবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, এই দুয়ের মধ্যে একই তত্ত্বের প্ররোচনা রহিয়াছে—সে তত্ত্বটি কাম। একটিতে কামের পূর্ণপ্রভাবে আত্মসমর্পণ, অপরটিতে কামকে স্তিমিত বা আবৃত করিয়া রক্তমাংসের ক্ষেত্র হইতে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া কল্পনা-বিলাসের দর্পণে তাহার তাপহীন শিখাটিকে চিত্রবৎ প্রতিফলিত করিয়া নিশ্চিন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ। কামই উভয়বিধ সৌন্দর্য্যের আদি প্রেরণা—

> যে আনন্দ-কিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
> অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
> দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
> এক মুহূর্ত্তের মাঝে—

সেও এই কামেরই প্রেরণা। কিন্তু এই দুই ধরণের সৌন্দর্য্যবাদের কোনটিতেই সৃষ্টির পূর্ণসত্যের অভিজ্ঞান নাই। তার একমাত্র প্রমাণ, ইহার কোনটিতেই মানুষের মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হয় না। সৌন্দর্য্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে কামনার আত্যন্তিক অভাব নাই, আবার কামনার উৎকট অভিব্যক্তিও নাই। বিহারীলাল যে সৌন্দর্য্যরূপিণীর ধ্যানে শেষে সর্ব্বদুঃখ ভুলিয়াছেন—সে সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও প্রাণের পিপাসা একই, এই পিপাসা ইন্দ্রিয় ভোগাকাঙ্ক্ষার জ্বালা নয়, আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ার যে সুখ, সেই সুখের পিপাসা।

আবার, সেই পিপাসা আছে বলিয়াই তিনি Artistic Monasticism-এর পক্ষপাতী নহেন। অতএব আধুনিক গীতি-কবিগণ সৃষ্টির অন্তরালে যে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর সন্ধানে নিজ নিজ ভাব-কল্পনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন, আপনার অন্তরে বিশ্বজগৎকে প্রতিফলিত করিয়া যে আদি-রহস্যের ভাবনায় বিভোর হইয়াছেন—সৌন্দর্য্যকে একটি পরম তত্ত্বরূপে উপলব্ধি করিয়া তাহারই অখণ্ড অনুভূতিকে সত্য-দর্শনের সহায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন—আধুনিক কাব্যের সেই কল্পনা, কবি-মানসের Subjectivity, কেমন করিয়া বিহারীলালে ফুটিয়া উঠিয়াছে,

তাহাই দেখিতে হইবে। কিন্তু এই প্রেম হইতেই সেই সৌন্দর্য্যের কল্পনা—যে সৌন্দর্য্য বিশ্ববিকাশিনী—যে সৌন্দর্য্য বাস্তব প্রত্যক্ষের মধ্যেই অতিশয় বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণমহিমায় অধিষ্ঠান করিতেছে,—বিহারীলালের কল্পনায় প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সেই অদ্বৈতসিদ্ধি বুঝিয়া লইবার কোনও যুক্তি-পন্থা নাই; কবি তাহা নিজেও বুঝাইতে গিয়া বুঝাইতে পারেন নাই—কেবল সেই ভাবাবস্থাটি তিনি তাঁহার 'সারদা মঙ্গল' কাব্যে, ভিতরে যেমন বাহিরেও তেমনই ভাবে ধরিয়াছেন; এবং 'সাধের আসন' নামক কাব্যে ইহাই একটু ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইহাকে আরও অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন।" (মোহিত পাল)

২

বিহারীলাল যে সময়ে কাব্যরচনা করেন—তখন বাংলার কবিরা ইউরোপ হইতে নানা কাহিনী, ভাবধারা, উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কাব্য রচনায় ব্যস্ত। তাঁহারা ভারতের অতীত ইতিহাসও পুরাণ সাহিত্য হইতেও নানা রসবস্তু সংগ্রহ করিয়া নবনব কাব্য সৃষ্টি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কাব্যরচনার মূলে কবিযশোলাভ। সে জন্য তাঁহাদের অধ্যবসায় ও শ্রমস্বীকারের অন্ত ছিল না। তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল বাহিরের দিকে, ভিতরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার অবসর তাঁহাদের ছিলনা। এই সময়ে বিহারীলাল অতি নিভৃতে নির্জ্জনে বসিয়া প্রেমাঞ্জনলিপ্ত চোখে এই বিশ্বের পানে চাহিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন এবং এই বহির্জগৎকে আপন মনের মাধুরী দিয়া নূতন করিয়া গড়িতেছিলেন। তাহার ফলে, এই বহির্জগৎই তাঁহার মনোজগতে পরিণত হইল। বিহারীলাল কবিত্বের প্রেরণা পাইলেন ভিতর হইতে। সেই অনুকৃতির যুগে একমাত্র তাঁহারই সাধনা ছিল আবিষ্কৃতি। তিনি এই বাস্তব জগতের উপাদানের উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহার মনোভাণ্ডার হইতে কাব্যের সর্ব্ববিধ উপাদান লাভ করিলেন। তাঁহার সামসময়িক কবিরা যখন পাঠকদের মুখ পানে চাহিয়া তাহাদেরই প্রীতিকর কাব্যবস্তুর সৃষ্টি করিতেছিলেন—তখন তিনি পাঠকদের কথা একেবারে না ভাবিয়া কেবল নিজের আনন্দের জন্য মর্ম্মের অন্তস্তলে অনুভূত ভাবগুলিকে নিরলঙ্কার অথচ ললিত ভাষায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে কবিতায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আবিষ্কার করিলেন প্রাকৃত বস্তুজগতের চেয়ে তাঁহার ভাবজগৎ ঢের বড়, ঢের গহন, ঢের জটিল। এই জগতে কাব্যে রূপ দিবার বস্তু এত অধিক যে দশশতবর্ষেও তাহা ফুরায় না। কবি যেন রসবস্তুর প্রাচুর্য্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, কি দান করিবেন, কি দান করিবেন না, স্থির করিতে না পারিয়া বেশি কিছু দিতে পারিলেন না। কিন্তু অগাধ সম্পদের সন্ধান দিয়া তিনি হইলেন যুগপ্রবর্ত্তক। আজ বাংলার কবিরা কেহই মধু নবীন হেমের অনুসরণ করে না। প্রকারান্তরে তাঁহারই অনুসরণ করে। প্রেমাঞ্জন-লিপ্ত নয়নে চাহিলে বিশ্বপ্রকৃতি যে কত মমতার বস্তু হইয়া উঠে—তাহা তিনিই প্রথম বালক রবীন্দ্রনাথকে শিখাইয়াছিলেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ শেলি, কীট্স্ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পড়েন নাই। অতএব এই দৃষ্টিভঙ্গীই বাংলা কাব্যসাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

কবির রসপিপাসা ছিল অত্যন্ত অধিক, বাহিরের প্রেমপ্রীতি ভালবাসার অল্পতায় যেন তাঁহার তৃপ্তি হইল না। প্রেমের তৃপ্তির জন্য তিনি ভূমার সন্ধান করিলেন তাঁহার মনোলোকে। মনোলোকের বিন্দুবিন্দু প্রেম ও বিশ্বপ্রকৃতির বিন্দুবিন্দু সৌন্দর্য্যের মিলনে তিনি গড়িলেন এক তিলোত্তমা। এই তিলোত্তমাই সারদা। এই সারদাকে ভালবাসিয়াই তাঁহার রসপিপাসার তৃপ্তি হইল। এই সারদাই—'সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী মানস সরস-বিকচনলিনী।' এই সারদাই যুগযুগান্তরের তপের ফল, কবির ধ্যানের ধন। ইহাকেই কবি বিশ্বময় দেখিয়াছেন।

দৈহিক ক্ষুধা ও পিপাসা মানুষকে প্রণোদিত করিয়াছে নবনব ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টিতে, আর সৌন্দর্য্যপিপাসা কবিকে প্রণোদিত করে কাব্যসৃষ্টিতে। দৈহিক ক্ষুৎপিপাসার অন্ত আছে। সৌন্দর্য্যপিপাসার অন্ত নাই। অন্ত নাই বলিয়াই কবির অন্তরে অতৃপ্তিরও অন্ত নাই। কবি চারিপাশের জগতে নিত্যদৃষ্ট বস্তুতে, চিরপরিচিতের মধ্যে, প্রাকৃত প্রেমপ্রীতিভালোবাসায়, সচরাচর জীবনযাত্রায় তৃপ্ত হন না। তাঁহার মন তাই নিকট হইতে দূর, চেনা হইতে অচেনা, বাস্তব হইতে কল্পনা, লৌকিক জগৎ হইতে অলৌকিক জগতে, বহির্জগৎ হইতে মনোজগতের দিকে সর্ব্বদাই ধাবিত হয় সৌন্দর্য্যপিপাসা মিটাইতে, রসপিপাসার তৃপ্তিসাধনের জন্য। ইহাই রোমান্টিক গীতিকবিদের চিরন্তন ধর্ম। তাঁহারা সাময়িক তৃপ্তির গানও মাঝে মাঝে গাহেন—কিন্তু চিরন্তন অতৃপ্তিই তাঁহাদের কল কণ্ঠকে ঝঙ্কৃত করিয়া দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয়। কবিগুরু বলিয়াছেন—এই কবিদের প্রকৃতিতে একটা খাঁচার পাখী ও একটা বনের পাখী আছে—"এই বনের পাখীটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে এবং বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।" বিহারীলাল বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম রোমান্টিক গীতি-কবি। তাঁহার রচনায় ঐ অতৃপ্তির সুর—তৃপ্তিসন্ধানে অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা (yearning) ঐ সুর ধ্বনিত হইতেছে। অন্য কথায় এই সুরই বিহারীলালের কাব্যে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

রোমান্টিক গীতিকবিরা তৃপ্তির সন্ধান করিয়াছেন নানারূপে। কেহ এই 'দুঃখালয়ং অশাশ্বতম্' জগৎ হইতে দূরবর্ত্তী কোন কল্পলোকের কল্পনা করিয়াছেন—কেহ Millenium-এর স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কেহ অনন্তের উদ্দেশে মানসযাত্রা করিয়াছেন, কেহ নিজের মনে ভাবজগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেহ নিজেকে বিশ্বমানবের সহিত একাত্মীভূত করিয়াছেন—কেহ 'আপন মনের মাধুরী দিয়া' এই জরাজীর্ণ চিরপরিচিত জগৎকেই নূতন করিয়া গড়িয়াছেন—এই বাস্তব জগৎকেই Idealise করিয়াছেন। বিহারীলালের কবিতায় রোমান্টিক কবিদের এই ধর্ম্মেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি এই বহির্জগৎকে উপেক্ষা করেন নাই—ইহাকে তিনি নিজের প্রাণের প্রেম, মাধুরী ও সৌন্দর্য্য দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার মনোজগৎ। তিনি এই মনোজগতেই তৃপ্তির সন্ধান করিয়াছেন।

বিহারীলালের কাব্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কবি মোহিতলাল বলিয়াছেন—"মাইকেল যেমন কাব্যে নব নব রূপসন্ধান করিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভাকে বিচিত্র বৃহত্তর কাব্যসৃষ্টির কারুকলায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিহারীলাল তেমনি কাব্য ও কবিমানসের এমন একটা নিগূঢ় সম্বন্ধের

ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, অতঃপর বাংলা কাব্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাবকল্পনার লীলা চলিয়াছে। কবিগণ জগৎ ও জীবনকে নিজেদের মানসদর্পণে প্রতিফলিত করিয়া বাংলার কাব্যকাননকে একটি অপূর্ব সুরমূর্চ্ছনায় প্লাবিত করিয়াছেন। কাব্যে আত্মভাবসাধনার এই ভঙ্গী বিহারীলাল হইতেই আরম্ভ।

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মী শুধু একা একাকিনী নহেন, জগতের মাঝেও তিনি বিচিত্ররূপিণী। বিহারীলালের একনিষ্ঠ কবিহৃদয় এই বিচিত্ররূপিণীর প্রতি তেমন আকৃষ্ট হন নাই, তিনি তাঁহার অন্তরবাসিনী হইয়াই আছেন। বিহারীলাল এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী, রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মন ও প্রাণ এই দুইএর দ্বন্দ্বে তিনি মনকেই প্রশ্রয় দিলেও সর্বত্র প্রাণের একটি সূক্ষ্ম আবরণ রক্ষা করিয়াছেন, বিহারীলাল মনকে বড় একটা আমল না দিয়া প্রাণকেই প্রতারণা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসার' তত্ত্ব কতটা এখানে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।" [মোহিত লাল।]

সারদামঙ্গলকে একখানি অখণ্ডকাব্যরূপে বিচার করিতে গেলে অসামঞ্জস্য ও অসংলগ্নতার জন্য রসবিচারে বাধা জন্মিবে। সারদামঙ্গল কতকগুলি গীতি-কবিতার সংকলন। কেবল কবির মনোলোকের অধিষ্ঠাত্রী সারদার চরণকমলের মৃণালসূত্রই কবিতাগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়াছে। সারদামঙ্গলের কবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে গেলে বিশেষ সুবিধা হইবে না—কবিতাগুলির প্রবুদ্ধ উপভোগ ও অপ্রবুদ্ধ উপভোগের আলোছায়ার মধ্য দিয়া যে একটা আবেদনের সুর ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহাই রসিকচিত্তকে মুগ্ধ করে। ভাবপরম্পরার মধ্যে এমন একটা ধ্রুব রূপের আশ্রয় পাওয়া যায় না যাহাকে অবলম্বন করিয়া একটা কলাশৃঙ্খলা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন—

"সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ী ভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্য-স্বর্গ হইতে একটি পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।"

কবির ব্যাকুলতাই আমাদেরও ব্যাকুল করে। প্রকাশের দুর্ব্বলতা, ভাষার অপরিচ্ছন্নতা, ভাবের অস্পষ্টতাও এই ব্যাকুলতারই অঙ্গ মনে করিতে হইবে।

কবির সারদা ভাব হইতে রূপে যাতায়াত করেন—যখন তিনি রূপময়ী তখন তিনি সরস্বতী—যখন তিনি ভাবময়ী কবির মনোলোকে তখন তিনি সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী—বিশ্বজগতে তিনি সুষমায়—মানবজগতে করুণা, স্নেহে প্রেমে বিরাজ করিতেছেন। যেখানেই ভাব ঘনীভূত হইয়াছে সেখানেই তিনি রূপ ধরিয়াছেন। ক্রৌঞ্চমিথুনের ব্যথায় কাতর বাল্মীকির অন্তরে করুণা যেমন ঘনীভূত হইয়াছে, অমনি তিনি মূর্ত্তি ধরিয়াছেন।

কবি ভাবময়ী সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে শরীরিণী রূপে পাইতে চাহেন। এজন্য তাঁহার ব্যাকুলতার অবধি নাই। কিন্তু যোগী তাঁহাকে যে ধ্যানযোগে, তপস্বী তাহাকে যে বহু তপে মূর্ত্তিমতীরূপে লাভ করে, কবির যে যোগ, যে তপ কই? সেজন্য কবির ক্ষোভের অন্ত নাই।

এই সারদা ব্রহ্মার মানসসরোবরে স্বর্ণপদ্মের উপর দণ্ডায়মানা। বাল্মীকির তপোবনে

তিনি বীণাবাদিনী—আর কবির কাছে তিনি বিশ্বব্যাপিনী। মূর্ত্তিমতী সারদার শতসহস্র প্রতিবিম্বে এই বিশ্বজগৎ পরিপূর্ণ—কবি এই প্রতিবিম্ব দেখিয়া তৃপ্ত নহেন, তিনি মূর্ত্তিমতী ভাবে দেখিতে চাহেন—কেবল দেখিতে নয়—তাঁহাকে পাইতে চাহেন।

কবি সারদাকে মূর্ত্তিমতী রূপে না পাইয়া তাঁহার ভাবময়ী হলাদিনী রূপের সঙ্গেই প্রেম-লীলায় তন্ময় হইলেন। আত্মভাবসর্ব্বস্ব কবির কাছে objective realityর মূল্যই বা কি? তিনি এই ভাববিগ্রহের সহিত প্রেমলীলায় যেন গভীরতর সুখদুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। কবির এই Subjectivity রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, মানসী, মানসসুন্দরী, লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেমলীলা এই Subjectivityর অভিব্যক্তি।

বৈষ্ণব কবি বলিবেন—হ্লাদিনী শক্তিকে রূপ দান না করিলে কি প্রেমসম্ভোগ সম্ভব? বাস্তব সত্তা ছাড়া কি রস জমিতে পারে? সাধে কি বৃন্দাবনলীলা-কল্পনার প্রয়োজন হইয়াছে?

কবির মনেও এ দ্বিধা জন্মিয়াছে—কিন্তু অন্তরে রসের ও তৃপ্তির সন্ধান পাইয়া ভাবময়ীর সহিত প্রেমলীলাকে তাঁহার মিথ্যা বলিয়া মনে হয় নাই।

তবে কি সকলি ভুল? নাই কি প্রেমের মূল?
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনা-লতার?
মন কেন রসে ভাসে প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার?
শত শত নরনারী দাঁড়ায়েছে সারি সারি
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি?
হেরে হারা নিধি পায় না হেরিলে প্রাণ যায়,
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি।

শেষ পর্য্যন্ত সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জয় করিয়া ভাবলোকে সারদার সঙ্গে মিলিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

দীর্ঘ বিরহের পর হিমাদ্রিশিখরে ভাব-সম্মেলনের একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া কবি সারদামঙ্গলের পদাবলী শেষ করিয়াছেন।

স্বর্ণলতা

স্বর্ণলতা বঙ্কিমযুগের একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। লেখক ডাঃ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই একখানি মাত্র পুস্তকের দ্বারাই সাহিত্যিক খ্যাতি এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছেন। স্বর্ণলতা Romance নয়, ইহাতে কোন কবিত্বের সুরও নাই। ইহা নিছক অবিমিশ্র বড় গল্পের পুস্তক। অবিমিশ্র কথাসাহিত্য বলিলে যাহা বুঝায় ইহা তাহাই। গল্পাংশই (Story-element) ইহার প্রধান সম্পদ। স্বর্ণলতায় গল্প-বলার ঢঙটি বেশ চিত্তাকর্ষক। উত্তরকালে প্রভাতকুমার এই ঢঙটির অনুসরণ করিয়াছিলেন। লেখক যেভাবে প্রমদা-চরিত্রটিকে গোড়ার দিকে ফুটাইয়াছেন—তাহাতে শরৎচন্দ্রের চরিত্রাখ্যান-কলার পূর্ব্বাভাস ইহাতে পাওয়া যায়। ভাষাবিন্যাসে, বিবৃতি-সংযমে ও রচনাশৈলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুস্মৃতি বলিয়া মনে হয়। স্থানে স্থানে যে রঙ্গরসিকতা বা ব্যঙ্গকৌতুকের অবতারণা আছে তাহা বঙ্কিমযুগেরই উপযোগী। সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌএর কথাও স্মরণ করায়।

স্বর্ণলতা একখানি সামাজিক উপন্যাস। বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুপরিবারের একটি জীবনচিত্র ইহাতে পাওয়া যায়। এই চিত্রটিকে বেশ স্বভাবসঙ্গত ভাবেই অঙ্কিত করা হইয়াছে। অল্পশিক্ষিত পুরুষ ও অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের চরিত্র লইয়া উপন্যাসখানি রচিত। সুশিক্ষার অভাবে নরনারী—কত হীন ইতর জঘন্য প্রকৃতির জীব হইয়া উঠে এবং সুবুদ্ধির অভাবে তাহাদের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হয়, তাহা একদিকে দেখানো হইয়াছে। অন্যদিকে দেখানো হইয়াছে—উপার্জ্জনক্ষম ও সংসারযাত্রানির্ব্বাহের উপযুক্ত না হইয়া বিবাহ করিয়া অশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কিরূপ দুঃখ পায় ও দুঃখ দেয় এবং শেষ পর্য্যন্ত সংসারে কিরূপ ট্র্যাজেডি ঘটায়।

সুশিক্ষা বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিলে লোকের চরিত্র, রুচি, প্রকৃতি ও আদর্শ কত মার্জ্জিত ও উচ্চ হয় এবং সভ্যসমাজের উপযুক্ত সম্মানজনক স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার সহায়ক হয় তাহাও এইসঙ্গে দেখানো হইয়াছে।

এই উপন্যাসে আর একটি সত্যের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা চরিত্রবলের সহিত জাতি, কুল, বংশ ইত্যাদির কোন সম্পর্ক নাই। একথা বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত। এই সত্য প্রচারে এখন আর সাহসের অভাব বা দ্বিধা দেখা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের আগেই বিনা কৈফিয়তেই লেখক অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে এই সত্যকে প্রচার করিয়াছেন। কুলীন ব্রাহ্মণ শশিভূষণ অতিশয় হীনচেতা, শঠ ও বিশ্বাস-ঘাতক, তাহার পত্নীও রীতিমত পিশাচী। কুলীন ব্রাহ্মণ হরিদাস ধূর্ত্ত ও হীনচরিত্র। বহু ব্রাহ্মণের গুরু শশাঙ্কশেখর একটি নররাক্ষস। ইহাদের তুলনায় চাষার ছেলে নীলকমলটাও মানুষ। আর নীচজাতীয়া দাসী শ্যামার-ত কথাই নাই। তাহার চরণে সকলেরই মস্তক অবনত হয়

উপন্যাসখানিতে মোটামুটি ঘটনা, আচরণ ও বাগ্‌বিন্যাসের যথাযথতা রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখা যায়। তবে দুই এক স্থলে স্বাভাবিকতার গণ্ডী অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শশাঙ্কশেখর যেভাবে শিশু-কন্যাকে বন্দিনী করিয়া জোর করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। আর আইনআদালত সম্বন্ধে ব্যাপারগুলোতেও একটু যথাযথতার অভাব আছে মনে হয়। অত্যুক্তির দ্বারাও যথাযথ ক্রম কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যাহারা ইংরাজী পড়িতেছে তাহাদের কে কতদূর পড়িয়া—কে কি পাশ করিল এবং কি কাজকর্ম করিল তাহা বলা হয় নাই। পাপের স্বাভাবিক পরিণাম প্রায়শ্চিত্ত—পাপের সহিত নির্বুদ্ধিতার যোগ হইলে দণ্ড অনিবার্য—ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শশিভূষণ, প্রমদা, রমেশ, গদাধবচন্দ্রের দণ্ড সেই ভাবেই আসিয়াছে। দৈব ঘটনার সাহায্যে পাপের দণ্ড বিধান কলাসম্মত নয়। দৈবদুর্ঘটনার দ্বারাও পাপীর দণ্ডও যে হয় না তাহা নয়, তবে তাহা কথাসাহিত্যে যতদূর সম্ভব বর্জনীয়। এই হিসাবে প্রমদার নৌকাডুবি ও শশাঙ্কের অগ্নিসমাধি আমাদের ন্যায়তৃষ্ণা (Sense of justice) মিটাইলেও, রসতৃষ্ণা মিটায় না। তবু বলিতে হয়, বর্ণনাগুণে এই দুইটি দৈবঘটনা—উপন্যাসের সুরসৌষম্য ও কলাসামঞ্জস্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে নাই।

উপন্যাসে একটি উইলের অবতারণা আছে—এই উইলটি গল্পের প্লটটিকে বেশ একটু বৈচিত্র্য দিয়াছে। স্বর্ণলতা চরিত্রটি এই উইল অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়াছে। স্বর্ণলতার প্রণয়চিত্রে ও তেজস্বিতায় পরবর্তী কথাসাহিত্যের নারীচরিত্রের একটা পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

মূল আখ্যানবস্তুর সহিত নীলকমলের সম্পর্ক নাই। উপন্যাসে একটা কৌতুকরসের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য নীলকমলের অবতারণা হইয়াছে। 'গদাধরচন্দ্র' যেটুকু কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা প্রথম শ্রেণীর না হইলেও উপভোগ্য।

এই উপন্যাসের প্রধান গুণ—সর্ব বিষয়ে একটা সংযমের বন্ধন। কোন ব্যাপার লইয়া কোথাও আতিশয্য দেখা যায় না। কোথাও অতিরিক্ত রঙ চড়ানো হয় নাই। দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ লইয়াও বাড়াবাড়ি করা হয় নাই। কারণ, এক হাতে ত তালি বাজে না।

এক পক্ষে প্রমদা, অন্য পক্ষে সরলা। সরলার মুখে কথা নাই—সে মূর্তিমতী সহিষ্ণুতা। অপর পক্ষ হইতে দাসী শ্যামা, অসহ্য হইলে উত্তর-প্রত্যুত্তর দিয়াছে—কিন্তু সর্বদাই সরলা তাহার রাশ টানিয়া রাখিয়াছে। কাজেই ঝগড়া বিবাদ লইয়াও একটা আতিশয্য সৃষ্টি হয় নাই। শরৎচন্দ্রের মেজদিদি গল্পের হেমাঙ্গিনী ও কাদম্বিনীর দ্বন্দ্বের কথাটা এখানে মনে পড়ে।

সমগ্র উপন্যাসখানিতে—হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সর্বপ্রকার অনাচার, হৃদয়হীনতা, কুসংস্কার ও অশিক্ষাজনিত কুরুচি ও কুপ্রবৃত্তি, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ ও পাশবিকতার চিত্র অকুণ্ঠিত, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। অধিকাংশ চিত্রই যথাযথ। সেকালের জমিদার, পুলিশকর্মচারী, পাণ্ডাপূজারী, গুরু, জমিদারের কর্মচারী ইত্যাদির চরিত্র যথাযথ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। সর্বত্রই একটা সংস্কারস্পৃহার ইঙ্গিত

আছে। পাশাপাশি মহত্ত্ব ও উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যত্বের চিত্রের সমাবেশ করিয়া লেখক উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের যথার্থ রূপকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রারম্ভ হইতেই রস ধারার পাশাপাশি একটি উচ্চ নৈতিক আদর্শের ধারা শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রমদা।* নীচসংসর্গে লালিতা দরিদ্রকন্যা প্রমদা স্বভাবতই হীন ও স্বার্থপর। যে পরিবারে তাহার জন্ম—সেই পরিবারের আবহাওয়াও এজন্য কতকটা দায়ী। বাল্যাবধি সে কোন সৎশিক্ষা পায় নাই। "দ্বেষ হিংসা প্রভুত্ব-প্রিয়তা ইত্যাদি দোষ প্রমদার পিতা রামদেব চক্রবর্তীর বংশানুক্রমিক। তাঁহার বংশের কন্যা যে বাড়ীতে গিয়াছে সে বাড়ী কলহের জন্মাসন হইয়াছে।" তারপর যে স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল—তাহারও শিক্ষা, দীক্ষা ও চরিত্রবল ছিল না। শশিভূষণের অতিরিক্ত স্ত্রৈণতা প্রমদার চরিত্রকে আরো হীনতর করিয়াছিল। স্বামীর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে সে অন্নের ভাগ দিতে চায় না—তাহাদের একমাত্র পুত্রকেও সে একটুও স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারে না।

গোপাল তাহার সহপাঠী ভুবনের মায়ের কাছে যে স্নেহ পাইল তাহার এক কণাও সে তাহার জ্যাঠাইমার কাছে পায় নাই।

প্রমদা দেবর ও দেবর-বধূকে তাড়াইয়া দিয়া নিজের মা ও ভাইকে লইয়া আসিল! শশিভূষণ কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। এই ব্যাপারে শশিভূষণ যতটা দোষী—প্রমদাকে ততটা দোষী করা যায় না। স্ত্রী প্রখরা মুখরা ও আত্মাভিমানিনী হইয়া উঠিলে স্ত্রৈণ স্বামী যে কত নিরুপায়, কত অসহায়, তাহা ইহাতে দেখানো হইয়াছে। প্রমদার সুবুদ্ধি একেবারেই ছিল না, ছিল অসামান্য দুর্বুদ্ধি। তাহার দুর্বুদ্ধিতেই গদাধরেরও অশেষ দুর্গতি—স্বামীরও দুর্গতি—নিজেরও শোচনীয় পরিণাম। প্রমদা স্বামিপুত্রেরও কল্যাণ চায় নাই। স্বামীকে জেল হইতে রক্ষা করিবার যেটুকু উপায় তাহার হাতে ছিল—সেটুকুর সুবিধাও সে দেয় নাই। নারী হইয়া সে পিশাচী—কারণ, নারীত্বের কোন সৌকুমার্য্য তাহার চরিত্রে ছিল না। রামায়ণে যে কৈকেয়ী পিশাচী রূপে চিত্রিত, সেও অতিরিক্ত সন্তান-বাৎসল্যের জন্য কুপন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রমদার চরিত্রে নারীত্বের সে সম্পদ্ টুকুও ছিল না।

বুদ্ধি অনেক সময় কুপ্রবৃত্তিকে শাণিত করে সত্য, কিন্তু আবার অনেক সময় কুপ্রবৃত্তি দমনে ও সৎপ্রবৃত্তির উদ্বোধনে সহায়তাও করে, অন্ততঃ কুপ্রবৃত্তির শোচনীয় পরিণাম হইতে

---

* যে চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসের মর্মগত সত্যটি বিকশিত হয় সেই চরিত্রই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। লেডি ম্যাকবেথ যে হিসাবে ম্যাকবেথ নাটকের প্রধান চরিত্র, প্রমদা সেই হিসাবে স্বর্ণলতার প্রধান চরিত্র। আর্টের দিক হইতে সেই চরিত্রই সুরচিত, সৎ হউক অসৎ হউক, যে চরিত্রে স্বাভাবিকতা, মানবিকতার বৈচিত্র্য, পূর্বাপর-সামঞ্জস্য ও সজীবতা থাকে। সে হিসাবে প্রমদা চরিত্র সুরচিত কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। প্রমদা চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে আমরা এইটুকু পাই যে চরিত্রের অবক্ষয়তার জন্য সে নিজেই সম্পূর্ণ দায়ী নয়। এইরূপ চরিত্র যখন নিজের বিষে নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়—তখন আমাদের হৃদয়স্থ সুবিচারবোধ পরিতৃপ্তি লাভ করে, আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে উপনীত তাহার শোচনীয় পরিণাম আমাদের দরদী চিত্তকেও স্পর্শ করে।

মানুষকে রক্ষা করে। প্রমদার সামান্য বুদ্ধি যেটুকু ছিল—তাহা কুপ্রবৃত্তিকেই সহায়তা করিয়াছিল। এই আত্মাভিমানিনী, কলহপ্রিয়া, হৃদয়হীনা, স্বার্থান্বেষিণী, দুষ্টবুদ্ধি নারীর প্রতি পাঠকের কোন সহানুভূতি জন্মিতে পারে না। তাহার শোচনীয় পরিণামের জন্য পাঠক একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেলিবে না। বরং পাঠকের স্বাভাবিক ন্যায়তৃষ্ণা আরো গুরুতর দণ্ডেরই প্রত্যাশা করিয়াছিল।

এখন কথা হইতেছে, এইরূপ চরিত্র স্বাভাবিক কিনা। এ দেশের অল্প শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সম্বন্ধে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তিনি বলিবেন—এইরূপ চরিত্র অস্বাভাবিক নয়। এইরূপ চরিত্রের নারী এ সমাজে আজিও বর্তমান আছে। দুর্বুদ্ধির সহিত কুশিক্ষার মিলন হইলে এইরূপ চরিত্রই গড়িয়া উঠে। একেবারে কোন শাসন, সংস্কার বা শোধনের ব্যবস্থা না থাকিলে এবং কোন আঘাত লাভ না করিলে এইরূপ চরিত্র আমরণ অপরিবর্তিতই থাকে। দারুণ দুর্গতির পর প্রমদাচরিত্রের পরিবর্তন ঘটিল কিনা লেখক তাহা দেখান নাই।

কথাসাহিত্যের উৎকর্ষসৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে এইরূপ পিশাচীচরিত্র নির্বাচন বা গঠন করা উচ্চ-কলাশ্রী-সম্মত নয়। নারীকে তাহার নারীধর্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিলে তাহার দ্বারা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। যে ভাবদ্বন্দ্ব বা হৃদয়বৃত্তিগুলির যে সংঘর্ষ ও জটিলতা উচ্চ সাহিত্যের পোষক—যে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির একত্র সমাবেশ কল্পিত চরিত্রকে রক্তে মাংসে জীবন্ত করিয়া তোলে—সে সমস্ত অবিমিশ্রভাবে অমানুষ পিশাচ চরিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় না। সেজন্য বলিতে হয়—প্রমদাচরিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইলেও স্বর্ণলতাকে প্রথম শ্রেণীর কথাসাহিত্যে পরিণত করিতে পারে নাই।

প্রমদা-চরিত্র যেমন অবিমিশ্র অসৎ দিয়া গঠিত, সরলা-চরিত্র তেমনি অবিমিশ্র সৎ দিয়া গঠিত। সরলা-চরিত্রও অস্বাভাবিক নয়। এইরূপ চরিত্র বাংলার বহু সংসারেই দেখা যায়। হিন্দু নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজে সুশীলা বধূরা কত যে অসহায়, তাহা সরলা-চরিত্রে দেখানো হইয়াছে। বিছার মত দংশন করিয়া সে সরিয়া পড়িতে পারে না, নখ, দন্ত, হুল, বিষের অভাবে সে কেঁচোর মত চিরদিনই পদদলিত হয়। তাহার আত্মবলিদানই বাংলা কথাসাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য। উপার্জনে অক্ষম, নির্বোধ, দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবকরাও গত শতাব্দীতে বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করিত না। তাহারা ঠিক বিবাহ করিত না—তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইত। তারপর তাহাদের বধূরা স্নেহশীল শ্বশুর ভাসুরের বা দেবরের আশ্রয় যদি না পাইত এবং সেই সঙ্গে পিতৃগৃহেরও কোন সহায়তা না পাইত—তাহা হইলে তাহাদের যে দুর্দশা হইত, সরলা-চরিত্রে তাহাই দেখানো হইয়াছে।

যে নারী আপনার সন্তানকে এক পয়সার একটা খেলনা কিনিয়া দিতে পারে না—ক্ষুধার্ত স্বামীর মুখে দুই মুঠা অন্ন যোগাইতে পারে না—হৃদয়হীনা আত্মীয়ার বাক্যযন্ত্রণা যাহাকে অবিরত সহিতে হয়, অক্ষম স্বামীর সংসারে নানা অভাবের ক্লেশ যাহাকে নিত্যই সহ্য করিতে হয়, তাহার জীবন যে কত দুর্বিষহ তাহা সরলাচরিত্রে লেখক দেখাইয়াছেন। মুখ বুজিয়া সরলা নত মস্তকে সমস্তই সহিয়া যাইতেছে। সরলা যেন নিষ্ঠুর সামাজিক ও পারিবারিক

ব্যবস্থার বেদীর পাশে বলির মেষ বা ছাগ।* এ চরিত্রের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংগ্রাম নাই—কোন জটিলতা নাই—কোন বৈচিত্র্য নাই। এরূপ চরিত্রও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পরিপোষক নয়। কেবল চিত্র হিসাবে এ চরিত্রের একটা সার্থকতা অবশ্যই আছে।

লেখক শ্যামা-চরিত্রটিকে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই চরিত্রটি রক্ত মাংসে জীবন্ত। দাসী হইয়াও সে মহীয়সী মহিলা। লেখক একটা অকারণ মহত্ত্বের সৃষ্টি করেন নাই। শ্যামা বিধবা, পুত্রহীনা—তাহার একটি পুত্র ছিল সে তাহাকেও হারাইয়াছে। সে গোপালকে তাহার অনুকল্প (substitute) করিয়া তুলিয়াছিল। শ্যামা গোপালের দ্বিতীয়া জননী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার এই স্বভাবসংগত বাৎসল্যই তাহাকে দুঃখীর সংসারে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল। সে যে অনেক দুঃখ স্বীকার করিয়াছে এবং অসীম আত্মত্যাগ করিয়াছে, অন্যত্র দাসীবৃত্তি করিয়াও সে যে বিধুর সংসারটিকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিল কেন তাহার স্বভাবসংগত উত্তর আছে। সে সরলার মত অবলা হইলে—ঐ সংসার সে রক্ষা করিতে পারিত না। সে তেজস্বিনী রমণী ছিল। সে সরলার প্রতি প্রমদার রূঢ় আচরণ সহিয়া থাকিত না—সে বিবাদ করিতে জানিত, সে আড়ি পাতিয়া প্রমদার সকল কথা শুনিয়া আসিত, রূঢ় কথার বিনিময়ে রূঢ় কথা সে শুনাইতে জানিত—সে গদাধরকে শাসনে রাখিয়াছিল, সে পরমাত্মীয়ার মত বিধুভূষণকেও তিরস্কার করিত, গদাধর টাকা চুরি করিলে সে সহজে ছাড়ে নাই—সে টাকা সে শশীর কাছ হইতে আদায় করিয়াছিল। শত দুঃখেও সে কাতর হইত না, হাসিমস্করা ঠাট্টাতামাসা করিয়া সে সকল দুঃখ ক্লেশকে উড়াইয়া দিয়া সরলাকে আশ্বস্ত করিত, সময়ে অসময়ে রঙ্গ রসিকতার জন্য সরলার কাছে তিরস্কৃতও হইত।

জীবনীশক্তির আতিশয্য তাহার ছিল বলিয়াই সে একটি মৃতপ্রায় সংসারকে নিজের অফুরন্ত জীবনীশক্তি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। সে এতই উচ্চস্তরের নারী যে সে আপন উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিত, অথচ কোন প্রতিদান, পুরস্কার এমন কি বাচনিক কৃতজ্ঞতাও প্রত্যাশা করিত না। সে আপন প্রশংসাকে তুচ্ছ বাক্য-বিন্যাসমাত্র মনে করিত। নিস্তেজ নিশ্চেষ্ট পুরুষকে লজ্জা দিবার জন্য এই তেজস্বিনী সবলা অবলার সৃষ্টি।

শশিভূষণ একটি মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বহীন অশিক্ষিত পুরুষ। শশিভূষণ সেই শ্রেণীর পুরুষ যাহারা ধূর্ততা, শঠতা ইত্যাদির দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে পারে—কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারে না। শশিভূষণ একেবারে অমানুষ ছিল না—প্রখরা হীনচরিত্রা পত্নীর শাসনেই

* "যেখানে এক পক্ষ প্রবল অত্যাচারী ও অপরপক্ষ নিরীহ অসহায়, বিনা প্রতিবাদে অপর পক্ষের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে সেখানে এক প্রকার সুলভ করুণ রস উদ্বেলিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু বিরোধের তীব্রতা বা জটিলতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। স্বর্ণলতায় ভ্রাতৃবিরোধের চিত্রটি আলোচনা করিলে পাঠকের সহানুভূতি এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত বা অনিশ্চয়িত থাকেনা—প্রমদা ও সরলার মধ্যে পক্ষাবলম্বন করিতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা বিলম্ব করে না। কিন্তু এইসমস্ত ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে বিশেষ কিছু গভীরতা থাকে না—কলা কৌশলের দিক দিয়া এ সমস্ত চিত্র প্রায়ই অক্ষম ও ব্যর্থ হইয়া থাকে।"

(বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

সে অমানুষ হইয়া উঠিয়াছিল। বিধুভূষণের চরিত্রে ভালবাসার যোগ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। তবু শশী যে অক্ষম ভাইকে একেবারে ভালবাসিত না তাহা নয়,—সুশীলা ভ্রাতৃবধূর মহিমার মর্য্যাদাও সে অন্তরে অনুভব করিত, কিন্তু পত্নীর শাসনে এবং গৃহে অশান্তিসৃষ্টির ভয়ে সে অমানুষ হইয়া উঠিয়াছিল। যেদিন বিপন্ন হইয়া পত্নীর কাছে টাকা চাহিতে গিয়া সে হতাশ হইল, সেদিন তাহার চৈতন্য হইল। সেদিন সে যে কথাগুলি বলিল—তাহাতেই তাহার অন্তরের কতকটা পরিচয় পাওয়া গেল—। "আমি যথার্থই বোকা, তা না হলে তোমার মত পাপীয়সীর কথায় আমার প্রাণের ভাই বিধুকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেব কেন? আমার ঘরের লক্ষ্মী সরলাকেই বা মেরে ফেল্‌ব কেন?—আমার সোনার প্রতিমা সরলাকে বিসর্জন দেবার ফল এতদিনে ফল্‌ল।"

বিধুভূষণ বাংলাদেশের এক শ্রেণীর যুবকের প্রতিনিধি। লেখাপড়া ছাড়িয়া ইহারা বাহিরের আমোদ প্রমোদ লইয়াই ব্যস্ত। এই শ্রেণীর দারিদ্র্যজ্ঞানহীন অশিক্ষিত কর্ম্মকুণ্ঠ বহু যুবক বিবাহ করে এবং পিতা, ভ্রাতা অথবা শ্বশুরের গলগ্রহ হইয়া দিন কাটাইতে চায়। নিজের গৃহের কাজ ইহারা করে না—কিন্তু পরের কাজে ইহাদের ক্লান্তি নাই।* তাহাতে কিছু অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ থাকিলেও তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াও ইহারা উদারতা দেখায়। ইহারা মনে করে যে-ভাবে চলিতেছে সেই ভাবেই চিরদিন চলিবে। উপার্জনের জন্য ক্লেশ স্বীকার করার চেয়ে বাক্যযন্ত্রণা ও উপেক্ষা সহ্য করিয়া পরাধীন জীবনযাত্রাকেই শ্রেয় মনে করে। বিধুভূষণ সেই শ্রেণীর যুবক। "বিধুভূষণ সমস্ত দিনই পাড়ায় থাকিতেন। গীতবাদ্য তাসপাশাতেই তাহার সময় অতিবাহিত হইত।" যে দিন সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহ হইতে বিতাড়িত হইল সেদিন তাহার চৈতন্য হইল—পত্নী ও পুত্রের প্রতি তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন হইল।

দারুণ আঘাত লাভ করিয়া তাহার চরিত্রের পরিবর্তন হইল, কিন্তু ইহার পর উপন্যাসের আখ্যানবস্তুতে তাহার স্থান হইল গৌণ। ইহার পর হইতে সে ক্রমে গোপালের পিতা বলিয়াই পরিচিত হইল। সে উপার্জনক্ষম হইয়াছিল—কিন্তু তাহার বুদ্ধির কোন উন্নতি হয় নাই। তাই সে শক্রপুরীতে পত্নীপুত্রকে ফেলিয়া রাখিয়া চারি বৎসর ধরিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। এই বুদ্ধিহীনতার দণ্ড তাহাকে ভুগিতে হইয়াছিল—সে সরলাকে হারাইয়াছিল। বিধু বড় ভাইকে খুব ভক্তি করিত এবং তাঁহার স্নেহের উপর তাহার অক্ষুণ্ণ নির্ভর ছিল। সে জানিত —সে যাহাই হউক বড় ভাই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। তাহা ছাড়া, সরলাইত ঘরের সব কাজ করে—দুবেলা রাঁধাবাড়া করে—তাহাকে ছাড়া দাদারই বা চলিবে কিরূপে? প্রমদাত নড়িয়া বসে না। এই ভাবিয়া বিধু নিশ্চিন্ত ছিল। দাদা তাহাকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন

*কবিতায় এইরূপ চরিত্রের গুণগান করা চলে, কারণ, কবিতা জীবনের একটি খণ্ডিত অংশকেই উপজীব্য করে। তাই কবি কুমুদরঞ্জন এইরূপ চরিত্রের গুণকীর্তন করিয়াছেন মোটের কবিতায়। কিন্তু কথা-সাহিত্য এইরূপ চরিত্রকে ক্ষমা করিতে পারেনা। কারণ, সমগ্র জীবন কথা-সাহিত্যের উপজীব্য।

শুনিয়া সে তাই সহজে বিশ্বাস করে নাই। সে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। যখন দেখিল—দিগম্বরী রাঁধিতেছে এবং সরলা কাঁদিতেছে, তখন দারুণ আঘাতে তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল।

হেমচন্দ্র চরিত্রে বৈচিত্র্য কিছু নাই। হেমচন্দ্রের সৌজন্য কতকটা মাতা পিতার প্রভাবে ও প্রতিপালনের গুণে—কতকটা সুশিক্ষা লাভে সম্ভব হইয়াছে। গোপালকে স্বগৃহে রাখিবার সংকল্প করিয়া যেভাবে হেমচন্দ্র বৃদ্ধ ভৃত্যের সম্মতি লাভের চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রের একটি চমৎকার দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গোপাল—গোপালের মতই সুবোধ। শান্তশিষ্ট, কষ্টসহিষ্ণু, সদভিপ্রায়ী, সুশীল চরিত্রের কিশোর এই গোপাল। এই চরিত্রেও কোন জটিলতা নাই। দীনতাবোধ, আপন অবস্থায় তুষ্টি, সংকোচ, কুণ্ঠা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদির মধ্য দিয়া চরিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্বর্ণলতা চরিত্রটি ফুটিয়াছে—শশাঙ্কের উৎপীড়নে। একটি বালিকার পক্ষে যতটা তেজস্বিতা দেখানো সম্ভব—তাহা লেখক স্বর্ণলতা-চরিত্রে দেখাইয়াছেন। স্বর্ণলতার সহিত গোপালের প্রণয়ের একটা চিত্র আছে। এই চিত্রটি অতি সংযত তুলিকায় অঙ্কিত।

শশাঙ্ক—এই উপন্যাসে villain, চরিত্রটি গৌণ হইলেও ইহার অবতারণায় উপন্যাসে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অবতারণা না করিলে উপন্যাসের উত্তরাংশের মূল্য-মর্যাদা কমিয়া যাইত। লেখক বাংলার গুরুদেব শ্রেণীর জীবের একটি চিত্রাঙ্কন করিয়া যথেষ্ট সত্যনিষ্ঠা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। যে মনোভাব হইতে এই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সমাজের এই ঘৃণিত চরিত্ররহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে সেই মনোভাবই অনাদৃত উপেক্ষিত তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মনুষ্যদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আবিষ্কার করিয়াছে। এই হিসাবে লেখক বর্তমান যুগের লেখকদের গুরুস্থানীয়।

নীলকমলের—সহিত মূল আখ্যানবস্তুর সম্পর্ক নাই। কৌতুকরসসৃষ্টির জন্যই নীলকমলের অবতারণা। তবু নীলকমল-চরিত্র একটি অপূর্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রে কৌতুক রসের ফেনিলতার অন্তরালে একটি কারুণ্যের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। নীলকমল নিঃস্ব বলিয়া নয়—নির্বোধ বলিয়া করুণার পাত্র। সে মূঢ় আত্মগরিমায় বিভোর, কিন্তু তবু সেও মানুষ,—জীবন্ত চরিত্র।

এইবার উপন্যাসের রচনাভঙ্গীর একটু বিশ্লেষণ করা যাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের মনোহারি দোকানের প্রসঙ্গটি অতি উচ্চাঙ্গের রচনা। এটি যে কোন প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের উপযুক্ত পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদটিই গৃহবিচ্ছেদের সূত্রস্বরূপ হইয়াছে। প্রমদাচরিত্র, সরলাচরিত্র ও প্রতিবেশিনীদের চরিত্র এক পরিচ্ছেদেই চমৎকার ফুটিয়াছে। শেষকালে মনোহারী ফেরিওয়ালার দরদের কথাগুলিও চমৎকার।

সপ্তম পরিচ্ছেদটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিচ্ছেদ। বড় ভাই পৃথক করিয়া দিয়াছেন—ভ্রাতৃবৎসল বিধু তাহা বিশ্বাস করিতেছে না। সে স্নেহের স্বপ্নে বিভোর। সে নিশ্চিন্ত,—সে সরলাকে বলে "এর জন্য আর ভয় কি? দাদা বাড়ী এলেই চুকে যাবে।" বিধু নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ঢুকিয়া রান্নাঘরে দিগম্বরী ঠাকুরাণীকে দেখিয়া তাহার সহিত রসিকতা করিতেছে।

দিগম্বরী আজ গম্ভীরা। তারপর বড় ভায়ের কথায় বিধুর স্বপ্নভঙ্গ। এই চিত্রটি সুরচিত। বিপিন ও গোপালের মধ্যে সন্দেশ লইয়া যে ব্যাপারটা হইয়া গেল—সে চিত্রটিও সুন্দর।

অষ্টম পরিচ্ছেদটিও উল্লেখযোগ্য। প্রমদার প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া ধোপা সরলার কাছে টাকার তাগাদা করিতে গেল—তারপর সরলার কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। বিধুভূষণ ধনিগৃহে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল। সরলার নিকটে বিধু হৃদয়ের গোপন কথা প্রকাশ করিল। তারপর শ্যামার চরম আত্মত্যাগের কাহিনী—এইগুলি মর্ম্মস্পর্শী ভঙ্গীতে রচিত হইয়াছে।

দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ—বিধুভূষণের সহিত নীল কমলের কলিকাতা যাত্রা। এঅংশ বেশ সরস করিয়া রচিত। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ হইতে গদাধরকে লইয়া রঙ্গরসিকতার সূত্রপাত হইয়াছে—স্থলে স্থলে এই রসিকতা বেশ জমিয়াছে, বিশেষতঃ থানার দৃশ্যে। শ্যামার বিক্রমে গদাধর জব্দ। এই পরিচ্ছেদে শ্যামাকে যে ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে তাহাতে শ্যামা রক্ত মাংসে জীবন্ত চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে বাংলার অপদার্থ ভোগাসক্ত জমিদারের চিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। ১৮শ পরিচ্ছেদে কালীঘাটের চিত্রটি যেমন যথাযথ—তেমনি কৌতুকরসে ঋদ্ধ।

একবিংশ পরিচ্ছেদের গ্রাম্য পাঠশালার দৃশ্যটি একটি সুন্দর চিত্র। বাংলার পল্লীসমাজ প্রমদার মত নারীতেই পূর্ণ নয়—ঠিক তাহার বিপরীত চরিত্রের নারীর অভাবও নাই। ভুবনের মায়ের চরিত্র অঙ্কন করিয়া লেখক তাহা দেখাইয়াছেন।

এইরূপ মাতৃ-চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'শ্যামা কার কি করেছে ?' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। ২৭শ পরিচ্ছেদে সরলার মৃত্যুদৃশ্য বড়ই করুণ এবং সুরচিত। ২৮শ পরিচ্ছেদে পুলিশের প্রসঙ্গ লেখকের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। লেখক পুলিশের লোকের চরিত্র যথাযথভাবেই ফুটাইয়াছেন। ত্রিংশ পরিচ্ছেদে গোপাল যে বাড়ীতে বাস করিত তাহাদের হৃদয়হীন আচরণের চিত্র বেশ স্বভাবসঙ্গত। একত্রিংশ পরিচ্ছেদে প্রবীণ ভৃত্যের নিকট গোপালকে গৃহে স্থান দিবার জন্য হেমচন্দ্রের অসংকোচে সম্মতি প্রার্থনার দ্বারা বেশ চমৎকার রসসৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদেই হেমচন্দ্র চরিত্রে একটু জীবন-রক্তিমার আভাস পাওয়া যায়। ৩৩।৩৪শ পরিচ্ছেদে স্বর্ণলতা ও গোপালের প্রণয় সঞ্চারের অতি সংযত, শোভন, এবং স্বাভাবিক বর্ণনা আছে। ৩৭শ পরিচ্ছেদের 'সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি' একটি উল্লেখযোগ্য সুন্দর চিত্র। ৩৯শ পরিচ্ছেদে গোপালের শ্রীরামপুর যাত্রার বর্ণনা সম্পূর্ণ বাস্তবনিষ্ঠ স্বভাবসঙ্গত ও রসানুকূল। ৪০শ পরিচ্ছেদের ঘটনাবলীর দ্রুত সঙ্করণের মধ্যে কলাকুশলতা আছে। ৪১শ পরিচ্ছেদটি গ্রন্থের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ, শশিভূষণ প্রসঙ্গটি এই পরিচ্ছেদে স্বাভাবিক চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। সমগ্রভাবে বিচার করিলে উপন্যাসখানিতে কোন কোন ত্রুটি থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার কতকগুলি পরিচ্ছেদ এমনই সুরচিত যে সেগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের

রচনার পার্শে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। মোটকথা, বঙ্কিমযুগে স্বর্ণলতাই একমাত্র উপন্যাস, যাহা বঙ্কিমের উপন্যাসের নীচেই স্থান পাইতে পারে।

উপন্যাসখানির রচনাভঙ্গীর সরসতার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করি।

"বঙ্গদেশে কি চমৎকার প্রথা। জীবিতাবস্থায় যাহার জন্ত লোকে এক টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে মরিলে তাহার শ্রাদ্ধে অনায়াসে দশ টাকা ব্যয় করিতে পারে। যদি শ্রাদ্ধের টাকা দিয়া লোকে চিকিৎসা করাইত, তাহা হইলে বোধ হয় অকালমৃত্যু রহিত হইতে পারিত।"

"হনুমান এঁসেও আসে না। রামের এদিকে চক্ষু ভেঙে আসছে। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ম'রে আঁদিয়ে ঘুম দিচ্ছেন। রাম বেচারার হিংসা হচ্ছে। মরতে পারলেই একটু ঘুমিয়ে বাঁচে। কিন্তু হনুমান না এলে ত যুদ্ধ আরম্ভ হতে পাবে না। হনুমান আসে না।"

"বয়স ৩২।৩৩, বাম করে তামাকসাজা কলিকা সহ হুঁকা, বামকাঁধে একখানি ময়লা বস্ত্রাবৃত একটি বেহালা ঝুলানো। দক্ষিণ করে একগাছি তলতা বাঁশের ছড়ি, পায়ে জুতা নাই। কটিদেশ হইতে গলা পর্য্যন্ত অনাবৃত, মস্তকে একখানি চাদর পাগড়ি করিয়া বাঁধা, কোমরে ক্ষুদ্র একটি বোঁচকা। এই অবস্থায় সে যখন বসিল তখন তাহার কলেবর উত্তম কালিতে লিখিত একটি জিয়ন্ত "ঙ"য়ার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।"

"গদাধরকে দেখিয়া শশিভূষণের যে মনোভাবের উদয় হইল তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বোধ হয় লঘুপতনক দ্বিতীয় কৃতান্তমিব ব্যাধকে দেখিয়া যত অনিষ্টের আশঙ্কা না করিয়াছিল শশিভূষণ সহধর্মিণীর প্রিয়তম ভ্রাতাকে দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক ভীত হইলেন।"

"তুমি কাহাকেও ৫৲ টাকা দান করিলে তোমার কষ্ট হয় না, তোমার দশ টাকা হারাইয়া গেলেও তোমার বিশেষ দুঃখ হয় না। কিন্তু বাজারে যদি চারি পয়সার জিনিস কিনিতে তোমার নিকট হইতে ছয় পয়সা লয়, তাহাতে তোমার মর্মান্তিক কষ্ট বোধ হয়। কেন? কারণ, তোমার মনে হয়, তোমা অপেক্ষা দোকানী অধিক চতুর, অধিক বুদ্ধিমান। লোকে নিজের বুদ্ধির ন্যূনতা স্বীকার করিতে চায় না।"

"আশ্চর্যের বিষয় এই লোকে পরস্পর ঐশ্বর্যেরই হিংসা করে, বুদ্ধি বিদ্যার হিংসা করিতে দেখা যায় না। আমার অপেক্ষা এত জমি বেশী, এত টাকা বেশী, অনেকেই বলে। কিন্তু কে কোথায় কাহাকে বলিতে শুনিয়াছ, "আমার অপেক্ষা অমুকের বুদ্ধি বেশী।" বুদ্ধি থাকিলে ধন হয়, জমি হয়, জমিদারী হয়, কিন্তু তবুও অমুকের মত আমার বুদ্ধি হউক একথা কেহই বলে না।

গোপাল উড়ে

গোপালের জন্মভূমি কটক জেলার জাজপুর। প্রথম যৌবনে গোপাল কলিকাতায় আসে উদারান্নের সংস্থানে। সে প্রথমে ফেরিওয়ালার কাজ করিত। সে সুশ্রী, সুকণ্ঠ ও সুরসিক যুবক ছিল। বৌবাজারের রাধামোহন সরকারের একটি সখের যাত্রার দল ছিল। গোপাল সেই দলে ১০৲ টাকা মাহিনায় যোগ দিল। এই দলে থাকিয়া ক্রমে সে সুগায়ক ও গানরচয়িতা হইয়া উঠিল। রাধামোহনবাবুর মৃত্যুর পর গোপাল তাঁহার দলের অধিকারী হইল ও সখের দলকে পেশাদারী দলে পরিণত করিল। গোপাল ভৈরব হালদার নামক একজনের নিকট হইতে দলের কোন কোন পালা এবং কতকগুলি গান লিখাইয়া লইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের গানগুলি তাঁহারই রচিত কিনা জানা যায় না। তবে গানগুলি গোপালের নামেই চলিতেছে। গোপাল নিজে যখন গান রচনা করিতে পারিত, তখন তাহার নামে-প্রচলিত গানগুলিকে তাহারই রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'বঙ্গভাষার লেখক'-গ্রন্থে বহু কবিরই জীবনচরিত সংক্ষিপ্তাকারে উপনিবদ্ধ আছে। কিন্তু গোপালের নামও নাই। ইহা তাহার কবিশক্তির প্রতি অবিচার।

আজকালকার সভ্য-সমাজে গোপাল উড়ের গানের কোন আদর নাই। কিন্তু এককালে তাহার গানের আদর কেবল পল্লীসমাজে নয়—নগরের সভ্য-সমাজেও ছিল। গোপাল এ আদর অযথা লাভ করে নাই। সে কালে অন্যান্য পাঁচজন কবি ও কবিওয়ালাদের কেরামতি যেমন ছিল—গোপালেরও তেমনি ছিল। বরং গোপালের কৃতিত্ব অন্যান্য লোকসাহিত্যিকদের তুলনায় কিছু বেশিই ছিল। গোপাল ছিল একটা গানের দলের অধিকারী, অশিক্ষিত ও অমার্জিত রুচির লোক। কিন্তু সে ছিল স্বভাবকবি। কেবলমাত্র বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া এবং দেশে প্রচলিত লোক-সঙ্গীত শুনিয়া সে নিজের, জন্মগত কবিত্বশক্তির গুণে গান রচনা করিত। তাহার গানগুলির গুণবিচারে একথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

বাঙ্গালীদের ধর্মপ্রাণতার দিকটা ফুটিয়াছে সেকালের বহু সঙ্গীতে, কবিতায়, পাঁচালীতে ও যাত্রার নাটকে। বাঙ্গালীরা যে পরের প্রতি দরদে ও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিতে অশ্রুপাত করিতে জানিত বাংলা-সাহিত্যে তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। কিন্তু এই বাঙ্গালীদের একটা লঘুতরল চটুল রসিক জীবনও ছিল, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা'। সে স্ফূর্তিতেও মশগুল হইতে জানিত। আমরা সে পরিচয় পাই বাঙ্গালার পোষ্যপুত্র এই অবাঙ্গালী বাঙ্গালীকবির গানে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানিকে রসের কারিগর গোপাল গানে ঢালাই করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের (বা বর্দ্ধমানের ?) রসের গম্ভীর সরোবরটি হইতে গোপাল নালী কাটিয়া রসের প্রবাহটিকে বঙ্গদেশময় ছড়াইয়াছে।

বিদ্যাসুন্দরে যে রস ঘনীভূত ছিল, গোপাল তাহাকে তরলায়িত করিয়া আপামরসাধারণের

উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের গীতানুবাদ বলা যাইতে পারে—গোপাল শুধু পয়ার-ত্রিপদী ছন্দের বিদ্যাসুন্দরকে বাংলার নিজস্ব ছন্দেই অনুবাদ করে নাই—ভারতচন্দ্রের নাগরিক ভাষাকে বাংলার পল্লীর ভাষায় অর্থাৎ বাংলার কৃত্রিম মুখের ভাষাকে বাংলার স্বাভাবিক বুকের ও মুখের ভাষায় অনূদিত করিয়াছে। আজিকার সভ্য কোটপ্যান্টপরা অথবা মটকাতসর-আদ্দির-পাঞ্জাবী পরা বাঙ্গালী যাহাই বলুক, ধুতিচাদরপরা খাঁটি বাঙ্গালীর বলিবার উপায় নাই যে—এই ভাষাই তাহার প্রপিতামহ-প্রপিতামহীদের নিজস্ব ভাষা নয়।

ভারতচন্দ্র অনুপ্রাস-যমকের কবি ছিলেন—গোপাল তাঁহার অনুপ্রাস যমক দুই চারিটি গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু নিজস্ব অনুপ্রাস-যমকের জমকের নিদর্শন দিয়াছে ভূরি ভূরি। মনে হয় স্বয়ং অনুপ্রাস যমকের রাজা দাশু রায়ও তাহার তারিফ না করিয়া পারেন নাই নিশ্চয়। আমি সেগুলির পৃথক দৃষ্টান্ত দিব না। প্রসঙ্গচ্ছলে গোপালের রচনার যে যে অংশ উদ্ধৃত হইবে—সেগুলিতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

ভারতচন্দ্র বাংলার নিজস্ব চলতি লক্ষ্যাত্মক বাক্য ও বাক্যাঙ্গগুলিকে তাঁহার কাব্যে সন্তর্পণে স্থান দিয়াছিলেন। গোপাল সেগুলিকে বেপরোয়া ভাবে ঢুগেখো চালাইয়াছেন। বাঙ্গালীরা নিজস্ব ভাষার বৈশিষ্ট্য সেগুলিতে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ পাইত। আমাদেরও খাঁটি বাঙ্গালী মনের যেটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে—তাহা সেগুলিতে আজিও রস পায়। কতকগুলির দৃষ্টান্ত দিই—

১। তুমি মনকলা খাও মনে মনে কালনেমির মতন।
২। গাছে তুলে মই কেড়ে লও আচ্‌কা ফেল অথান্তরে।
৩। গাছে কাঁঠাল গোঁপেতে তেল তাতে কি আর আশা পোরে?
৪। পাড়ার যত ভেড়ের ভেড়ে হাতে ধরে পায়ে পড়ে।
৫। কার বা মাথার উপর মাথা তোমার কাজে করবে হেলা।
৬। নেই পল্লে থাকেনাক সাপের বিষ যথা।
৭। এ চাঁদ নয়রে ছেলেখেলা যেমন ফাঁকে ফাঁকে মাকু ঠেলা।
৮। দিবি উদোর ঘাড়ে বুধোর বোঝা এ নয়রে তোর কলম ঠেলা।
৯। সাপে যেমন ছুঁচো গেলা তেমনি হবে যাচ্ছে বোঝা।
১০। যাদুমণি ধৈর্য্য ধর এই ত কলির সন্ধ্যেবেলা।
১১। যদি বুক ফেটে যায় প্রাণসজনি তবু, মুখ ফুটে তা বল্‌ব না।
১২। সাগর সেঁচে মাণিক এনে হাতে দেয় তোমার।
১৩। একথা কি ছাপা থাকে আপনি কাঠি পড়বে ঢাকে।
দেশবিদেশে জান্‌বে লোকে ভাঙ্‌বে হাঁড়ি আপনি হাটে।
১৪। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা সাপের মাথায় ব্যাঙনাচনা।

১৫। মিষ্ট কথা বলে ক'য়ে আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে,
কুমীরকে কলা দেখায়ে শেষে ফাঁকি দিও না।

১৬। সাপের হাই সে বেদেয় চেনে অন্য লোকে জানবে কেনে।

১৭। জলেতে ক'রে ঘরবাড়ী কুমীরের সঙ্গেতে আড়ি।

১৮। সূচ বেচা কামারের কাছে সে যে মিছে সে যে মিছে।

১৯। অজগরের ভিক্ষা যেমন তোমার তেমনি পণাপণ।

২০। আলোচাল দেখায়ে ভেড়া ভুলায়ে গোয়ালে পোরা।

২১। নও কাজের কাজী ভোজের বাজি সকল ফক্কিকার।

২২। মজাব না নারীর কুলে নাকে খৎ আমার।

২৩। ঢেউ দেখে ছেড় না হাল আজি না হয় হবে কাল।

২৪। শালগেরামের শোওয়া বসা বুঝতে পারিনে।

২৫। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের উপর দুধের উপব চিনি দিলে।

২৬। সবুরেতে মেওয়া ফলে, উতলায় বিফল ফলে
থাকতে হয় গো—কাদায় জলে গুঁণ টেনে ধনী।

২৭। শাক দিয়ে মাছ ঢাক তুমি সে সব কথা জানি আমি।

২৮। ঠেকিনু দায় বিদ্যার বিষম বিদ্যায়।
সাপের ছুঁচো ধরা যেমন ঘটিল আমায়।

২৯। ভেবে দেখ দুকূল মাঝে ঘর থাকতে বাবুই ভেজে।

৩০। পাকা আম কাকে খেলে চোরেব ধন বাটপাড়ে নিলে
হাত পোড়ানো তপ্ত জলে হলো অরণ্যে রোদন॥

৩১। কাটা ঘায়ে লুনের ছিটে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আর দিও না।

৩২। ঘোমটার ভিতর খেমটা খানি সাবাশ ধনি
ওলো ডুব দিয়ে জল পেটে পোরা।

৩৩। শিরে এখন সর্পাঘাত তাগা বাঁধবো কোথা?

৩৪। প্রাণ গেল প'ড়ে শাঁখের করাতে।

৩৫। লেখাপড়া শিখলি যত সকল ভস্মে ঢাললি ঘৃত।

৩৬। শিব গড়িতে বাঁদর হলো—এ কি বিধির বিড়ম্বনা।

৩৭। হয়ে আছ চিনির বলদ সদা আজ্ঞাবাহী।

৩৮। তোমার সে গুড়ে পড়েছে বালি।

এই ভাষার অন্তরালে কি যে ঐশ্বর্য্য আছে—তাহা আমরা ইংরাজি-তর্জমা-করা কৃত্রিম ভাষার মোহে ভুলিয়া গিয়াছি। ভেজালের যুগে খাঁটি মালের আদর নাই। যে সকল ভাব বিদেশ হইতে আসিয়াছে অথবা যাহা প্রাচীন ভারত হইতে আসিয়াছে—সে সকল ভাবের বাহন এ ভাষা নয় সত্য, কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালার মনোভাবের উপযুক্ত বাহন এই ভাষা। পাকা

রাস্তায় মোটর চলিবে চলুক, কিন্তু জলকাদাভরা বাংলার পথে মোটর চালাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সে পথে গোরুর গাড়ীই উপযুক্ত যান।

খাঁটি বাংলা ভাষা গোপালের হাতে কিরূপ জোরালো ও রসালো হইয়া উঠিয়াছে—কিরূপ সাবলীল সরল তরল ভঙ্গীতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি গান আগুন্ত তুলিয়া দিই—

মাসি, তোমার হদিশ পাওয়া ভার।
নও কাজের কাজী, ভোজের বাজী সকল ফকিকার।
বরের মাসী কনের পিসী সেইরূপ প্রকার।
দুপক্ষেতে আস যাও সমানে দুকাঠি বাজাও
ভানুমতী খেলাও মাসী দেখতে চমৎকার।
কখনো হও সত্য পীর কখনো পেঁড়োর ফকির
কখনও বা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার॥
বেড়াও তুমি যোগে যাগে হাড়ে তোমার ভেল্‌কি লাগে,
মুখের চোটে ভুতও ভাগে—কথায় হীরার ধার॥
কখনো হও সিদ্ধির ঝুলি কখনও শ্যামের মুরলী
কথাই সর্ব্বস্ব তোমার কাজে পাওয়া ভার।
যখন যাহার কাছে থাক তখনি হও তার।

নিম্নলিখিত গানটি বিখ্যাত। এই গানটির কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর কবিরও অযোগ্য নয়—

কলঙ্কেতে ভয় ক'রো না বিধুমুখী।
যে যা বলে সয়ে থাক হ'য়ে আমার দুখের দুখী।
মাতঙ্গ পড়িলে জলে পতঙ্গেতে কি না বলে
কণ্টকেরই বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়।
তা ব'লে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ানো যায়।
ডুবেছি না ডুবতে আছি পাতাল কত দূরে দেখি॥

কতকগুলি গানের ধরতা বা ধুয়া এমনি সুরচিত যে খুব পাকা হাতের রচনা বলিয়াই মনে হইবে। এই ধরতার এমনি আকর্ষণী শক্তি ছিল যে তাহা নিশ্চয়ই গোটা গান সেকালের সুসভ্য লোকদেরও না শুনাইয়া ছাড়ে নাই।

১। এমন কুল মজানো ফুল গেঁথেছে কে, আমার—মন মজালে হায়।
২। মানিনি তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জলে যায়।
৩। যদি বুক ফেটে যায় প্রাণ সজনি তবু মুখ ফুটে ত বলব না।
৪। তারে দেখ যতন ক'রে।
সুখের নিধি বুকের মাণিক মুখের অন্ন দিলাম তোরে।

৫। নবীন নাগর রসের সাগর ভুলবে কেন আমায় দেখে।

৬। নাতনি, ভাবনা কি আর বল—দিলে, গঙ্গাধরে গঙ্গাজল।

৭। ও মাসী ভরসা দিলে ভাল, তোমার ভরসা কথায় প্রাণ জুড়াল।

৮। কার ক'ব দুঃখেরি কথা মনের ব্যথা মনই জানে।

৯। মানে মানে মান ফিরে দাও দেশে চ'লে যাই।
ভাঙিল পিরীতের বাসা আশায় পড়ল ছাই।

১০। মুখে মধু বুকে ক্ষুরের ধার, ওগো অবলার।

গানের ধরতাই সমগ্র গানকে জমাইয়া তুলিত। গান গাহিবার সময় তাঁহার ধরতা বা ধুয়াই বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। অতএব ধরতা বা ধুয়াই যে খুব সুরচিত হওয়ার প্রয়োজন, গোপাল তাহা বড় শিল্পীর মতই বুঝিত।

গোপালের গানের ছন্দ প্রধানতঃ পদাংশমাত্রিক (Syllabic) স্বরাঘাত-প্রধান ত্রিপদী। হসন্ত বর্ণবহুল চল্‌তি বাংলা শব্দের মুহুর্মুহু প্রয়োগে পয়ারই এই ছন্দের রূপ ধরিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহাকে ধামালী ছন্দ বলে। এই ছন্দের ত্রিপদীর সঙ্গে ৪+৪=৮ মাত্রার চরণের দুইটি করিয়া অন্তরা।

তুল্‌ব কি ফুল। তুল বেধেছে। করেছে নির্। মূল ॥
ডানপিটে ড্যাক্‌। -রাদের বুকে। ধবে না বুক-। শূল ॥
অচোট মাটি। চুটিয়ে গেছে
আফোটা ফুল। ফুটিয়ে গেছে
কুঁড়িগুলোও। ছিঁড়ে গেছে। লুটেছে ব-। কুল ॥

এই ছন্দের চৌপদীর দৃষ্টান্তও অনেক আছে। যেমন—

মদন আগুন। জ্বলছে দ্বিগুণ। কল্লে কি গুণ। ঐ বিদেশী।
ইচ্ছা করে। উহার করে। প্রাণ সঁপে গো। হইগে দাসী ॥
বিষম ক-। টাক্ষ বাণে
অস্থির ক-। রেছে প্রাণে
চিত্ত না ধৈ-। র্য্য মানে। মন হয়েছে। তায় উদাসী ॥

দীর্ঘ ত্রিপদীর অন্তরার চরণগুলিতে শব্দের মাঝখানে যতি পড়িয়া পদাংশ-মাত্রিক চৌপদীর অন্তরায় কিরূপ পরিণত হইয়াছে লক্ষণীয়। এইরূপ শব্দের মাঝে যতি পড়ায় একটা যে Rhythm-এর (ছন্দঃস্পন্দের) সৃষ্টি হইতেছে তাহা গানের পক্ষে বিশেষ অনুকূল—ইহা গায়ন কবি ভাল করিয়াই বুঝিতেন।

'দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন' এবং 'গুরূপ-সাগর মাঝে ডুবিল আঁখি তরণী'—ছন্দের অক্ষরগণনার দিক হইতে দুই চরণে তফাৎ নাই। কিন্তু গোপালের গানে ইহা পদাংশ-মাত্রিক চৌপদী ছন্দের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে চরণটি ছন্দোহিল্লোলময় হইয়াছে।

ও রূপ সা-। গর মাঝে। ডুবিল আঁ-। খি তরণী॥

প্রথম চরণে দুই এক মাত্রা অতিপর্বীয় থাকে। এই ছন্দের গানের দস্তুরই তাই। যেমন—

১। পোড়া — প্রেম ক'রে কি। প্রমাদ হ'ল। সই।

২। বাছারে — শোনরে রতন। মণি।

অতিপর্ব মাত্রাযোগে ছন্দে রবীন্দ্রনাথের বাউল-সঙ্গীতগুলি রচিত। সেই ছন্দ গোপাল উড়ের গানেও পাওয়া যায়। —

ও নেমক্ — হারম বেটা পাজি—বে-হায়া ঠেঁট।
বাধালি — একি লেঠা সংসারে।
নেমকের — চাকর হ'য়ে দেখলি না — চক্ষে চেয়ে
সকলে — ঐক্য হয়ে একবারে।
তোরাত — আছিস দ্বারে কে এল —ও অন্দরে
পাখী এ- — ড়াতে নারে যে দ্বারে।
কোতোয়াল — বলি তোরে ধরে দে —বিদ্যাচোরে
নইলে তোয় — যমের পুরে দিব রে॥

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত অত অশ্লীলতা কোথাও নাই। গোপাল নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোক ছিল—রাজকবি ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্রের সাহস সে কোথায় পাইবে? তাহা ছাড়া, ভারতচন্দ্রের কাব্যের শ্রোতা ছিলেন স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার অনুচর, পরিচর ও পার্শ্বচরগণ। আর গোপাল উড়ের গীতিকাব্যেব শ্রোতা ও উপভোক্তা বাঙ্গালার জাতিধর্ম্মবয়োলিঙ্গনির্বিশেষে জনসাধারণ। এই কাব্যে অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলিবে কেন? গোপালকে গান বেচিয়া প্রাণ রাখিতে হইয়াছে—উদরান্নের সংস্থানকরিতে হইয়াছে। বিদ্যার গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারটাকে গোপাল বাদ দিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে গোপালের রচনায় অশ্লীলতা না হোক—কিছু গ্রাম্যতা দোষ ঘটিয়াছে। তাহা গর্ভসঞ্চারের মতই সেকালে অনিবার্য্য, কাজেই ক্ষন্তব্য।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে রসকলহের ধারা চলিয়া আসিতেছে। এই রসকলহ মঙ্গলকাব্যে হরগৌরীর কলহের রূপ ধরিয়াছে—গীতিসাহিত্যে শুকসারীর মুখে উহাকে সঞ্চারিত করা হইয়াছে। গোপাল বিদ্যা ও সুন্দরের মারফতে সেই রস-কলহটিকে চমৎকার জমাইয়া তুলিয়াছে।

বিদ্যাসুন্দরকাব্য কালিকামঙ্গলেরই নামান্তর। অতএব কালিকাপ্রসঙ্গ ইহাতে বাদ যাইতে পারে না। গোপালের বিদ্যাসুন্দর লঘুতরল চপলচটুল প্রকৃতির রচনা। ইহাতে পাছে রসাভাস হয় বোধ হয় সেই ভয়ে গোপাল কালিকার রুদ্রতা বা ভীষণতার উপর বেশি জোর দেয় নাই। কালীর কৃপা ছাড়া সুন্দরের গতি নাই—তাই সুন্দরের মুখে কয়েকটি কালীর স্তবগীতি ইহাতে আছে। সেগুলিতে কবিত্ব কিছুই নাই। কিন্তু শাক্ত সঙ্গীতসংকলনে এই

গুলিরও স্থান আছে। ভক্তিরসের প্রাচুর্য্যে এইগুলি অনেক রাজা মহারাজা দেওয়ান বাহাদুরদের শ্যামা-গীতিগুলির চেয়ে ঢের উচ্চাঙ্গের রচনা।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের চরিত্রগুলির মধ্যে মালিনীই একমাত্র জীবন্ত। গোপাল উড়ে এই মালিনীচরিত্রের জীবনীশক্তি (Vitality) বহুগুণে বাড়াইয়াছে। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজপথে আসিতে যাইতে বিশেষতঃ মালিনীর মালঞ্চের পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে যেন দেখিতে পাইতেন। মালিনীর সঙ্গে যেন কবির পরিচয়ও ছিল মনে হয়।

আর গোপাল যেন মালিনীকে লইয়া ঘর করিত বলিয়া মনে হয়। গোপাল নিজে মালিনীর ভাবে যেন আবিষ্ট হইয়াই তাহার কথা লিখিয়াছে। মালিনীর ভূমিকা—গোপালকে তাই বেশ সাজিত বা মানাইত। মালিনীর ভাব-ভাষা রঙ্গভঙ্গী হাসি মস্করা সমস্তই গোপাল যেন আয়ত্ত করিয়াছিল। এরূপ Realistic চিত্র প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও বড় দেখা যায় না।

মালিনী অনঙ্গাবতার সুন্দরের মুখে মাসী-সম্বোধন শুনিয়া যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও চমকিত হইয়া বলিতেছে—

জাদু, এমন কথা কেন বল্লি!
ভোরের বেলা সুখের স্বপন পায়ে ক'রে দল্‌লি।
কেমন ক'রে বল্লি মাসী?
আমি রে তোর মাসীর মাসী
হই যে রে তোর দাসীর দাসী একি কর্ম্ম কল্লি॥

মালিনীর ধূর্ত্ততা ভারতচন্দ্র বেশ ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহার মায়াবিনী-রূপের পরিচয় পাই গোপালের গানে।

যাদু, চিনতে ত পারি নাই।
আমি শুক্‌নো ডাঙ্গায় পানসী চালাই।
এ নয় রে তোর তেম্নি মাসী, সর্ব্বনাশী
নিমেষে কাশী মক্কা দেখাই।
আমি যদি মনে করি ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে পারি,
কুহক দিয়ে কুলের নারী বাহির করি
বাহির ক'রে ভেলকি লাগাই।

মাসী বাজার যাওয়ার সময় সুন্দরকে যেভাবে সাবধান করিয়া গেলেন—তাহাতে মাসীর দরদের অন্ত নাই।

যাদু আমি যাই বাজারে।
বেরিও না রে যাদু দুয়ারে।

এ দেশের রমণী যত কামাখ্যা ডাকিনীর মত
পুরুষ দেখলে রঙ্গ ভঙ্গ করে কত
ডাকে হাত ছানি দে নয়নঠারে।

অধীরচিত্ত সুন্দরকে মালিনী ধৈর্য্য ধরিতে বলিতেছে—

একি ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে ?
যাদু চাঁদ ধরি কি হাত বাড়িয়ে।
উতলার কাজ নয়রে যাদু সবুর কর
মনকে রাখ প্রবোধিয়ে।

ভারতচন্দ্রের মালিনী মালীর (তাহার মৃত স্বামীর) কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। হয়ত সে সত্যই ভুলিয়াছে। কিন্তু মালীর জন্য লোক-দেখানো আক্ষেপও করিবে না—ইহা ত স্বাভাবিক নয়। গোপালের মালিনী বলিতেছে—

হায় হায় আর কি পাব তেমন মালী।
সে যে প্রাণ খুলে জল ঢালত গোড়ায় তাড়াত অলি।
প্রতিদিন মাসে মাসে জন্মাতে দিত না ঘাসে
আটকে রাখত টাটকা বসে এ নবীন কলি।

অবশ্য মালিনী নিজেই তখন ছিল—নবীন কলি! 'ক্রোড়ে রাঁড়ী' মালিনী রাজার অন্তঃপুরে ফুল যোগায়—সে কাহারও ধার ধারে না, সে কাহারো কৃপার ভিখারিণী নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীন তাহার জীবন। কাজেই সে যেমন প্রখরা, তেমনি মুখরা। গালাগালি তাহার মুখে লাগিয়াই আছে—তাহার মালঞ্চের একটি ফুল ছিঁড়িলে সে বলে—

আঁটকুড়ীর ছেলেদের জ্বালায় জ্বলি বারোমাস।

ডানপিটে ড্যাকরাদের বুকে ধরে না বুকশূল।

মালিনীর মুখে যেরূপ অলঙ্কৃত ভাষা সাজে কবি তাহাই বসাইয়াছেন। ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির কাজ। মনে রাখিতে হইবে—কথাগুলি মালঞ্চ-বিহারিণী মালিনীর—

ফুল ফুটেছে উচ্চ ডালে পাবে কি রে হাত বাড়ালে
ভ্রমর হ'য়ে উড়ে গিয়ে বসো আপনি
তখন পাবে মধু ও যাদুমণি।

সুন্দর মালিনীর এই উপদেশ শুনিয়া ভ্রমর হইয়াই রাজান্তঃপুরের উদ্যানে উড়িয়া গেল। মালিনী বলিল—'আমার এই ফুলবাগানে ঋতু নাই বসন্ত ছাড়া।' এক কথাতেই মালিনীর মালঞ্চখানি আমাদের চোখে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিতেছে। গোপাল কালিদাসও পড়ে নাই—Wordsworthও পড়ে নাই—মালিনীর প্রসঙ্গে এইরূপ আলঙ্কারিকতা তাহার আপনা

হইতেই আসিয়াছে। মালিনীর মুখের এই চরণটির কাছে সীতার মুখে 'পঞ্চবটী বনে রহে মধু নিরবধি'—চরণটি যেন নিস্তেজ।

গানগুলিতে অনেক কথা ঠারে ঠোরে বলা হইয়াছে। ঠারে ঠোরে বলার নামই আলঙ্কারিকতা। গোপালের গানে যথেষ্ট আলঙ্কারিকতা আছে। এই আলঙ্কারিকতার কিছু অংশ conventional, অধিকাংশ [illegible]ই গোপালের মৌলিকতা আছে। অনেক স্থলে মৌলিকতা সাহিত্যে, কিন্তু সমাজসম্পর্কে নয়। অর্থাৎ সম্ভবতঃ সে সময়ে ঐ ধরণের আলঙ্কারিকতা লোকসমাজে ও অলিখিত বাগ্‌-বিন্যাসে প্রচলিত ছিল।

১। অজাগরের ভিক্ষা যেমন তেমনি তোমার পণাপণ।

২। এ নীল কাপড় হানছে কামড় ওগো সখি অলঙ্কার অঙ্গে সহে না।

৩। ভোলা যায় কি কথার কথা
শুকানো তরুর-ও মূল না ছাড়ে জড়িত লতা।

৪। যাকে যত্ন ক'রে রত্ন ভেবে রাখলেম চিরদিন,
কে জানে তার ভিতর ভরা গিল্‌টি করা টিন।
সোনা ব'লে জ্ঞান ছিল কষিতে পিতল হলো
এক পোড়নে চটে গেল এমনি বস্তুহীন।

৫। আহা কি তোর বিবেচনা
সোনার দাঁড়ে কাক বসালি।

৬। যত্নে রাখো হোমের ঘৃত কুকুরে মুখ দিবে এসে।

৭। ও যার মন ভাল নয় সে কেন পিরীত করে সই।
অরসিকে প্রেম করা যেন ভিজে ভাতে দই।

৮। কখনো হও সুধামুখী কখনও হও ভুজঙ্গিনী
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি জানবে কেমনে ধনী।

৯। গুব্‌রে পোকা বসবে নাকি কমলেরই ফুলে।
খাঁদা নাকের গজমোতি পড়বে না তোর খুলে।

১০। তুমি যে পরেরি সোনা আগেতে ছিল না জানা
জানতেম যদি পরের সোনা পরিতাম না কর্ণমূলে।

১১। ধিক ধিক ধিক গো তোরে,
এক কেঁড়ে দুধেতে গোবর দিলি দিলি কি ক'রে?

১২। ভাবেতে জলের সঞ্চার জ্ঞান হয় মনে।
মাগো মা এর কিছুই জানিনে। (বিদ্যার গর্ভসঞ্চারে)

১৩। কষ্‌টি হলে জানা যায় সোনার কষ লাগে তায়
ভেড়ার শৃঙ্গে হীরের ধার কতক্ষণ রয়?

স্থলে স্থলে গোপাল লক্ষ্যার্থক বাক্যাঙ্গের শোভাযাত্রাও চালাইয়াছেন—যেমন—

১। শুন ওগো রাজনন্দিনি তোমার এখন দুধে চিনি
আমার এখন শাকে বালি দিলেন ভগবান।
আমার এখন শনির দশা মন্দ করে শনি।
ভেবে দেখ দুকূল মাঝে ঘর থাকতে বাবুই ভেজে
এ দুঃখ যাবে না ম'লে ভুল্‌ব না গো ধনী।

২। তুমি তার কোথায় লাগ যাদুমণি।
ডুবে ডুবে জল খাও তার প্রতিফল পাও
তরঙ্গেতে কুটো দিলে হয় দুখানি।
মনেতে করেছ আশা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা
আসকে খেয়েছ বাছা ফোঁড় ত গণনি।

৩। যাদু ফুল গাঁথা নয় সোজা
দিবি উদোর ঘাড়ে বুধোর বোঝা।
এ নয়রে তোর কলম ঠেলা, ঠিক মিলাতে দিবি গোঁজা।
কোন কালে গেঁথেছ মালা ভুলাইবে রাজার বালা
সাপে যেমন ছুঁচো গেলা, ফুলের মালা—
ও চাঁদ তেমনি হবে যাচ্ছে বোঝা।

গোপালের গানে স্থলে স্থলে সুভাষিতেরও সন্ধান মিলে—

ওরে যাদু আশার আশ্বাসে লোক বাঁচে।
ঢেউ দেখে ছেড় না হাল আজি না হয়ে হবে কাল
হাল ধরে চালাও তরী ঠেকবে কিনারায়।

গতানুগতিক কবি-প্রসিদ্ধিও কবির হাতে অভিনব রূপ ধরিয়াছে—

কামিনী কমল বনে কে হে তুমি গুণাকর।
আশ্চর্য্য হেরি নয়নে শশী কেন পদ্মবনে
বুঝি কুমুদিনীর সনে হয়েছে হে মনান্তর।

উচ্চ শ্রেণীর কবিত্ব না থাকিলেও নিম্নোদ্ধৃত অংশ বেশ রসালো।

আমি কি হা'র নূতন ক'রে মান্‌ব লো এখন।
আমার চৌদ্দপুরুষ হার মেনেছে রাখতে রমণীর মন।
হার মেনে রমণীর পায় পড়ে আছেন পঞ্চানন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি পুরুষের হার চিরকালই
রাইএর মানে হার মেনে হায় যোগী হলেন বনমালী।

তাই বলি রমণীর কাছে   সকলের হার মানা আছে
কথায় যদি না হয় তবে মান ক'রে হার মানায় তখন।

গোপালের কুঞ্জ-ভঙ্গ গান—বর্দ্ধমান শহরের—বৃন্দাবনের কুঞ্জের নয়। কাজেই কবি জগদানন্দকে স্মরণ করিয়া গোপালকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

গা তোল লো নিশি অবসান।
বাঁশ বনে ডাকে কাক   মালী কাটে কপি শাক
গাধার পিঠে বোঝাই দিয়ে রজক যায় বাগান॥

বড় বড় প্রাচীন কবিদের রচনাতেও মিলের দৈন্য দেখা যায়, কিন্তু গোপালের গানে মিলের দৈন্য নাই, বরং আতিশয্যই আছে। গোপালের গানে মিলগুলো যেন অনায়াসে অবাধে আসিত। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিই—

১। পারিস যদি দেখ রে ক্ষ্যাপা এ কার্য্য কি থাকে ছাপা,
মহারাজা হবে খাপা, সারবে দফা, দায়ী হ'ব এই দুজনা।

২। নূতনেতে হয়গো যেমন পুরাতনে না হয় তেমন
জলের লিখন নিশির স্বপন খলের আপন সে কতক্ষণ
মোল্লার যেমন মুরগী পোষা।

৩। জানা গেছে জাবি জুরি ভারিভুবি,
ও নাগর কারিকুরি আর ক'রো না।

৪। খটকার উপর বিষম খটকা জালিয়ে দেছে চালের মটকা,
নাভিপদ্মে আছে আটকা কোন টোটকা মানবে না।

মিলের আতিশয্য না হোক অনুপ্রাসের আতিশয্য অনেক সময় গোপালের শ্রোতাদের তাক লাগাইয়া দিত।

১। নানাবস্থা নাস্তা খাস্তা শেষাবস্থায় হয়।

২। মাসী তোমার অনন্ত লীলে।
আশা দিয়ে বাসা দিলে শেষে ভাসালে॥

সেকালে যমকের জন্য পাঁচালী ও গীতিসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। যমকের জন্য একটু বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। গোপাল যমক-প্রয়োগেও পিছ্-পা ছিলেন না।

তোমার যে মনোচিত   চিত্ত দেওয়া অনুচিত
পেলাম সাজা সমুচিত   চিত্ত দিয়েছি বলে।
জানিতাম তব চিত   পাষাণেতে বিরচিত
দিলে দুঃখ যথোচিত   কি চিত্ত দিল খুলে।

এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের পাণ্ডিত্য অথবা দাশরথির চাতুর্য্য অবশ্য তাহার ছিল না।

হেমচন্দ্র

রঙ্গলালের পর গত শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবি হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা—তিনি আমাদের জাতীয় কবি, জাতীয়তার বোধনে তিনি মূল গায়ন। হেমচন্দ্র জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে জাতীয় কবি বলিতেছি না। প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কবি আমরা দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর কবি আবির্ভূত হ'ন—জাতির চিন্তার ধারা, রসবোধের আদর্শ, রুচি, প্রবৃত্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সংস্কারের জন্য—অথবা আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য। মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর কবি। ইঁহাদিগকে যুগ-প্রবর্ত্তক কবি বলা হয়। আর এক শ্রেণীর কবি আছেন—তাঁহারা জাতির মুখপাত্ররূপে জাতির চিন্তা, অনুভূতি, সুখ দুঃখ ও আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকেই ছন্দোময়ী ভাষায় অভিব্যক্তি দান করেন। হেমচন্দ্র এই শ্রেণীর কবি। হেমচন্দ্র আমাদের জাতীয় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে ভাষা দিয়াছেন বলিয়াই তিনি আমাদের জাতীয় কবি।

গত শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় জীবনের জাগরণ হইয়াছিল বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষার অভিঘাতে। জাতির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল—সে তাহার জাগরণকে দেশের কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিল। তাহার সে আকাঙ্ক্ষা যেমন পরিস্ফুট হইয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন গ্রন্থে—গত যুগের কোন কোন নাটকে,—তেমনি পরিস্ফুট হইয়াছিল নবীনচন্দ্র-হেমচন্দ্রের রচনায়। পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল হেমচন্দ্রের কবিতায়,—তাই আমরা হেমচন্দ্রকে বলি আমাদের জাতীয় কবি।

হেমচন্দ্রের কবিতা জাতিকে জাগাইয়াছিল একথা না বলিয়া আমরা বলি, নব-প্রবুদ্ধ জাতি হেমচন্দ্রের কবিতার ওজস্বিনী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

আমাদের দেশের চিরন্তন নৈতিক আদর্শকে আঘাত করিয়া মধুসূদন অভিনব নৈতিক আদর্শ প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অভিনব নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠাই করিয়াছেন। হেমচন্দ্র ভারতের চিরন্তন উন্নত নৈতিক আদর্শই তাঁহার রচনায় অনুসরণ করিয়াছেন—শুধু অনুসরণ নয়, তাহাকে অতিরিক্ত Emphasis দিয়া জ্বলন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বৃত্রসংহার যাঁহারা মন দিয়া পড়িয়াছেন—তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে হইবে না। এইভাবে হেমচন্দ্র জাতীয় ভাবধারা অনুসরণ করিয়া আমাদের জাতির চিরন্তন আদর্শ, চিন্তা, অনুভাব ও সংস্কারগুলিকেই রূপদান করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোন বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করেন নাই।

হেমচন্দ্র আমাদের জাতীয় কবি—তাই বলিয়া এদেশের কবিদের প্রভাব তাঁহার রচনার উপর খুব বেশি নাই। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার রচনায় নাই। সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব অবশ্যই আছে—তাহা তাঁহার বৃত্রসংহারেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঞ্চারিত হইয়াছে। বাঙালী কবিদের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের কোন প্রভাবও তাঁহার রচনায় নাই। ছন্দের দিক

হইতে ভারতচন্দ্রের প্রভাব কিছু আছে। দেব-চরিত্র-চিত্রণ বিষয়ে হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের অনুসরণ করেন নাই। ভারতচন্দ্র দেবতাকে মানুষ বানাইয়াছেন—হেমচন্দ্র মানব হইতে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়া দেবতাকে তাহার স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মাইকেলের প্রভাব হেমচন্দ্রের রচনায় অবশ্যই আছে। কিন্তু হেমচন্দ্র মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃত মহিমা ধরিতে পারেন নাই—হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর মিলহীন পয়ার মাত্র। হেমচন্দ্র পয়ার ছন্দের চরণের বেড়ি খসাইয়া অমিত্রাক্ষরের সুবিধাটাই গ্রহণ করিয়াছেন। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর যে Rhythm (ছন্দোহিল্লোল) সৃষ্টির দ্বারা অভিনব দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছিল—হেমচন্দ্র সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। পুরাণ হইতে উপাদান উপকরণ গ্রহণ করিয়া অভিনব বীররসাত্মক খণ্ডকাব্য রচনার পদ্ধতিটি হেমচন্দ্র মাইকেল হইতেই পাইয়াছেন। নামকরণে মাইকেল 'হত্যার' বদলে 'বধ' কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন—হেমচন্দ্রের 'সংহার' কথাটি যথাযথই হইয়াছে।

হেমচন্দ্র সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হইয়াছেন মিলটন, ড্রাইডেন, গ্রে, বাইরন, লংফেলো ইত্যাদি ইংরাজি ভাষার কবিগণের দ্বারা। মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্টের অনুসরণ বৃত্রসংহারে অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়।

হেমচন্দ্রের অনেক কবিতা ঠিক লিরিক নয়—ছন্দে বাগ্মিতা মাত্র—Speech in verse. ইহা তাঁহার গ্রে ও বাইরণের প্রভাবের ফলে। গ্রের Pindaric odeএর Awake Aeolian Lyre, awake কিংবা Ruin sieze thee ruthless king. Confusion on thy banner wait ইত্যাদি কবিতার প্রভাব হেমচন্দ্রের কবিতায় দেখা যায়। এইগুলি ছন্দে বাগ্মিতা। হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙা বাজ এই রবে'—এই শ্রেণীর কবিতা। Wordsworth, Keats, Coleridge, Shelley ইত্যাদি Romantic কবিদের প্রভাব হেমচন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবু হেমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন—একেবারে Subjectivity বা ভাবতান্ত্রিকতা না থাকিলে, অন্তরের দরদ না থাকিলে লিরিক হয় না। হেমচন্দ্রের কাব্যপুরুষের মূল ধাতুতে ভাবতান্ত্রিকতা ছিল না। হেমচন্দ্রের কবিতাবলী ও চিত্তবিকাশের কবিতাগুলি অন্তরের অবিমিশ্র রসাবেগের অভিব্যক্তি নয়—কিন্তু তিনি অধিকাংশ কবিতায় বিশেষতঃ উপসংহারে অন্তরের সহিত যোগ সাধন করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র পৌরুষ সবলতার পক্ষপাতী—পৌরুষ সবলতা অনেকটা বহিরঙ্গের ধর্ম, মহাকাব্যে ও নাটকে তাহার স্থান প্রশস্ত। গীতি-কবিতায় সৌকুমার্য্যেরই প্রাধান্য। এই সৌকুমার্য্য তাঁহার কোন কোন রচনায় গীতিমাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার সহিত তাঁহার জীবনের একটি শোচনীয় ঘটনার সংযোগ আছে। শেষ বয়সে হেমচন্দ্র অন্ধ হইয়াছিলেন। চক্ষুরত্ন হারানোর মধ্যে যে অসহায়তা ও কারুণ্য আছে—তাহা তাঁহার কোন কোন কবিতায় সৌকুমার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে, লিরিক মাধুর্য্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রধান ঐশ্বর্য্য ভাবে নয়, ভাষায় নয়, ভঙ্গীতেও নয়—তাঁহার কাব্যের ঐশ্বর্য্য কল্পনার অবাধ গতিতে। এমন সর্ব্ববাধাবন্ধহীন মুক্তপক্ষ কল্পনা-শক্তি অতি অল্প

কবিরই ছিল বা আছে। বলা বাহুল্য, কল্পনার এইরূপ অবন্ধিত প্রসার কাব্য-সৃষ্টির পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে বাধাই হইয়াছে—কল্পনার অভিযাত্রায় সংযম থাকিলেই ভাল হইত। হেমচন্দ্রের কল্পনা গভীর গহনতায় অবতরণ করে নাই—অতীন্দ্রিয় রহস্য-লোকেও উঠে নাই—উহা অবাধ মুক্তি পাইয়া দেশ-দেশান্তরে যুগ যুগান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছে। সলিলহিল্লোলে আন্দোলিত পদ্মের মৃণাল তাঁহার কল্পনাকে গ্রীস রোম তুরস্ক ঘুরাইয়া আনিয়াছে। তাঁহার কল্পনার পক্ষে ইহা সামান্য কথা। বৃত্রসংহারে কবি-কল্পনার লীলা অনন্যসাধারণ। কি বিশ্বকর্মার কর্মশালা, কি দধীচির তপোবন, কি বৃত্রাসুরের রাজসভা, কি দেবগণের মন্ত্রণা-পরিষদ্—সর্বত্রই হেমচন্দ্রের কল্পনা অপূর্ব রূপচিত্রসৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে। মাইকেলের কল্পনার চেয়েও যেন হেমচন্দ্রের কল্পনার সবলতা, প্রসার ও সৃজনীশক্তি স্থলে স্থলে বেশি বলিয়া মনে হয়। হেমচন্দ্রের কল্পনা স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতল বহুবার পরিভ্রমণ করিয়াও ক্লান্ত হইয়া পড়ে নাই। কল্পনার লীলায় মাইকেলের মত হেমচন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে Greek Convention অনুসরণ করেন নাই—তিনি স্বকীয় কল্পনার মৌলিক দৃষ্টির উপরই অধিকাংশ স্থলে নির্ভর করিয়াছেন।

কবির বৃত্রসংহার মাইকেলের মেঘনাদবধের মত অনেকটা গ্রীক আদর্শেই গঠিত। ইহাতে ভার্জিল, হোমার, ট্যাসো, দান্তে, পিণ্ডার ও মিল্টনের প্রভাব বিদ্যমান। মেঘনাদবধের তুলনায় এই কাব্যে মিল্টনের প্রভাব অধিকতর।

বিদেশী আদর্শে গঠিত হইলেও এই গ্রন্থে বিজাতীয় ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বিদেশী কবিদের গ্রন্থ হইতে আহৃত উপকরণগুলি কবি দেশীয় ভাবে রূপান্তরিত করিয়াছেন। যাঁহারা বিদেশী সাহিত্য ভাল করিয়া পড়িয়াছেন—তাঁহারাই শুধু ধরিতে পারিবেন। অন্যের কাছে কিছুই বিজাতীয়, বিসদৃশ বা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে না। ইহার প্রধান কারণ, হেমচন্দ্র কোথাও দেশীয় নৈতিক ও পৌরাণিক আদর্শকে খর্ব্ব করেন নাই—বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। হেমচন্দ্র তামসিক পশুবলের বিরাটতা দেখাইয়াও সাত্ত্বিক চিত্তবলের বিরাটতরতা দেখাইতে পারিয়াছেন।

হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারে আমাদের কল্পনাকে মানব-মনের গভীর প্রদেশে লইয়া যাইতে পারেন নাই—কিন্তু তাহাকে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল সমস্ত ঘুরাইতে পারিয়াছেন। কবির ক্ষেত্র অতি বিরাট, কবির কল্পনা বিরাট, কবির রচিত পাত্রগুলির চরিত্র বিরাট, আখ্যানবস্তুর গৌরবও বিরাট। কবি সমস্তের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। স্বতই কবির রচনায় কোমলতার অভাব আছে—আগাগোড়া কঠোরতায় ভরা। এই পাষাণশৈলে ইন্দুমতীটি নির্ঝরিণীর মত। হেমচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে রমণীচরিত্র-গুলিই চমৎকার হইয়াছে। এক শচী ছাড়া, দেবী দানবী সকলেই অন্তরে মানবী। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে বৃত্রাসুর দৈহিক শক্তিতে অতিমানব, ত্যাগের আদর্শ দধীচি আধ্যাত্মিক মহিমায় অতিমানব।

মেঘনাদবধের তুলনায়, অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও বৃত্রসংহারে নাটকীয় ভাব যথেষ্টই আছে। ইহার কতকগুলি দৃশ্যপটও অতি সুন্দর।

বৃত্রসংহার কাব্যখানির অনেকস্থলই শিথিল, বৈচিত্র্যহীন, গদ্যাত্মক, কিন্তু স্থলে স্থলে কবি অপূর্ব্ব সংযমেরও পরিচয় দিয়াছেন। সেই সংযমের ফলে কোন কোন অংশ গাঢ়বন্ধ ও কোন কোন পংক্তি রসঘন হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ কাব্যে যে সুরুচি ও সুনীতির মর্য্যাদা থাকা স্বাভাবিক—কবি তাহা রক্ষা করিয়াছেন। প্রেমলীলা দেখাইতে গেলেই আমাদের দেশের কবিরা তরলতা ও চপলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। হেমচন্দ্র এবিষয়ে সংযম রক্ষা করিয়া তাঁহার বিরাট কল্পনার মর্য্যাদা অক্ষয় রাখিয়াছেন। হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর উচ্চাভিলাষের সুরায় মত্ত—তাহার অন্যান্য আসুরিক বৃত্তি উহাতেই অবলুপ্ত। সে শচীকে ধরিয়া আনিতেছে ঐন্দ্রিলার দাসীত্বের জন্য, অন্য কোন প্রবৃত্তি তাহার মনেও আসিতেছে না। বন্দিনী শচীকে দেখিয়া বৃত্র সসম্ভ্রমে সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে।

তপস্যাই যে একমাত্র সকল সাফল্য ও সকল বিজয়ের নিদান—কবি তাঁহার এই কঠোর প্রকৃতির কাব্যে তাহাই দেখাইয়াছেন। বৃত্র যে স্বর্গ-সিংহাসন পাইয়াছে তাহা তপোবলে। তাহা অপেক্ষা কঠোরতর তপ না করিয়া দেবতারা স্বর্গরাজ্য পুনরধিকার করিতে পারিতেছে না। জগতের সকল সিংহাসনই তপোলভ্য—অনায়াসে লাভ করিলেও তপের দ্বারা তাহাকে অটল করিয়া লইতে হয়। স্বর্গ-রাজ্য-লাভের জন্য স্বর্গাধিকারীকেও নূতন করিয়া তপ করিতে হইয়াছে। আর কঠোর তপস্বীর আত্মত্যাগেই স্বর্গরাজ্যের পুনরধিকার সম্ভব হইয়াছে। আত্মত্যাগের ফল বজ্রসম অমোঘ। দধীচির ন্যায় দুইএকজন মহাপুরুষের অস্থিদানেই যুগে যুগে এক-একটা নির্য্যাতিত লাঞ্ছিত পদাহত জাতি বাঁচিয়া যায়। নির্য্যাতন-লাঞ্ছনাভোগও তপস্যা। কবি কাব্যে এ সত্যকেই প্রকট করিয়াছেন। হেমচন্দ্র কোথাও স্পষ্টভাবে নৈতিক উপদেশ প্রচার করেন নাই। তাঁহার কাব্যের মেরুদণ্ডই নৈতিক ধর্ম্ম।

পৌরাণিক কাব্যের বিচারে দেবতাদের আর্য্য ও দৈত্য-রাক্ষসদের অনার্য্য বলিয়া একটা ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে তাহা প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়। যাহারা বিধাতার অনুগ্রহে, ভাগ্যবলে, জাতিকুলের আনুকূল্যে এবং স্বাভাবিক চরিত্রবলে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন তাঁহারাই দেবতা। আর যাহারা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে অসামান্য শক্তি লাভ করিয়া উদ্ধত, পরপীড়ক ও ভোগসর্ব্বস্ব হইয়া উঠে তাহারাই অসুর বা রাক্ষস। এ জগতে চির দিনই এই অসুরদেরই প্রভুত্ব হয়। কিন্তু এ প্রভুত্ব স্থায়ী হয় না। প্রভুত্বের অন্ধ প্রমত্ততাই তাহাদের ধ্বংসের কারণ হয়। পক্ষান্তরে দেবতাশ্রেণীর মানুষদেরও চৈতন্য হয়, তাহারাও সাধনা করে, তপস্যা করে এবং শেষপর্য্যন্ত নিজেদের প্রভুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। ইহাই সর্ব্বাঙ্গীণ ও সর্ব্বকালীন সত্য। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের বিচারে এই সত্যটিকে মনে রাখিতে হইবে।

এত গুণ থাকা সত্ত্বেও বৃত্রসংহার কেন বর্ত্তমান যুগের পাঠক-সমাজের আদরণীয় হইতেছে না?—কবি তাঁহার বিরাট পরিকল্পনাকে রসমূর্ত্ত করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পান নাই—তিনি যে ভাষায় কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন—তাহা নীরস, গদ্যাত্মক, বৈচিত্র্যহীন ও

অনলঙ্কৃত। বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর কাব্যের রসাদর্শের সহিত রচনাশৈলীও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংযত, সংহত, পারিপাট্যময় গঠন-গৌরব ও কলাশ্রী-সৌষ্ঠব না থাকিলে এযুগে কোন কাব্য সমাদৃত হয় না। কলাকৌশলের চাতুর্য্য ও গঠন-সৌষ্ঠবের অভাবে বৃত্রসংহার বর্ত্তমানযুগে বালুকা-প্রান্তরের মধ্যে পিরামিড হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—যমুনাতীরের তাজমহল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবি যদি এই কাব্যখানিকে নাট্যাকারে লিখিতেন, এমন কি, গদ্যেও লিখিতেন, তাহা হইলে হয়ত ইহার আদর হইত। কাব্যে পাঠক অনেক কিছু চায়, বৃত্রসংহার কাব্য-অভিধা লাভ করিয়া পাঠকের সর্ব্ববিধ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। বৃত্রসংহারে বহু সম্পদ প্রচ্ছন্ন আছে, ইহার অনেক কিছু দিবারও আছে, কিন্তু দানের পাত্রকে আকর্ষণ করিবার শক্তি ইহার নাই।

গত শতাব্দীর কাব্যবিচারকগণ কবিতার মধ্যে রস খুঁজিতেন না, কলাকৌশলের দিকেও দৃষ্টি রাখিতেন না—তাঁহারা কেবল দেখিতেন হৃদয়ের অনুভূতির প্রকাশ হইয়াছে কিনা। আজকালকার কাব্যবিচারে যে অনুভূতিকে কাব্যের উপকরণ স্বরূপ মনে করা হয়—তাহাকেই সেকালে কাব্যের উদ্দিষ্ট বস্তু মনে করা হইত। সেজন্য হেমচন্দ্র একজন মহাকবি আখ্যা পাইয়াছিলেন। কাব্যের যে প্রধান উপকরণ—গভীর অনুভূতি,—হেমচন্দ্রের রচনায় তাহা প্রচুরই ছিল। সেই অনুভূতির প্রকাশ সম্বন্ধে হেমচন্দ্র আদৌ সতর্ক ছিলেন না,—যে কোন ভাষায় যে কোন ভাবে যে কোন ভঙ্গীতে তাহাকে প্রকাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন। তাহাতে পাঠকসাধারণের কোন আপত্তি ছিল না,—পাঠক-সাধারণ অনুভূতির ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ মাত্রকেই কবিতা বলিয়া মনে করিত, এজন্য হেমচন্দ্রের কোন সতর্কতার প্রয়োজনই হয় নাই। তাহা ছাড়া, হেমচন্দ্র গতযুগের জনসাধারণের প্রতিনিধিই ছিলেন—পাঠক-সাধারণের রুচি, প্রকৃতি ও রসবোধের আদর্শের পরিবর্ত্তন বা শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের জন্য লেখনী ধরেন নাই। তাহাদের রুচিপ্রবৃত্তি ইত্যাদির অনুসরণ করিয়াই তিনি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই তিনি লোককান্ত কবি হইতে পারিয়াছিলেন। দেশের লোক নিজেদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি, ভাবচিন্তা ইত্যাদি সমস্তকেই তাঁহার কাব্যে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিত। তাই একজন সমালোচক বলিয়াছেন—

"হেমচন্দ্রের অনুভূতির অভাব ছিল না কিন্তু তিনি জানিতেন না—অনুভূতিকে সরস, শোভন, কলাশৃঙ্খলায় সুগঠন রূপবৈচিত্র্যে, সংযত ভাষায় ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে প্রকাশ দান করিতে না পারিলে রসসাহিত্য হইয়া উঠে না। অনুভূতির উচ্ছ্বাসকেও তিনি সংযত করিবার চেষ্টা করেন নাই—ছন্দ, মিল, পদবিন্যাস, অলঙ্কারপ্রয়োগ কোনটার দিকেই সতর্ক হন নাই—কাব্যের বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব সম্পাদনের যে প্রয়োজন আছে ইহা তিনি নিজেও জানিতেন না—তখনকার বিচারপদ্ধতি হইতেও তিনি পান নাই—তখনকার সমালোচকরাও তাহা বলে নাই।"

আর একটি কথা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। রচনাকে রসঘন করিবারই কথা,—

রচনার মধ্যেই আপনার মূল বক্তব্যের টীকা দিবার কথা নহে। তখনকার সাধারণ পাঠক কবিতার মধ্যেই কবিতার বিশদ ব্যাখ্যা পাইয়া খুশী হইত—এবং সাধুবাদ দিত। সেই সাধুবাদে উৎসাহিত হইয়া হেমচন্দ্র রচনারীতির পরিবর্ত্তন করেন নাই। হেমচন্দ্র জনসাধারণের জন্য লিখিয়াছেন, রসজ্ঞ সমাজের জন্য লেখেন নাই। তাই তাঁহার কাব্য গত যুগের জনসাধারণকে প্রীতিদান করিলেও সম্ভবতঃ নিত্যকালের বস্তু হইয়া থাকিবে না। জনসাধারণ পরিবর্ত্তনশীল—তাই ভয় হয়, আগামী যুগের জনসাধারণ হয়ত ঐ কাব্যের কোন আদরই করিবে না।

হেমচন্দ্রের ভাষায় ওজস্বিতা ছিল,—দেশানুরাগমূলক কবিতাগুলিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার কল্পনার যে উদারতা ও সবলতা ছিল তাহা কেবল তাঁহার 'বৃত্রসংহার' নয়, 'দশমহাবিদ্যাতেও' তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ চিন্তাতরঙ্গিণী। ইহার মধ্যে কবিত্বের কোন বালাই নাই। দ্বিতীয় কাব্য—বীরবাহু-কাব্য। ইহা একজন দেশভক্ত বীরের জীবন-কাহিনী। উপাখ্যানটি কাল্পনিক—রাজপুত বীর-গাথার অনুকরণে রচিত। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম দেশভক্তি প্রচার করেন। ইহার রচনা-ভঙ্গী মঙ্গলকাব্যকারদের অনুসৃতি।

হেমচন্দ্রের একখানি কাব্যের নাম আশা-কানন। ইহা একখানি গূঢ়াঙ্গরূপক (allegorical) কাব্য। হেমচন্দ্র ভূমিকায় বলিয়াছেন—"মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকল প্রত্যক্ষীভূত করাই ইহার উদ্দেশ্য।" কবির উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। রসসৃষ্টি কবির উদ্দিষ্ট ছিল না—কাজেই ইহা সৎকাব্যের মর্য্যাদা লাভ করে নাই। ইংরাজিতে এইরূপ গূঢ়াঙ্গরূপক রচনা ব্যানিয়ানের Pilgrim's Progress।

অক্ষয়কুমার দত্ত স্বপ্নদর্শন বলিয়া এই ধরণের গদ্য নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে হেমচন্দ্র এই শ্রেণীর কাব্য প্রথম লেখেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই শ্রেণীর রচনা নাট্যাকারে অপূর্ব্ব রসরূপ ধরিয়াছে।

হেমচন্দ্রের আর একখানি কাব্য ছায়াময়ী। এই কাব্যখানি ইতালীর কবি দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়া নামক কাব্যের অনুকরণে রচিত। বলা বাহুল্য, ইহা ঐ গ্রন্থের অনুবাদ নয়। দান্তে স্বর্গ, নরক, পরলোক ইত্যাদির বর্ণনা করিয়াছেন—হেমচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন কিন্তু খ্রীষ্টীয় ভাবে নয়—হিন্দু ভাবে। হেমচন্দ্রের কল্পনা যে অপার্থিব কল্পনা-সৃষ্ট লোক-লোকান্তরে পরিভ্রমণ করিতে ভালবাসিত, এই কাব্যে তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

হেমচন্দ্রের আর একখানি কবিতাপুস্তক চিত্ত-বিকাশ। কবি যখন শেষ জীবনে দৃষ্টি-শক্তি হারাইয়া সন্তানতন্ত্রশাসনে দারুণ দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন—সেই সময়ে তিনি এই কবিতাগুলি রচনা করেন। এই কবিতাগুলিতে কবির হৃদয়ের তৎকালীন বেদনা রূপ লাভ করিয়াছে। কবিতাগুলি প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ্যরূপে চলে।

আর একখানি গ্রন্থ দশমহাবিদ্যা। ইহা একটি ক্ষুদ্র কাব্য, কিন্তু এই কাব্যে হেমচন্দ্রের কল্পনার বিশালতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমন্বয় হইয়াছে। ইহাতে হেমচন্দ্র

প্রচলিত ছন্দ ত্যাগ করিয়া হ্রস্বদীর্ঘমাত্রায় প্রাকৃত ভাষার ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর ছন্দোলোকে একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রসের দিক হইতে ইহার প্রথম দুইটি কবিতা চমৎকার।

কৈলাস অম্বরময় তারাসূর্য্য অম্বুদয় ক্ষণকালে নিখিল সকল।
তমশ্ছন্ন দিগাকাশ কেবলি করে উল্লাস নীলকণ্ঠের কণ্ঠের গরল।

ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর কবির উপযুক্ত।

ইহা ছাড়া, যদি দশমহাবিদ্যার ব্যঙ্গার্থ কল্পনা করা যায় তাহা হইলে এ কাব্যের মর্য্যাদা ঢের বাড়িয়া যায়।

সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন—চরাচর শঙ্করের সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল। ইহা অবিদ্যার মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাশক্তির কি মৃত্যু আছে? শক্তি রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে—কখনও ধ্বংস পায় না। সে শক্তি কখনও রুদ্ররূপে, কখনও শান্তরূপে প্রকাশ পায়। যে শক্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ধ্বংসসাধন করে—সেই শক্তিই নিয়ন্ত্রিত হইয়া জীবের মঙ্গল সাধন করে—তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া জড়ের স্থানাবরোধকতা, ঘনতাব রূপে সংহত হইয়া রহে।

[ইউরোপীয় বিজ্ঞানের Conservation and transformation of Energy, Kinetic, Potential ইত্যাদি ভেদে Energyর বিভিন্ন রূপ ইত্যাদির কথা স্মর্ত্তব্য।]

দশমহাবিদ্যার এক একটি বিদ্যা মহাশক্তির এক একটি রূপেরই রূপক মাত্র। গীতার বিশ্বরূপ-দর্শনও এই দশমহাবিদ্যার প্রকটন একই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বলা যাইতে পারে। দুই-ই শোক-মোহের মায়া বা অবিদ্যার জাল ছেদনের জন্য। হেমচন্দ্র সচেতন ভাবে এই সত্যটিকে যদি ফুটাইতেন তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হইত।

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলীর' কবিতাগুলি আজিও সমাদৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও এই কবিতাগুলিই (মাইকেলের ২।৪ টি কবিতা বাদ দিলে) বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন ধারার সূত্রপাত করিয়াছে। এই শ্রেণীর গীতিকবিতা পূর্ব্বে কেহই লেখেন নাই। ছন্দে বাগ্মিতা প্রকাশ হইলেও ভারত-ভিক্ষার ন্যায় কবিতা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম। তরুণ রবীন্দ্রনাথের রচনায় হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর প্রভাব লক্ষিত হয়। যাহাকে খাঁটি লিরিক বলে হয়ত এগুলি তাহা নয়—মুক্তা না হইলেও এগুলি শুক্তি বটে! এইগুলি হইতেই সাহিত্যের বঙ্গোপসাগরে মুক্তা ফলিয়াছে।

হেমচন্দ্রের কল্পনার যেরূপ মহিমা ছিল—তাঁহার ভাষা তদুপযোগিনী ছিল না। সম্পূর্ণ ভাবদ্যোতক শব্দের জন্য তিনি পরিশ্রমও করেন নাই। পাঠক-সাধারণের পক্ষ হইতে সে দাবি থাকিলে হয়ত তাহা করিতেন। পাঠক-গোষ্ঠীর পক্ষ হইতে সে দাবিও ছিলনা।

বক্তব্যকে কি কৌশলে সাজাইলে কিরূপ কলাশ্রী-মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিলে, কিরূপ আলঙ্কারিক সৌষ্ঠবের সৃষ্টি করিতে পারিলে, ছন্দোবন্ধের কিরূপ প্রসাধন করিলে বক্তব্য শুধু জোরালো নয়, যোরালো ও রসালো হয়—তাহা তিনি জানিতেন না। স্থলে স্থলে ভাবাবেগের সংযমেরও অভাব হইয়াছে। ছন্দোমিলের পারিপাট্য সাধনে তিনি কোন যত্নই করেন নাই।

Shelleyর Skylark কবিতার তিনি একটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদেই ভাবের সহিত ছন্দের সামঞ্জস্য সাধনে তাঁহার অক্ষমতা প্রমাণিত হইয়াছে। শেলীর কবিতার অপূর্ব্ব প্রকাশ-ভঙ্গীর কৃতিত্ব তিনি যদি উপলব্ধি করিতেন, তাহা হইলে হয় তাহার অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়া শেলীর প্রতি অবিচার করিতেন না, নয়ত বঙ্গভাষায় একটি চমৎকার কবিতা আমরা পাইতে পারিতাম। প্রকাশ-ভঙ্গীর অপূর্ব্বতাই যে কাব্যের অধিকাংশ,—ভাবের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য যতই থাকুক, তাহার প্রকাশ যদি কলাশ্রীসম্মত না হয় তাহা হইলে তাহাকে যে কোন ছন্দে ও ভাষায় প্রকাশ দান করিলেই যে কাব্য হয় না, একথা তিনি উপলব্ধি করিতেন না। অনুভূতি যদি গভীর, সত্য ও অকপট হয় তাহা হইলে তাহা স্বতই একটা সরস ভঙ্গীর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রে যে হেমচন্দ্রের রচনা কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কারণ উহাই। ইহা কবির অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া গিয়াছে। বরং কবি যেখানে সম্পূর্ণ সজ্ঞান—সেখানে কাব্য হীনাঙ্গ ও অপকৃষ্ট।

হেমচন্দ্র মিশ্র লঘু ত্রিপদীর ছন্দে অনেক সময় ৪টি ৬টি পর্য্যন্ত অন্তরা যোগ করিতেন—সঙ্গীতের দিক হইতে ইহা যে অসঙ্গত তাহা তিনি বুঝিতেন না। দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ যাহা ভারতচন্দ্র—এমন কি রঙ্গলালের রচনাতেও অনবদ্যরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে—হেমচন্দ্রের রচনায় তাহা দীর্ঘতর হইয়া মাধুর্য্য হারাইয়াছে।

লঘুত্রিপদী ছন্দও হেমচন্দ্রের হাতে যুক্তাক্ষর বাহুল্যে ও পদবিন্যাসের দোষে শ্রুতিমধুর হয় নাই, অথচ তাঁহার সামসময়িক কবি বিহারীলালের কাব্যে তাহা চমৎকার জমিয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের বলিষ্ঠতা ও কৌশল কোথায় তাহা হেমচন্দ্র ধরিতে পারেন নাই।

কহিলা "হে দেবদূত সুসন্দেশবহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গল-দায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন যেখানে
কহগে তাদেরে দূত এই সুবারতা।
কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইল জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তারে হইলে সাক্ষাৎ
করিলা বিদিত বৃত্র-বিনাশ যেরূপে।

ইহা মিলহীন পয়ার ছাড়া কিছুই নয়—মিলহারা হইয়া ইহা পয়ার হইতেও নিকৃষ্টতর। মাইকেলের ছন্দের দুর্ব্বলতাটুকু হেমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন—সবলতা এড়াইয়া গিয়াছেন। 'সুসন্দেশবহ' 'সুবারতা' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ দুর্ব্বলতা মাত্র। কেবল বৃত্র সংহারের শেষ দৃশ্যটির ছন্দোগৌরব মাইকেলের মতই অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

মিলের দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা হেমচন্দ্রের আর একটি দোষ। হেমচন্দ্র মুহুর্মুহুঃ ক্রিয়া-বিভক্তিরই মিল দিতেন। ক্রিয়া বিভক্তির মিল—মিলই নয়।

নবীনচন্দ্র

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেবতার মহিমা প্রচারই ছিল প্রধান উপজীব্য। দেবতার মহিমা প্রচার করিতে গিয়া প্রাচীন কবিগণ মনুষ্যত্বের মহিমা খর্ব্ব করিয়াছেন। দেবতার মহিমা প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাদের চরিত্রে কবিরা মানবতা আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মানবতার আদর্শ ছিল খর্ব্ব, তাহার ফলে যাঁহাদের মহিমা তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও খর্ব্ব করিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যে মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব দুইএর আদর্শই খর্ব্ব হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে এক গোরক্ষনাথ ও চাঁদসদাগরে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই। গোরক্ষনাথ সিদ্ধপুরুষ, বৌদ্ধতন্ত্রের সাধক। চাঁদসদাগর হিন্দু মহাপুরুষ। এই চাঁদ সদাগরের পূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাও মনসার ভাসানের কবি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেন নাই।

আমাদের দেশের সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাও কাব্যে প্রধান স্থান লাভ করিল। মাইকেলের মেঘনাদবধেই আমরা এই আদর্শ প্রথম লাভ করিলাম। মাইকেলের রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস নয়, মানুষই। মাইকেলের মনুষ্যত্বের আদর্শের সহিত অবশ্য আমাদের ভারতীয় আদর্শের মিল হইবে না—পরবর্ত্তী কবিদের আদর্শেরও মিল হইবে না। মাইকেল পশুবলে পরাক্রান্ত, তেজস্বী, মৃত্যুভয়জিৎ বীরপুরুষকেই আদর্শ মানুষ মনে করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র মাইকেলের কল্পিত আদর্শকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন নাই। তাই তাঁহার বৃত্র দানবই থাকিয়া গিয়াছে—ইন্দ্র দেবতাই থাকিয়া গিয়াছে। দধীচিকেই আদর্শ মানুষ রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আত্মত্যাগী মহাতপস্বী দধীচির কাছে, ইন্দ্র ও বৃত্র দুইই ম্লান। ইহা ছাড়া, হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারের চরিত্রাঙ্কনে আদর্শ নারীত্বেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে মনুষ্যত্বের উচ্চাদর্শ নানাভাবে উপন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অনুশীলন মাত্র। ঐতিহাসিক জগতে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ না পাইয়া তিনি মহাভারত অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং উপন্যাসের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া আদর্শ মহাপুরুষের মহিমাকীর্ত্তনের জন্য তিনি প্রবন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকেই মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বঙ্কিম গদ্যে—নবীনচন্দ্র পদ্যে। নবীনচন্দ্রের কাব্যে কেবল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বকে জীবনধর্ম্মের নানা বৈচিত্র্য, নানা লীলারহস্য ও জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের সাধন-পথের মধ্য দিয়া ক্রমোন্মেষের স্তরে স্তরে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই নবীনচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান কবি-কর্ম্ম। এই অবদানে নবীনচন্দ্র এক হিসাবে মাইকেল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন জনকেই অতিক্রম করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র-প্রতিষ্ঠায় কল্পনার অবসর নাই। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে

যেভাবে পাইয়াছেন—তিনি সেই ভাবেই উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি কেবল পরস্পর-বিসংবাদী তথ্যগুলির মধ্যে প্রতিকূল তথ্যগুলিকে পরিহার করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের উচ্চাদর্শের সহিত অসমঞ্জস তথ্যগুলিকেও অবিশ্বাস্য বলিয়া তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কলাকোবিদ স্রষ্টা নহেন—যুক্তি-সমাশ্রয়ী বিচারক ও সমালোচক। নবীনচন্দ্র ভক্তকবি ও রসস্রষ্টা—তিনি কেবল পৌরাণিক তথ্যের উপরই নির্ভর করেন নাই—তিনি কল্পনার প্রচুর সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন এবং 'আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া' শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন। নবীনচন্দ্রকে বেশি শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয় নাই। নবীনচন্দ্র ভক্তির দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র কাব্যে তিনি বলিয়াছেন—

জ্ঞান পদে পদে পতঙ্গের মত যেখানে যাইতে চায়,
ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।

নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র রৈবতক প্রভাস' তিনখানি কাব্য মিলাইয়া একখানি মহাকাব্য। মহাকাব্যের বাঁধাধরা নিয়মগুলির সহিত মেঘনাদবধের মিল হয় না—নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-কাব্যেরও মিল হয়না—তবু এইগুলিকে আমরা মহাকাব্য না হউক মহাকবিতা বলিতে পারি। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকাব্যে মহাকাব্যের একটা লক্ষণ অন্ততঃ অবিসংবাদিত রূপে বিদ্যমান—একটি বিরাট মহাপুরুষের জীবন এই কাব্যের উপজীব্য। কেবল তাহাই নয়—এই কাব্যের সহিত একটি বিরাট দেশের জাতীয় জীবনেরও কিছু সংযোগ আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ন্যায় এই কাব্যেও গীতিধর্ম (Lyrical-element) প্রবল। কিন্তু গীতিধর্মই এই মহাকবিতার সর্বস্ব নয়—ইহাতে জাতীয় দ্বন্দ্ব সমস্যার স্থান হইয়াছে—রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি এমনকি দাম্পত্যনীতির অনেক বস্তু ইহার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছে। ইহাতে অসংহত, ভেদবুদ্ধির দ্বারা উপদ্রুত, সদা-বিবদমান দেশে একটা মহাজাতি-গঠনের পরিকল্পনা আছে। কবি এখানে মহাভারতের বহু তথ্যের বর্ত্তমান যুগোপযোগী অধিব্যাখ্যান (Interpretation) দিয়াছেন, আবার বর্ত্তমান যুগের বহু সমস্যাকেও তিনি কোন-না কোন পৌরাণিক ক্ষীণসূত্র অবলম্বন করিয়া মহাভারতীয় যুগের পরিবেষ্টনীতে সমারোপিত করিয়াছেন।

এজন্য তিনি কেবল পৌরাণিক চরিত্রগুলি লইয়াই তুষ্ট হ'ন নাই--বর্ত্তমান যুগের মনো-ভূমিতে রচিত একাধিক নূতন নূতন চরিত্র তাঁহার কাব্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে নবভাবে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন। যে সকল দ্বন্দ্বের দ্বারা নবীনচন্দ্রের কাব্যের আখ্যানবস্তু পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে সে সকল দ্বন্দ্ব নবীনচন্দ্রের মনগড়া নয়—সেগুলি কেবল ভারতীয় নয়—সার্ব্বভৌম, সর্ব্বকালীন। আর্য্য অনার্য্যের দ্বন্দ্বই হউক, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রের দ্বন্দ্বই হউক, সামাজিক বা গার্হস্থ্য সংস্কারের সহিত জীবন সত্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বই হউক, ভক্তিমার্গের সহিত জ্ঞানমার্গের দ্বন্দ্বই হউক, অহিংসাত্মক ব্রহ্ম ধর্ম্মের সহিত হিংসাত্মক শৌর্য্য-ধর্ম্মেরই দ্বন্দ্ব হউক, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সহিত সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মের দ্বন্দ্বই হউক, সুকুমার হৃদয়-বৃত্তির সহিত রূঢ় কর্ত্তব্যবোধের দ্বন্দ্বই হউক—সকল দ্বন্দ্বেরই সার্ব্বজনীনতা আছে। দ্বন্দ্বসংঘর্ষের এই মানস-কুরুক্ষেত্রই নবীনচন্দ্রের

কাব্যকে মহাকাব্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সত্যের সহিত স্বপ্নের যে দ্বন্দ্ব কবি দেখাইয়াছেন, তাহাতে গীতিকাব্যের বিশ্বজনীন আবেদন দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়াবেগের আতিশয্য একদিকে কবির কাব্যে কলাচাতুর্য্যের হানিকর হইয়াছে—কিন্তু অন্যদিকে ইহা বহু দ্বন্দ্বসমস্যা ও তত্ত্বতথ্যের কঙ্কাল-মালাকে রসলাবণ্যে আচ্ছন্ন ও মণ্ডিত করিয়াছে।

জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, রাজ্যভেদ, সাম্প্রদায়িক ভেদ ইত্যাদি বহু ভেদে খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অধঃপতিত জাতির জন্য কবির উদ্বেগের সীমা ছিল না। কবি শুধু এই উদ্বেগের প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হ'ন নাই। ইহার কারণ নির্দ্দেশ ও সমাধান সম্পর্কে যে উৎকণ্ঠা তিনি অনুভব করিয়াছেন তাহা তাঁহার কাব্যে উচ্ছ্বসিত বাগ্মিতার রূপ ধরিয়াছে। কাব্যের দিক হইতে ইহা ঐশ্বর্য্য বাড়ায় নাই—কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি হতাশ্বাস জাতিকে যে আশার বাণী শুনাইয়াছেন—তাহা কাব্যের দিক হইতেও ব্যর্থ হয় নাই!

রৈবতক হইতে প্রভাসের শেষপর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের যে সুসঙ্গত ধারাবাহিকতা আছে—তাহাই তিনখানি কাব্যকে একটি অখণ্ড কাব্যে পরিণত করিয়াছে। মানবজীবনের চিরন্তন ধারার সঙ্গে ইহা অভিন্ন। রৈবতকে লীলার জীবন—কুরুক্ষেত্রে কর্ম্মজীবন—দারুণ জীবন-সংগ্রাম—প্রভাসে বৈরাগ্যের জীবন। অলঙ্কার-শাস্ত্রে যাহাকে শান্তরস বলে—প্রভাসে তাহারই অভিব্যক্ত। প্রভাসের উৎসবেও বৈরাগ্য, ব্যসনেও বৈরাগ্য। শান্তরস সকল রসের শেষ পরিণতি। রৈবতক কুরুক্ষেত্রের নানা রসের লীলা-বৈচিত্র্য, প্রভাসের সমুদ্রতীরের মহামহিমময় আবেষ্টনীর মধ্যে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। ভক্তবৈষ্ণব নবীনচন্দ্র জ্ঞানকর্ম্মের চরম পরিণতি দেখাইয়াছেন—প্রেমে। প্রভাসের শেষ আট পংক্তি—

> পাইয়াছি শোকে শান্তি পাইয়াছি দুঃখে সুখ।
> প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র, প্রেমে ভরিয়াছে বুক।
> ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর।
> বহিয়াছি এজীবন আশার ও নিরাশার।
> গীত শেষ অপরাহ্নে সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে,
> বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাসতীরে,
> সমুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ পদতরী,
> এই তীরে সন্ধ্যা, উষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।

মাইকেল ও হেমচন্দ্রের কল্পনা আবাস্তব স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল পরিভ্রমণ করিয়াছে—নবীনচন্দ্রের কল্পনা এই বাস্তব পৃথিবীতেই বিচরণ করিয়াছে। সেজন্য নবীনচন্দ্রের কাব্যে আমরা বিরাট নদ-নদী ও সমুদ্র, পর্ব্বত, অরণ্য, রণক্ষেত্রের চমৎকার বর্ণনা পাই। সমুদ্রের অসীমা, মহিমা ও নীলিমাকে নবীনচন্দ্র রস-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—রস-দৃষ্টিতে দেখিয়া প্রকৃতির মহিমা ও মাধুর্য্য উপলব্ধি বিষয়ে নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অগ্রদূত।

শেষ পর্য্যন্ত এই তিনখানি কাব্য পড়িলে মনে হয়—ইহা কাব্য—না ধর্ম্মপুস্তক?

বলা বাহুল্য, ইহা ধর্ম্মপুস্তক ও কাব্য দুই-ই। মাইকেল বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যকে ধর্ম্মের আশ্রয় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রজাঙ্গনার সঙ্গেও ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন ধারা হেমচন্দ্র একেবারে ভুলিতে পারেন নাই—দশমহাবিদ্যা লিখিয়া ধারা রক্ষা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র প্রথমে ভাবিয়াছিলেন—ধর্ম্মকে এড়াইয়া কাব্য রচনা করিবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই আত্মস্থ হইলেন। বাঙ্গলার নিজস্ব ধারা লুপ্ত হইবার নয়—অহিন্দু মাইকেল কবিধর্মকেই প্রাধান্য দিয়া তাহাতে বাধা দিলেন, কিন্তু তাহার বিলোপ সাধন করিতে পারিলেন না। নবীনচন্দ্র এক হিসাবে প্রকারান্তরে মঙ্গলকাব্যের ধারারই কবি। বর্ত্তমান যুগে ধারার রূপ বদল হইয়াছে—নবীনচন্দ্রের দেবতা অবাস্তব ভক্ত-বাঞ্ছাপূরণ-কারী পূজা-লুব্ধ দেবতা নয়—বাস্তব মানবই মহামানব হইয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাদীক্ষা ও সাহিত্যের আদর্শ বঙ্গের চিরন্তন ধারার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-কাব্যের পরই উল্লেখযোগ্য রচনা, পলাশীর যুদ্ধ। ঐতিহাসিক কাব্য ও ঐতিহাসিক নাট্য রচনার পদ্ধতি পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস লইয়া কাব্য-রচনা ইহাই প্রথম ও শেষ। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গলার ইতিহাস লইয়া বহু নাট্য রচিত হইয়াছে—কিন্তু কোন কাব্য রচিত হয় নাই। রাজপুতনার ইতিহাসের সহিত আমাদের প্রাণের যোগ নাই—বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গেই অবশ্য সে যোগ আমাদের আছে। বিশেষতঃ পলাশীর যুদ্ধের বিষয়বস্তু বাঙলার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ইতিহাস। ইহার ফলে স্বদেশের প্রতি কবির মনের গভীর প্রীতি এই কাব্যে জ্বলন্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকের মর্ম্মও ইহা সহজে স্পর্শ করিয়াছে। এক সময়ে নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি পলাশীর যুদ্ধের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। আজিও অনেকের মতে ইহাই নবীনচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তি। ইদানীং নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কাব্যের উপরই নির্ভর করিয়া আছে—পলাশীর যুদ্ধ এখন অনেকটা উপেক্ষিত। অন্ধকার কারাকক্ষে যে দুর্ভাগ্য যুবকের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতির স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই দুর্ভাগ্য যুবকের প্রতি গভীর দরদ কবির অগাধ দেশ-প্রীতির সহিত মিলিত হইয়া পলাশীর যুদ্ধকে কারুণ্যময় সরস কাব্যে পরিণত হইয়াছে।

অন্যান্য কাব্যের তুলনায় পলাশীর যুদ্ধে নবীনচন্দ্রের ভাবাবেগের সংযম কতকটা দৃষ্ট হয়। এই সংযমের মূলে নবীনচন্দ্রের কর্ম্মজীবন কতটা দায়ী তাহা বলা যায় না। নবীনচন্দ্রের দেশ-প্রেমজাত বেদনা সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত, স্থলে স্থলে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির বেদনা দুই দিক হইতে গভীর হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তাঁহার স্বজাতির ভীরুতা, নীচতা, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা—অন্যদিকে অকারণে দেশের স্বাধীনতা-লোপ। বাঙ্গালী হিন্দু-হিন্দুমুসলমানের দেশদ্রোহী হীন-চরিত্র উদ্ঘাটিত করিতে কবি যে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছেন,—একমাত্র মোহনলালকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়াছেন। 'মোহনলাল' কবির গভীর দুঃখে সান্ত্বনাময়ী সৃষ্টি। এমনও বলা যাইতে পারে—নবীনচন্দ্রের নিজেরই ব্যথিত অন্তরাত্মা মোহনলালে রূপ ধরিয়াছে। সিরাজের

শেষচিত্র কবি অন্তরের বেদনাঘন মসীতে অঙ্কিত করিয়াছেন—সিরাজের অঙ্গের প্রত্যেক আঘাতটি যেন দেশপ্রাণ কবি নিজের অঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের জন্মভূমি চট্টগ্রাম। বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রামই Meet Nurse for a poetic child, গিরি, অরণ্য, সমুদ্র ও 'নদী জপমালাধৃত প্রান্তরের' অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত এই ভূখণ্ড। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক প্রভাব কি নবীনচন্দ্রের জীবনে কোন কাজই করে নাই? কবির রঙ্গমতী পড়িলে মনে হয় তাহা ব্যর্থ হয় নাই। এমন চমৎকার দেশকে ভাল না বাসাই অস্বাভাবিক। এমন চমৎকার দেশ যদি পরপদ-লাঞ্ছিত, দৈন্য-কুসংস্কারে নিপীড়িত হয়—তবে তাহার কল্যাণসাধনের জন্য দেশের সন্তানের আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় কি? রঙ্গমতীর লীলাস্থল এই চট্টগ্রাম, এবং মনে হয় কবি নিজেই যেন ইহার নায়করূপে দেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতেছেন। এই কাব্যে আমরা চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যকে পরিবেষ্টনীরূপে পাইতেছি। কাব্যহিসাবে রঙ্গমতী বঙ্গসাহিত্যে সমাদর পায় নাই, কিন্তু ইহার সহিত নবীনচন্দ্রের কবি-জীবনের ক্রমোন্মেষের গভীর সম্বন্ধ আছে। জন্মক্ষেত্রে নদী শীর্ণ ও সংকীর্ণ থাকে, যত মহাসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহার পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং সাগর-সঙ্গমের উপযোগী হয়। রঙ্গমতীর অঙ্গবাহিনী খরস্রোতা অথচ সংকীর্ণ দেশপ্রীতি যতই মহাভারতের মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ততই তাহা উদার, বিপুল, বিশাল অথচ প্রশান্ত, ধীর ও প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য কাব্যে ইংরাজি কবিদের প্রভাব বেশি নাই। অন্যান্য কাব্যে ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা, ভাবচিন্তার আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রচুর আছে। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধে বাইরণের প্রভাব খুব বেশি ছিল বলিয়া নবীনচন্দ্রকে বাঙ্গালার বাইরণ বলা হইত। পলাশীর যুদ্ধ নবীনচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত নবীনচন্দ্রের কাব্যে যত ধর্ম্মভাবের সমাবেশ হইতে লাগিল—বাইরণের প্রভাব ততই বিদূরিত হইতে লাগিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস্ ইত্যাদি কবির প্রভাব ধরা যায় না। হোমার, দান্তে, মিল্টন ইত্যাদি মহাকবিদের প্রভাব হইতেও তিনি মুক্ত ছিলেন।

সংস্কৃত কাব্যনাট্যের কোন প্রভাব বা বৈষ্ণব কবিদের কোন প্রভাবও নবীনচন্দ্রের কাব্যে নাই। নবীনচন্দ্র মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ ও গীতা মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল গীতার অনুবাদই করেন নাই—গীতার বাণী তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কাব্যেও ওতপ্রোত রূপে অনুস্যূত করিয়াছেন। সুভদ্রার মুখ দিয়া তিনি গীতার সার তত্ত্বটির সরস অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন।

কেবল মাইকেলের ছন্দ নয়, মাইকেলের কাব্যে যেটুকু দেশীয় ভাবের অভিব্যক্তি, নবীনচন্দ্র সেটুকুকে অনুসরণ করিতে ভুলেন নাই। দুর্ব্বাসার উদ্দেশে ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে জরৎকারুর আবেদন দুইটি মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যে অনায়াসে স্থান পাইতে পারিত। তবে মাইকেলের চরিত্র সৃষ্টি ও মনুষ্যত্বের আদর্শকে তিনি অনুকরণীয় মনে করেন নাই।

বীরবল একবার বলিয়াছিলেন—কবিরাই ইচ্ছা করিলে সরস ভঙ্গীতে গদ্য লিখিতে

প্যারেন। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' পড়িলে একথা সত্য মনে হয়। কবির জীবনী এমন কিছু বৈচিত্র্যময় নয় যে কৌতূহল বশতঃ কেহ তাঁহার জীবনী পড়িবে। 'আমার জীবন' কবির ডেপুটি-জীবনের ইতিহাস মাত্র। কিন্তু ইহার রচনাভঙ্গী এমনি সরস যে ইহা উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন' রচনার আগে ভানুমতী লিখিয়াছিলেন। জাতি, দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য কবির উৎকণ্ঠার ফলে ভানুমতীর জন্ম। ইহাকে কথাসাহিত্যের রূপদান করিলেও ইহা উপন্যাস নয়—ইহা একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। ইহাতে দেশ ও সমাজের নানা সমস্যা লইয়া কবি আলোচনা করিয়াছেন। উপন্যাসের মর্য্যাদা ইহা লাভ করে নাই, কিন্তু ইহার রচনাভঙ্গীও সরস।

নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতি দেশের নিসর্গকে অবলম্বন করে নাই, অতীতের স্বপ্নকেও আশ্রয় করে নাই। নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় দেশমাতার দেবীমূর্ত্তি কল্পনা করেন নাই—হেমচন্দ্র রঙ্গলালের মত অতীতের স্বপ্নের মধ্য দিয়া দেশপ্রীতি প্রচার করেন নাই—রবীন্দ্রনাথের মত দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া দেশভক্তিকে বাণীরূপ দেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের দিকে। তাঁহার দেশপ্রীতি ফুটিয়াছে মানবতার মধ্য দিয়া। পলাশীর যুদ্ধে হতভাগ্য নবাবের প্রতি গভীর সহানুভূতির ও মোহনলালের আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া তাঁহার দেশপ্রীতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকাব্যে তিনি মহাভারত হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে ঐ কাব্যের প্রধান চরিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া ফুটিয়াছে অধঃপতিত স্বজাতির জন্য গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন এই ভ্রষ্টচ্ছন্ন, শতধা বিভক্ত, ভেদবুদ্ধিতে ছত্রভঙ্গ জাতির মধ্যে যদি একজাতীয়তা, এক ধর্ম্ম, এক মহান্ জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হয়—এজাতি যদি এক মহাধর্ম্ম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও অধিগত না হয়—তাহা হইলে এজাতির নিস্তার নাই। শ্রীকৃষ্ণের মহামনুষ্যত্ব ও পূর্ণাদর্শ পরিকল্পনার মূলে—এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় দ্বন্দ্ব, আর্য্য-অনার্য্য দ্বন্দ্ব, কুরুপাঞ্চাল বৃষ্ণিকুলের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির অবতারণার মূলে নবীনচন্দ্রের মহাজাতিগঠনের স্বপ্নই মুখ্যতঃ বিদ্যমান। এই স্বপ্ন,—স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য এই উদ্বেগ—কবির কাব্যগুলিতে ফুটিয়াছে। কবি ইহার বেশি কিছু করিতে পারেন না। ভবিষ্যতের দিকে আশার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার উৎকণ্ঠায় আশ্বস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একজন মহাপুরুষের পুনরাবির্ভাব ছাড়া এই হতভাগ্য জাতির মুক্তি নাই। অমিতাভের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—"আবার ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। কাল পূর্ণ, এখন সেই মহাপ্রতিজ্ঞা আমাদের একমাত্র আশা—"সম্ভবামি যুগে যুগে।"

নবীনচন্দ্রের দেশানুরাগ আর একটি রূপ ধরিয়াছে স্বজাতির সমক্ষে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রতিষ্ঠায়। নবীনচন্দ্র বুঝিতেন—মানুষের আদর্শ দেবতা নয়, মানুষের আদর্শ মানুষই। এইরূপ কতকগুলি আদর্শ লইয়া তিনি একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। মহাপুরুষগণ মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য—বিপথে চালিত

মানবজাতিকে পথ দেখাইবার জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের বাণী, আদর্শ ও মন্ত্রের প্রচারকেই তিনি পরম দেশসেবা বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণ নয়, খৃষ্ট, বুদ্ধ ও চৈতন্যের জীবন ও বাণী লইয়াও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র ইঁহাদের কাহাকেও দেবতা বানাইয়া পূজার উপদেশ দেন নাই—ইঁহাদিগকে আদর্শ মানুষরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন এবং ইঁহাদের আদর্শ ও বাণীই মানুষ অনুসরণ করুক, এই অভিপ্রায়ই তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে বিদ্যমান আছে। কবি যদি ইঁহাদিগকে দেবতা বানাইতেন—তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় একটিতেই পরিচ্ছিন্ন হইত। অমিতাভের ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন—"পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্লাধিক অতি মানুষিক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মনুষিক ভাবাপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছি। এই অবতার দিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতি লাভ করে। তাঁহাদিগকে আমাদের অধিক আপনার বলিয়া বোধ হয়।" ইহা হইতেই কবির অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইবে।

নবীনচন্দ্র ধর্ম্ম জগতের এমন একটি উচ্চস্তর হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মমতবাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন যেখান হইতে তিনি সকল ধর্ম্মের মূলেই একটি পরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেজন্য তিনি বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য ও খৃষ্টের বাণীর মধ্যে কোন বিসংবাদ দেখিতে পান নাই।

মাইকেল-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মর্য্যাদা হেমচন্দ্র বুঝেন নাই। তাঁহার হাতে অমিত্রাক্ষর অধিকাংশক্ষেত্রে অনেকটা মিলহীন পয়ারে পরিণত হইয়াছে। নবীনচন্দ্র অনেকটা মাইকেলের অনুসরণ করিয়াছেন—

কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়
সিদ্ধকাম মহাশিশু। ক্ষত-কলেবর
রক্তজবা-সমাবৃত, সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত
সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা। মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত।

* * *

নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অন্তর
গাহিতেছে কৃষ্ণনাম। মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—"অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!!
আমরা বীরের জাতি বীরধর্ম্ম রণ।

অযোগ্য এ শোক তব। এই বীর-ক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
এক বিন্দু শোকঅশ্রু। বীরবংশ তুমি
বীরশোক অশ্রু নয়,—অসির ঝঙ্কার।

এই সকল অংশ পড়িলে মাইকেলের মেঘনাদবধ মনে পড়ে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলির অনেকাংশ অর্দ্ধ-নাটকীয়—যুক্তিগর্ভ বাগ্মিতায় পূর্ণ এবং দীর্ঘ বক্তৃতার বিনিময়। এইগুলি রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য—বিশেষতঃ বিদায় অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ ইত্যাদি নাট্য-কবিতার পূর্ব্বাভাস সূচনা করে।

নবীনচন্দ্রের গীতিকবিতাগুলির মধ্যে কীর্ত্তিনাশা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতার গীতিধর্ম্ম রবীন্দ্রনাথের উদয়ের পূর্ব্বে শুকতারার মত সমুজ্জ্বল। হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্র নাথের মধ্যে এই কবিতা একটা রচনারীতির যোগসূত্র রচনা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালার গীতিকাব্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই কবিতাটির স্থান আছে।

অবকাশ-রঞ্জিনী নবীনচন্দ্রের গীতিকবিতা-সংগ্রহের পুস্তক। এই কবিতাগুলিতে উজ্জ্বল ভাবাবেগের আতিশয্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ভাবাবেগে যদি সংযম এবং তদনুগত কলাসৌষ্ঠব থাকিত, তাহা হইলে নবীনচন্দ্র গীতিকবিতা-রচয়িতা হিসাবেও বঙ্গ-সহিত্যে হেম চন্দ্রের উপরে স্থান পাইতেন। এই কবিতাগুলিতে বিদেশী প্রভাব বর্ত্তমান আছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রধান দোষ, কবি তাঁহার কাব্যে আপনার বক্তব্য নিঃশেষ করিয়া বলিবার জন্যই ব্যগ্র—কাব্যকলার সৌষ্ঠবের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, বক্তব্য প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী যে সরস, শোভন, চিত্তাকর্ষক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়ার প্রয়োজন সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাহা ছাড়া, পাঠক-সমাজের শক্তি-বুদ্ধির প্রতি তাঁহার যথোচিত শ্রদ্ধা ছিল না—সেজন্য তিনি সকল কথা নিঃশেষ করিয়া. সংহত বাণীগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া, বলিতে চাহিতেন। তাহার ফলে, তাঁহার রচনা ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কেবল চিন্তাশীলতা নয়, কোথাও কবির ভাবাবেগেরও দৈন্য ছিল না। ভাবাবেগের আতিশয্যে তিনি কাব্য-কলাশ্রীর দিকে একেবারেই দৃষ্টি করেন নাই। ভাবাবেগের অবল্গিত উচ্ছ্বাস অনেক স্থলে তাঁহার কাব্যকে নাট্য-ধর্ম্মোপেত করিয়াছে। যথাযোগ্য সংযমের অভাবে উচ্ছ্বাসগুলি সংহত রসঘন রূপ ধরিতে পারে নাই। কবি ছায়াকেই কাব্যতরুর প্রধান সম্পদ বলিয়া মনে করিয়াছেন, পুষ্পকে নয়। সেইজন্য তাঁহার কাব্যতরু বাক্যের ঘনপল্লবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—তাহাতে রসের পুষ্প কোথাও ফুটিতে পারে নাই—কোথাও বা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের আর একটি দোষ, সামঞ্জস্যবোধের অভাব। ভাবচিত্রের পরিবেষ্টনী সৃষ্টিতে নবীনচন্দ্রের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু মহিমময় আবেষ্টনীর মধ্যে কবি অনেক সময় তরলতা ও চটুলতার সমাবেশ করিতেন—জীবনমরণের মহাসংগ্রামের পটভূমিকাতেও লঘু তরল চিত্র প্রকটন করিতেন, গুরুগম্ভীর আখ্যানভাগের মধ্যে হাস্যচপলতার অবতারণা করিয়া ফেলিতেন—দৃষ্টান্তস্বরূপ, পলাসীর যুদ্ধকাব্যে 'আশাপ্রশস্তির' দ্বিতীয়ার্দ্ধের কথা উল্লেখ করা

যাইতে পারে। ইহাতে অনেকস্থলে রসাভাস ঘটিয়াছে। মূল বিষয়বস্তু যেখানে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে নানা রসের সমাবেশের অবসর থাকে না। এই সামঞ্জস্যবোধ মাইকেলের ছিল— রবীন্দ্রনাথের ত কথাই নাই। এই সামঞ্জস্যের অভাব কুরুক্ষেত্রের ন্যায় কাব্যের মহিমাও অনেকাংশে ক্ষুন্ন করিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে দুইজন বিখ্যাত সুধীর মন্তব্য এখানে উৎকলন করিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করি—

"সুধীবন্ধু আরিষ্টটলের মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যের সহিত কোন এক মহান্ গাম্ভীর্য্য, এক ব্যাপক সত্যসমাবেশের চিরন্তন সম্বন্ধ আছে।…ব্যাস, বাল্মীকি, হোমর, দান্তে, শেক্সপীয়ার, গেটে—ইঁহারা মহাকবি; কারণ ইঁহাদের কাব্যে ঐ ব্যাপক সত্য, ঐ মহান্ গাম্ভীর্য্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। আমাদের বিশ্বাস, 'কুরুক্ষেত্রে' ঐ ব্যাপক সত্য, ঐ মহান্ গাম্ভীর্য্যের যে পরিমাণে সমাবেশ আছে, বাঙ্গালার আর কোনও কাব্যে (মেঘনাদবধেও) সে পরিমাণে আছে কি না সন্দেহ।

"…কুরুক্ষেত্র শোক-কাব্য। ইহার শেষ তিন সর্গে কবি যে শোকের পাথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিষাদের শেষ সীমা স্পর্শ করিয়াছে। এই শোকের পরাকাষ্ঠা মানবের স্বর্গের সোপান। "মানব-পবিত্রকারী এই মহাশোক'। এই শোক-সৃষ্টি গ্রীক নাটকের চরম লক্ষ্য ছিল। "সুভদ্রা আদর্শ রমণী—'রমণীর পূর্ণ সৃষ্টি'; সুভদ্রা ভূতলে রূপের স্বপ্ন, গুণের সমষ্টি। গীতার অপার্থিব ধর্ম্ম তাহাতে মূর্ত্তিমান্।"—(হীরেন্দ্র নাথ দত্ত)

"কবি নবীনচন্দ্র প্রথমে মাইকেল ও হেমচন্দ্রের ভাবমোহে পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ'। উহাতে Patriotism অতি মধুর ভাবে বর্ণিত ও বিন্যস্ত আছে।

"এই সময়ে এদেশে ডাক্তার কংগ্রীভের মুখে অগস্ত কোম্‌তের (Auguste Comte) মতের আমদানী হয়। সে Humanitarianism আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল। সে Humanitarianismএর প্রভাবে ভারতের নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের সমন্বয় সম্ভব মনে হইল। এই সময়ে আবার Nationalism বা জাতীয়তার প্রথম বিকাশ বাঙ্গালায় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ভাবকে দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন।……

"ঠিক এই সময়ে কবি নবীনচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য Humanitarianismকে মহাভারতের গল্পের ছাঁচে ফেলিয়া নূতন Nationalismএর সৃষ্টি-পুষ্টি করিয়া, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর অভিনব মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।…তিনি নূতন যুগের শেষ মহা-কবি; কেন না, মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় আর তাত্ত্বিক কাব্যের প্রয়োজন নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্র

এক

গুপ্তকবির প্রধান শিষ্য (বা শিষ্যস্থানীয়) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবেই শতাব্দীকাল বঙ্গ-সাহিত্যের মনু বা প্রজাপতির দায়িত্বগ্রহণ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষাকে 'প্রয়োজনের অঙ্গন' হইতে 'বিলাসের মঞ্চে' তুলিলেন। ভাষার সুরধুনী যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হরিদ্বারেই উপলব্যথিত গিরিসঙ্কট হইতে সমতলে নামিল—'স্নানপানের জন্য জনসাধারণের ব্যবহারে লাগিল।'

উপন্যাস-রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যকে সর্ব্বসাধারণের অধিগত ও অধ্যেতব্য করিয়া তুলিলেন। 'কেবলমাত্র সুবোধ্য ভাষার জন্য নহে—চিত্তোন্মাদক চিত্তবিনোদক রচনাভঙ্গীর জন্যই সকলে আকৃষ্ট হইল।' ইংরাজীনবীশ যাঁহারা, বঙ্গভাষাকে ঘৃণা করিতেন,—'বাংলা জানিনা' বলিয়া যাঁহারা গৌরব করিতেন,—পণ্ডিতগণ, যাঁহারা প্রাকৃত ইতর ভাষা বলিয়া বাংলাভাষাকে অবহেলা করিতেন, তাঁহারাও গোপনে গোপনে বাংলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ হর্ষোৎফুল্ল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছেন –

"পূর্ব্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, গোলেবেকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো, "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

রামমোহন ও অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ ছিল বিশেষজ্ঞ বিদ্বান লোকের জন্য। ভূদেব ও বঙ্কিম প্রবন্ধ-সাহিত্যকে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুবোধ্য ও স্বাদু করিয়া তুলিয়াছিলেন। অগ্রে সরস করিয়া প্রবন্ধ-রচনার পদ্ধতি ছিল না—নীরস যুক্তিতর্কের সাহায্যে গণিতের পদ্ধতিতে প্রতিপাদ্যকে প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য ছিল। ভূদেববাবুর প্রবন্ধ তত সরস ও কবিত্বময় নহে, কিন্তু সুবোধ্য, শিক্ষাপ্রদ ও চিন্তাশক্তির উদ্বোধক। ভাবপরম্পরা ও যুক্তিপরম্পরার বিন্যাসশৃঙ্খলা ভূদেব-সাহিত্যে উৎকৃষ্ট। এই বিন্যাসশৃঙ্খলার সহিত রসমাধুর্য্যের সমন্বয় বঙ্কিম-সাহিত্যে পাওয়া যায়। আজিও বঙ্কিমের ধারা অনাদৃত হয় নাই। এ যেন, রচনা ও রসনার অপূর্ব্ব মিলন। বঙ্কিম নীরস সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, গার্হস্থ্যনীতি ও চরিতকথাকেও সরসতা দান করিয়া সৎসাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন।

সমালোচন-সাহিত্যেরও বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সূত্রপাত। ন্যায়ের তুলাদণ্ডে দোষগুণ বিচার করিয়া বিচার্য্য বিষয়, গ্রন্থ বা চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া যুক্তিতর্কের সাহায্যে সমালোচনা 'বিচারব্রতী' বঙ্কিমচন্দ্রই প্রবর্ত্তন করেন। আর এক প্রকারের সমালোচনা ভূদেব ও বঙ্কিমের রচনায় দৃষ্ট হয়। ইহা ঠিক বিচার নহে—রসজ্ঞের রসানুভূতির অভিব্যক্তি। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচ্যকে উপভোগ্য করিয়া তোলাই উদ্দেশ্য। আজকাল প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়—দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচনা-পদ্ধতিই আজকাল সুলেখকগণ অনুসরণ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ রসানুভূতির ব্যাখ্যানকে সমালোচনার প্রধান অঙ্গস্বরূপ মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার লেখনীগুণে সমালোচনাই আর একটি নূতন সৃষ্টি (Creation) হইয়া উঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ইতিহাস রচনা নাই,—কিন্তু ইতিহাসরচনার প্রেরণা তিনি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'প্রচার' ও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণার আরম্ভ হয়। বিদেশীদের রচিত ইতিহাসে তিনি সংশয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—অনেক অসত্য তিনি ধরিয়া দিয়াছেন, ইঙ্গিতে ইতিহাসের উপাদানগুলিকে দেখাইয়া দিয়াছেন—সত্যনিষ্ঠা, ঐতিহাসিক বুদ্ধি ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যগৌরব জাগাইয়া গিয়াছেন। তিনি ও রমেশচন্দ্র, উপন্যাসগুলির মধ্যেও ইতিহাসের মূলসূত্রগুলিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বঙ্গদেশে তাঁহার ইঙ্গিতে আমন্ত্রণে, প্রেরণায় ও মন্ত্রদীক্ষায় ইতিহাস রচনার সূত্রপাত। রাজকৃষ্ণবাবু, রমেশচন্দ্র ও রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণার প্রবর্ত্তনার জন্য তাঁহার প্রতিবেশী বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটই ঋণী। বঙ্কিমচন্দ্রের পর হইতে ঐতিহাসিক সাহিত্যের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতেছে। শুধু রাজা-রাজ্যের ইতিহাস নয়, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের ইতিহাসও রচিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় উপন্যাসচ্ছলে যে ইদানীং প্রাচীন ভারতের সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হইয়াছে—তাহাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত ভঙ্গী।

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে, 'দপ্তরে' ও বহু প্রবন্ধে দেশাত্মবোধের যে মন্ত্র দিয়া দিয়াছেন তাহা আজ বঙ্গে অসংখ্য কাব্য নাট্য উপন্যাস ও গল্পে প্রমূর্ত্ত, বাগ্মীর বক্তৃতায় সংঘোষিত, কবি গায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যসেবিগণ অল্পবিস্তর সকলেই এ বিষয়ে বঙ্কিমেরই শিষ্য-প্রশিষ্য। বঙ্কিম জাতীয় সংস্কৃতির মন্দিরে মন্দিরে দেশমাতৃকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনিই দেশমাতৃকার প্রথম পূজারী। তাঁহারই প্রদত্ত 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে আজিও বাঙ্গালায়—শুধু বাঙ্গালার কেন, সমগ্র ভারতের দেশমাতৃকার পূজা চলিতেছে। বঙ্কিম, বঙ্গসাহিত্যে কেবল স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা নহেন, স্বাধীন ভাবে সত্যানুসন্ধিৎসা ও স্বাধীন অবাধ চিন্তারও প্রবর্ত্তক।

বাংলার গদ্য-সাহিত্য যখন প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে ব্যস্ত ছিল, তখন তাহার রসিকতার অবসর ছিল না। গুরুগম্ভীর সাহিত্য সর্ব্ববিধ চাপল্য চটুলতাকে অপরাধই

মনে করিত—উহা কাব্যের পক্ষেই মার্জ্জনীয় ছিল। জানি না, "হুতোম পেঁচার নক্সাকে" সেকালে লোকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর মত হাকিম যখন রসিকতা করিতে আরম্ভ করিলেন—উচ্চপদস্থ দীনবন্ধুও যখন তাহাতে যোগ দিলেন,—তখন রসিকতাও বাংলার গদ্য-সাহিত্যের আসরে ঠাঁই পাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দপ্তর' ও 'লোক-রহস্যে'র সরস রচনাভঙ্গী আজিও অনুকৃত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। এই প্রগল্ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্, কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীর ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্ব-প্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।" (রবীন্দ্রনাথ)

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে রাজনীতিক-সাহিত্য ইংরাজীতেই রচিত হইত। বাংলাভাষায় রাজনীতিক সাহিত্যেরও বঙ্কিম হইতেই সুরু। জাতীয় জীবনের বৈচিত্র্য ও দেশাত্মবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিও আজ সাহিত্যের অঙ্গীভূত।

কেবলমাত্র সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশে মাসিকপত্র-প্রচলন বঙ্কিম হইতেই সুরু। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার'কে অবলম্বন করিয়াই গত শতাব্দীর সাহিত্য-রথিগণ বঙ্গ-সাহিত্যের বিবিধ শাখাকে ফলপুষ্পে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দার্শনিক সাহিত্যের অবশ্য রাজা রামমোহন হইতে সূত্রপাত, মহর্ষি ও অক্ষয়কুমারের 'তত্ত্ববোধিনী এই সাহিত্যের ধাত্রী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' এই শাখার বহু ব্রতীর সৃষ্টি করিয়াছিল।

দর্শনের মত ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাও রামমোহন হইতেই সূত্রপাত। খ্রীষ্টধর্ম্মের আক্রমণ একদিকে—ব্রাহ্মধর্ম্মের আক্রমণ অন্যদিক হইতে। হিন্দুসমাজ তাহাতে সতর্ক হইয়া উঠিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় আক্রমণ—খ্রীষ্টধর্ম্মেরও নয়—ব্রাহ্মধর্ম্মেরও নয়—পাশ্চাত্য শিক্ষাবাহিত জড়বাদ, সংশয়বাদ, নিরীশ্বরবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের।

এই সকল বাদের সহিত বিবাদ ও বাদানুবাদের জন্য হিন্দুপণ্ডিতগণকে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে হইল—শাস্ত্রাদি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে হইল—বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া

কল্কিপুরাণ পর্য্যন্ত সর্ব্বশাস্ত্রের অনুবাদ হইল—সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতে এবং অজস্র প্রবন্ধাদি লিখিতে হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে লোকে 'আপ্তবাক্যকে' নির্ব্বিচারে মানিতে চাহিল না—শাব্দজ্ঞানের মর্য্যাদা কমিয়া গেল—আর্ষবাক্যও বিচারণীয় হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষবাদ প্রবল হইয়া উঠিল—সকল জিনিষই,—বেদ হউক, তন্ত্র হউক, পুরাণ হউক,—সমাজশাসন হউক, কুলপ্রথা হউক, লোকাচার হউক, সবই নৈয়ায়িক পদ্ধতিতে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে পরীক্ষিত করিয়া বুঝিবার ও মানিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সমগ্রজাতির মানসিক কল্যাণসাধনের জন্য এই প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তনায় ও প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্য রচনার বিলাস কুতূহল সংবরণ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হইয়া উঠিলেন।

Hume, Mill, Herbert Spencer, Comte, Bentham, Darwin, Huxley ইত্যাদি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রভাব শিক্ষিত সমাজের মজ্জায় মজ্জায় মর্ম্মে মর্ম্মে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল। ফলে নির্ব্বিচারে প্রতিপালিত কতকগুলি সংস্কার ও অনুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজে তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল। হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সুরু হইল,—বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যেই—হিন্দুর প্রত্যেক সংস্কার, প্রত্যেক অনুষ্ঠান, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইবার চেষ্টা হইল। হিন্দু সভ্যতা-সংস্কারের যাহা-কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা নৈয়ায়িক পদ্ধতির পরীক্ষায় টিকিবে না বলিয়া মনে করিলেন, ব্রাহ্মসমাজ তাহাকেই বর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহাতেও মতভেদ জন্মিল—বাদানুবাদ চলিল। এই মতভেদ হইতে ব্রাহ্মসমাজেও নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, শিক্ষা দীক্ষা, সভ্যতা আদর্শের এই সন্ধিকালে বঙ্কিমের আবির্ভাব। নববঙ্গভারতীর তখন নিতান্ত শৈশবকাল। সেকালের শিক্ষিতসম্প্রদায় নব সভ্যতার মোহে মুগ্ধ, দেশীয় শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম ও সমাজ-শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণ।

হিন্দু-সভ্যতা-সংস্কৃতির সমস্তটুকু রক্ষা করা কঠিন দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।"—সূত্র অবলম্বনে আমাদের সংস্কৃতির সকল অঙ্গেরই ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন—তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' ও ধর্ম্মতত্ত্ব সেই সূত্রানুসরণের ফল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিধ সংস্কারেরই দায়িত্বগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার সাধনের দায়িত্বভারই ছিল সেকালে গুরুতর। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে

সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভখ্যাতি লাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম। চতুর্দ্দিক-ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরা কতকটা বুঝিতে পারেন। তখন যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।" (রবীন্দ্রনাথ)

দুই

প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ও নব সভ্যতার জন্মভূমি বঙ্গের যে অনুগঙ্গ প্রদেশ—সেই প্রদেশের ব্রাহ্মণ্য-প্রধান অংশে বঙ্কিমের জন্ম। বঙ্কিমের জন্মভূমির সন্নিকটেই সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী, মূলাজোড়, কুমারহট্ট, হালিসহর ইত্যাদি সেকালের শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্রস্থল।

বঙ্কিম যে ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন—সে পরিবার ছিল নৈহাটি অঞ্চলে বিশেষ মান্যগণ্য, সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বৈতরণীকূলে সৎকারের জন্য তীরস্থ হইয়া তিনি এক সন্ন্যাসীর কৃপায় নব জীবন লাভ করেন। তিনি সেই সন্ন্যাসীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের দীক্ষা তিনি তাঁহার কাছেই লাভ করেন।

বঙ্কিমের এক খুল্লপিতামহ পলাসীর যুদ্ধের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১০৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার মুখে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সমস্ত সংবাদ পাইতেন। সেকালের আদর্শ হিন্দু পরিবারে—বারোমাসে তের পার্ব্বণ ও সমারোহ সহকারে দোল দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। বঙ্কিমের পরিবার ছিল একটি আদর্শ হিন্দু পরিবার। বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীতে প্রায়ই যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন ইত্যাদি হইত। জীবনের অধিকাংশকাল বঙ্কিম একান্নবর্ত্তী পরিবারেই কাটাইযাছেন।

বঙ্কিমের পিতা ও ভ্রাতৃগণ প্রায় সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিম পিতার সঙ্গে বাংলার নানা জেলায় ঘুরিয়াছিলেন। বঙ্কিম নিজেও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বাংলা ও উড়িষ্যার বহুস্থলে ঘুরিয়াছিলেন এবং বহু শ্রেণীর লোকের সংস্রবে আসিয়াছিলেন। সেকালের সমস্ত গণ্যমান্য শিক্ষিত লোকের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রাজকার্য্যের জন্য তিনি লোকচরিত্র ভাল করিয়া জানিবার, বাংলাদেশকে ভাল করিয়া চিনিবার এবং রাজসরকারের রীতিনীতি-পদ্ধতির ভাল করিয়া সন্ধান রাখিবার সুযোগও পাইয়াছিলেন।

কেবল রাজকার্য্য নয়, দেশের নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া তিনি অফুরন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার সাহিত্যের উপাদান উপকরণ হইয়া উঠিয়াছিল।

বঙ্কিমের পিতা একজন বিখ্যাত প্রাচীনবংশীয় লোক ছিলেন—মাতামহ একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বঙ্কিম নিজে সংস্কৃত ব্যাকরণ কাব্য নাট্য অলঙ্কার শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের টোলে অধ্যয়ন করেন। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র তিনি পিতার নিকটই কতক কতক অধ্যয়ন করেন এবং পণ্ডিতগণের সাহায্যে প্রবীণ বয়সে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। সেকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যাঁহারা ছিলেন—বঙ্কিমের সহিত তাঁহাদের প্রায়ই নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও বাদানুবাদ হইত।

বাল্যকালে বঙ্কিম সাহেব-শিক্ষকের অধীনে ইস্কুলে পড়িতেন—মেদিনীপুরে সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতেন। পরে তিনি হুগলি কলেজে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়াছিলেন—সেকালের যোগ্যতম অধ্যাপকদের নিকট তাঁহার শিক্ষা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। সেকালের গ্র্যাজুয়েটরা Mill, Bentham, Hume Spencer, Comte ইত্যাদির ভক্ত ছিলেন। বঙ্কিমও যৌবনে তাঁহাদের ভক্ত হইয়া অনেকটা নাস্তিকভাবাপন্ন (Agnostic) হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কৈশোরকাল হইতে তিনি বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা করেন এবং প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত সেকালে বঙ্গসাহিত্যের মহারথী। বঙ্কিম স্বভাবতই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কবির লড়াই সেকালে মজ্জিত হইয়া সাময়িক পত্রে (প্রভাকরে) পণ্ডিতি লড়াই ও কলেজীয় কাবিতাযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই লড়াইএর একজন ধনুর্দ্ধর ছিলেন।

পিতা যাদবচন্দ্রের পরিবারে একটা সাহিত্য-চর্চার আবেষ্টনীও রচিত হইয়াছিল। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক—অন্য ভ্রাতারাও সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। সাহিত্যসেবা-সূত্রে দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় সরকার, রমেশচন্দ্র ইত্যাদি সেকালের রথিবৃন্দের সহিত বঙ্কিমের সখ্য জন্মে। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর তরুণ লেখকগণ বঙ্কিমের চারিপাশে সমবেত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমের জীবন-চরিতকারের পক্ষে এই সূত্রগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এইগুলি তাঁহার জীবন-যাত্রায়, চরিত্র-গঠনে এবং সাহিত্য-সৃষ্টিতে কি উপকরণ উপাদান যোগাইয়াছে এবং কি প্রভাব সঞ্চার করিয়াছে তাঁহার জীবনী লেখকের পক্ষে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বঙ্কিমের প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলি যখন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্গদেশে সেগুলি যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে নাই। তখনও দেশে শিক্ষা-বিস্তার হয় নাই—অন্তঃপুরে তখনও শিক্ষা প্রবেশ করে নাই। কাজেই পাঠকসংখ্যা ছিল অল্পই। বঙ্গভাষাকে তখন অধিকাংশ লোকে অনাদর করিত। পণ্ডিত মহাশয়রা বাংলাভাষাকে প্রাকৃত ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ সেকালে যে বাংলা লিখিতেন—তাহা প্রধানতঃ উদরান্ন-সংস্থানের জন্য। ইহা ছাড়া, হিন্দুর শাস্ত্র, ধর্ম্ম, সমাজ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সেকালে যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত—সেগুলির প্রতিবাদ করিবার জন্য ও ইংরাজি-নবীশ

অনাচারীদের ধিক্কার দিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাংলা লিখিতে হইত। সে বাংলা কারক-বিভক্তি বাদ দিয়া বাংলা ক্রিয়াযোগে সংস্কৃতের রূপান্তর মাত্র। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির বিরুদ্ধে তাঁহাদের দুইটি অভিযোগ ছিল। প্রথম অভিযোগ—উহার ভাষা ব্যাকরণ-দুষ্ট এবং গুরুচণ্ডালী দোষে কলঙ্কিত। বঙ্কিমের ভাষাকে তাঁহারা 'শব পোড়া মড়াদাহ শ্রেণীর' ভাষা বলিতেন। দ্বিতীয় অভিযোগ—পুস্তকগুলি বিদেশীয় ঢঙে বিজাতীয় ভাব লইয়া লেখা। স্বদেশীয় আদর্শের ঐগুলিতে অমর্য্যাদা করা হইয়াছে।

ইংরাজিনবীশদের দল বাংলাভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ঘৃণা করিতেন। বাংলায় পুস্তকরচনা করাকে তাঁহারা বাতুলতা এবং বাংলা বই পড়াকে লজ্জার বিষয় মনে করিতেন। কেহ কেহ লুকাইয়া পড়িতেন এবং গোপনে অশিক্ষিত অন্তঃপুরিকাদের পড়িয়া শুনাইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সেকালে কলেজের পরীক্ষায় সংস্কৃত ছিল না—বাংলাই ছিল গৌণ ভাষা। তথাপি সেকালের গ্র্যাজুয়েটরা বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন। বঙ্কিমবাবু ইংরাজিনবিশদের অগ্রগণ্য হইয়াও বাংলায় বই লিখিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

তবু বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির যেটুকু আদর হইয়াছিল তাহা ইংরাজিনবিশদের কাছেই। বঙ্কিম ইংরাজিনবিশদের অগ্রগণ্য এবং হাকিম হইয়াও বাংলা লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজিনবিশরা তাঁহার পুস্তকগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমবাবু নিজের আভিজাত্য ও সামাজিক মর্য্যাদার অংশ বঙ্গভাষাকে দান করিয়া তাহাকে কতকটা শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে জন্য পণ্ডিতরা সেগুলির অনাদর করিয়াছিলেন, ইংরাজিনবিশদের অনেকে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির সমাদর করিয়াছিলেন ঠিক সেইজন্যই।

বঙ্গভাষায় ইংরাজি ভাব, আদর্শ, ভঙ্গী ইত্যাদির প্রবর্ত্তন দেখিয়া এবং সংস্কৃতের বন্ধন হইতে তাহার আংশিক মুক্তি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা তাহাদের ব্রতভঙ্গ করিয়া বাংলা পড়িতে সুরু করেন। মোটের উপর এদেশে বঙ্কিমচন্দ্রই ইংরাজিনবিশদিগকে বাংলা পড়িতে বাধ্য ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গভাষার মর্য্যাদা তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্কিম যদি ইংরাজিনবিশদের মুখপাত্র ও হাকিম না হইতেন—তাহা হইলে বঙ্গভাষার মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠা ও কলঙ্কমোচনের ঢের বিলম্ব হইত।

উপন্যাসগুলির নিন্দা করিলে বঙ্কিম অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন—অক্ষুব্ধচিত্তে রূঢ় সমালোচনা স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেন না। ইহা তাঁহার আত্মাভিমানের জন্য নয়—উহাতে বঙ্গভাষার প্রতিই তাহাদের অশ্রদ্ধা সূচিত হইত তাহাই তিনি মনে করিতেন। বঙ্গভাষায় উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম চেষ্টা বলিয়াও অন্ততঃ বঙ্কিমের রচনাকে যাহারা সহানুভূতির চোখে দেখিতে পারিত না—বঙ্কিম তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

বঙ্কিম মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেও নিজের সৃষ্টিতে তুষ্ট হইতেন না। সমালোচকদের মন্তব্যের সহিত মিলুক আর নাই মিলুক—গ্রন্থগুলি যে

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে না তাহা তিনি বুঝিতেন। সেজন্য প্রত্যেক সংস্করণে তিনি গ্রন্থগুলির আমূল সংস্কার করিতেন, পরিবর্জ্জন,—পরিবর্ত্তন—পরিবর্দ্ধনের জন্য রীতিমত পরিশ্রম করিতেন। নিজের রচনার দোষত্রুটির জন্য যিনি নিজেকে ক্ষমা করেন না—তাঁহার কাছে বেদরদী সমালোচকের দায়িত্বশূন্য মন্তব্য অসহ্য। যাহারা একেবারেই সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিত না, রসবোধের কোন পরিচয় দেয় নাই, তাহাদের মতামতকে বঙ্কিম ধৃষ্টতারই দৃষ্টান্ত মনে করিতেন।

বিরুদ্ধ মন্তব্য ও রূঢ় সমালোচনায় বঙ্কিম বিরক্ত হইলেও কখনও হতোদ্যম হন নাই। অবিচলিত থাকিবার জন্য যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার প্রয়োজন তাহা তাঁহার ছিল। তিনি স্তুতিনিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার প্রতিভা-নির্দ্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতেন। নিজের শক্তির উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল—আর নির্ভর ছিল অনাগত পাঠকসম্প্রদায়ের উপর। তিনি অনেক সময় নীরবে মহাকালের বিচারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যিকগণ চারি পাশে চাহিবার অবসর পান না—তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধারার জন্য সমগ্র যুগের উপরই নির্ভর করেন—বর্ত্তমানের উপর খুব বেশী নির্ভর করেন না। বঙ্কিম ছিলেন একাধারে আদর্শ স্রষ্টা ও আদর্শ উপভোক্তা। স্রষ্টা হিসাবে তিনি নির্ব্বিকার। উপভোক্তা হিসাবে তিনি তাঁহার সৃষ্টির মূল্যমর্য্যাদা ভাল করিয়াই বুঝিতেন—সে জন্য তিনি নিশ্চিন্ত ও অবিচলিত থাকিতে পারিতেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হোক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না, তাহা নহে কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনো দিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।"

তিন

বঙ্কিমের মত অগাধ দেশপ্রীতি অন্য কোন লেখকের দেখা যায় না। এই দেশভক্তি কোথা হইতে জন্মিল? ইহা কি মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ হইতে? ইহা কি ইউরোপীয় হিতবাদী দার্শনিকদের গ্রন্থ হইতে সঞ্চারিত? ইহা কি দাসত্বের গ্লানি হইতে? না, দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতা হইতে? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এইগুলি তাঁহার দেশভক্তির মূল নিদান নয়, এগুলি দেশভক্তির পরিপোষণে সহায়তা করিয়াছিল মাত্র। দেশ-ভক্তি তাঁহার চরিত্রের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। তাঁহার চরিত্রে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ বড়ই প্রখর ছিল। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ হইতেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের অভিমান প্রবুদ্ধ হয়।

অনেকের জীবনে একটা কোন বিশিষ্ট ঘটনা হইতে দেশানুরাগের সূত্রপাত হয়। বঙ্কিমের জীবনের সেরূপ কোন বিশিষ্ট ঘটনার কথা আমরা জানি না।

ইহা ছাড়া, পূর্ণ মনুষ্যত্বের একটা আদর্শ ছিল তাঁহার মানস জীবনে। সমগ্র বঙ্গদেশে তাহার উপলব্ধি ও সেই আদর্শের অনুস্থতি তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। মহামানব বা বিশ্ব তাঁহার লক্ষ্যবস্তু ছিল না। ঐতিহাসিক নিবন্ধে তিনি ভারতবর্ষের নিয়তি ও শক্তি-অশক্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইল অতীতের কথা। বর্ত্তমান সমস্যার সম্পর্কে সমগ্র ভারতবর্ষের কথা তিনি ভাবিতেন না, কারণ, তিনি বুঝিতেন, তাহা ভাবিয়া লাভ নাই। নিজের শক্তিসামর্থ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্টরূপ সচেতন ছিলেন। বিশেষতঃ তখন পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বঙ্গদেশের এমন কোন অঙ্গাঙ্গী রাজনীতিক যোগ ঘটে নাই—যে জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া জাতীয় অভিমান অনুভব করিতে পারা যায়। তাই "সপ্ত কোটি কণ্ঠেই" বঙ্কিম দেশমাতার বন্দনা শুনিতে চাহিতেন।

বিশ্ব-রহস্য নয়, মানবজাতির সমস্যা নয়, ভারতের সমস্যা নয়—বাঙ্গালার সমস্যাই তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি দেখিলেন—জাতীয় জীবনে, সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই সমস্যা—সর্ব্বক্ষেত্রেই সংস্কারের প্রয়োজন। তাই দেশীয় সমাজের সংস্কারের জন্য, স্বধর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে নির্ম্মল করিবার জন্য, রায়তদের কল্যাণ সাধন ও দেশের শিক্ষা-সংস্কারের জন্য, দেশে স্বাধীন সত্যনিষ্ঠ চিন্তার প্রবোধনের জন্য, লোক শিক্ষাপ্রচারের জন্য তাঁহার দেশ-প্রীতি তাঁহাকে লেখনী-ধারণে প্রণোদিত করিয়াছিল। তিনি এক হাতে কশা, এক হাতে লেখনী লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। "কৃতবিদ্য নবাবমদের" শাসন করারও প্রয়োজন ছিল। নিসর্গে তিনি প্রথম শ্রেণীর রসশিল্পী ছিলেন। তবু তিনি দেশের কল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁহার শিল্পিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দেশপ্রীতিকেই তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ধর্ম্মে পরিণত করেন।* বাঙ্গালা দেশের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা, অস্বস্তি ও অস্থিরতার অবধি ছিল না। বর্ত্তমান যুগে দেশকে এই ভাবে ভালবাসা অসম্ভব নয়, কিন্তু যে যুগে বিদেশের অনুকৃতিই প্রধান ব্রত বলিয়া গণ্য হইত—সে যুগে এইরূপ দেশানুরাগ অন্যের পক্ষে কল্পনাতীত ছিল।

বাঙ্‌লাদেশকে তিনি এমনই ভালবাসিতেন যে, তাঁহার রচনায় বীরধর্ম্মের আদর্শ দেখাইবার জন্য তিনি (রাজসিংহ রচনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) রাজস্থানের ইতিহাসের দ্বারস্থ হন নাই, বাঙ্গালারই অন্তর্নিহিত নিজস্ব বীরধর্ম্মকে তিনি আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার কল্পিত চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহা ফুটাইয়া তোলেন। রাজস্থান হইতে চরিত্রভিক্ষা লইলে সাহিত্যের কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কেবল সাহিত্য রচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না—সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি নিজ জন্মভূমির মহিমা ও আশা আকাঙ্ক্ষা প্রচার করিতে, বাঙ্‌লার নিজস্ব বীরধর্ম্মকে জাগাইতে

* "বঙ্গদর্শন" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। বঙ্কিমবাবু সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, এখন লোক-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি লোকশিক্ষার দাসী হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুও দাস হইয়া গেলেন।—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

চাহিয়াছিলেন। আংশিক ভাবে সীতারাম ছাড়া বাঙ্গালার কোন ঐতিহাসিক বীরচরিত্র তাঁহার আদর্শের সহিত সমঞ্জস ছিল না—সে জন্য তিনি স্বকীয় আদর্শসম্মত কল্পিত চরিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাজস্থানের রাজসিংহ চরিত্রটিকে আশ্রয় করিয়া আশ্বস্ত হন।

Mill, Bentham, Comte ইত্যাদির গ্রন্থ হইতে তাঁহার সমাজকল্যাণ-ধর্ম্মে দীক্ষা। এই ধর্ম্মকে তিনি স্বদেশের সমাজে প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি কেবল উপদেশ দেন নাই, দৃষ্টান্তেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদের বাণীর দ্বারা বিদেশীয় মতবাদকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া অনেকটা অভিনব ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধর্ম্মমত তাঁহার উপন্যাসগুলিতে ওতপ্রোত। বঙ্কিম প্রত্যেক উপন্যাসে যে একটি করিয়া সাধু-সন্ন্যাসীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—ঐ ধর্ম্ম তাঁহাতেই পরিমূর্ত্ত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে দ্বন্দ্বাতীত নিষ্কাম মহাপুরুষগণ কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া লোকহিত সাধন করিতেছেন এবং তেজস্বী বীরহৃদয় বাঙ্গালী পুরুষ ও নারীকে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষা দিতেছেন। তাঁহারা সাধনার এমন উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কর্ম্মত্যাগেরই কথা, কিন্তু কেবল লোকসংগ্রহের জন্যই তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ।

বঙ্কিমের সময়ে সাহিত্যে দেশভক্তি প্রচারের সূত্রপাত হইয়াছিল। সংবাদপত্রে ও বক্তৃতাতেও দেশের প্রতি প্রীতি প্রচারিত হইত। বঙ্কিমের সময়ে কবিতাতেও ভারতমাতার অতীত গৌরবের কথা ও তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথার উল্লেখ করিয়া অশ্রুপাত করা হইত। রাজস্থানের ইতিহাসের কথা টডের মারফতে বাঙ্গালীরা জানিতে পারিয়াছিল—রাজপুতদের বীরত্বের কথা বাঙলা কাব্যসাহিত্যে স্থান পাইয়া দেশভক্তির তৃষ্ণা নিবারণ করিত।

সংবাদপত্রে ও বক্তৃতায় তখন নীলকরদের অত্যাচারের কথা ও সরকারী কোন কোন আইন ও ব্যবস্থার অসঙ্গতি ও অবৈধতার কথা আলোচিত হইত। এইভাবে সাহিত্যে দেশভক্তির প্রচার হইত। এই দেশভক্তির মধ্যে প্রকাশ্য ইংরাজবিদ্বেষ ছিল না।

দেশবাসী তখনও ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে কিছুই বলিত না, বরং ইংরাজশাসনে দেশের লোক বেশ পরিতুষ্টই ছিল। ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইবার আগে দেশে যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, দস্যুতস্করের উপদ্রব, শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের অত্যাচার প্রভৃতি প্রচলিত ছিল—সে সমস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেশ ইংরাজরাজের প্রতি কৃতজ্ঞই ছিল। বাঙলাকাব্যে কবিদের অশ্রুপাত অনেকটা মুসলমানশাসনের লাঞ্ছিত ভারতবর্ষের জন্য। নবাবী শাসনটা গিয়াছিল, কিন্তু পীড়ন দুঃখের স্মৃতি ত তখনও রহিয়াছে।

সে যুগের কবিদের এই যে ভারত-প্রীতি ইহা বিলাতী সাহিত্য হইতেই দেশে সংক্রামিত হইয়াছিল। সকল দেশেই জাতীয় সঙ্গীত ও দেশপ্রীতিমূলক কবিতা আছে। এদেশেও সেজন্য কবিরা ঐ শ্রেণীর কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাঙলাদেশকে তাঁহারা জানিতেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে তাঁহারা জানিতেন না, তবু ভারতের জন্যও প্রথামত অশ্রুপাত করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি প্রধানতঃ তাঁহার চরিত্রগত, কিছুটা বিদেশ হইতে সঞ্চারিত।

সরকারের দাসত্ব করিতে গিয়া তাঁহার জাতীয় অভিমান আঘাত পাইয়া ফণা তুলিয়া উঠিয়াছিল কি না তাহাও বলিতে পারা যায় না। মোটের উপর, বঙ্কিমের দেশভক্তি ছিল চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যজাত অকপট ও আন্তরিক। মামুলি প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া তিনি সাহিত্যে দেশভক্তির প্রচার করেন নাই। ব্যক্তিগত তেজস্বিতা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জন্মগত আর্য্যজনোচিত আভিজাত্যবোধ হইতেই বোধ হয় এই দেশভক্তির সূত্রপাত।

তাঁহার দেশপ্রেম অকপট বলিয়াই তিনি গোটা ভারতবর্ষকে লইয়া টানাটানি করেন নাই—তিনি বাঙ্গালা দেশকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া বরণ করেন। ভারতমাতা বঙ্কিমের কাছে বঙ্গমাতায় পরিণত হইল—পরে এই মাতাই জগন্মাতার সহিত একাঙ্গীভূত হইল।

বঙ্কিমের দেশভক্তি শুধু অকপট নয়—সর্ব্বাঙ্গীণও বটে।

বঙ্গমাতা বলিতে তিনি বুঝিতেন, বাঙ্গালাদেশের মাটি, প্রকৃতি, মানুষ, ভাষা, ঐতিহ্য, অতীত গৌরব, ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প,—সমস্তই। বাঙ্গালার মৃত্তিকা তাঁহার কাছে সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা। ইহার নদী, বন, প্রান্তরের সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিত বাঙ্গালার জলধারার কলধ্বনি তাঁহার রচনার সঙ্গে মিশিয়া আছে। বাঙ্গালার দরিদ্রতম কৃষক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রিয় ছিল। বাঙ্গালার কল্যাণ সাধনের উৎকণ্ঠায় তিনি প্রাণপণে লেখনী চালনা করিয়াছেন। অবশ্য জগতের হিতসাধনই পরমধর্ম্ম বলিয়া তিনি মনে করিতেন,—তাঁহার জগৎ এই বঙ্গদেশ।

আজ বঙ্গভাষাকে ভালবাসিবার লোকের অভাব নাই। আজ সে নিতান্ত দীনহীনা নয়, ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে আজ সে সমৃদ্ধা। বঙ্কিমের সময়ে এই ভাষা ছিল দরিদ্র, দুর্ব্বল হেয়—সে ছিল সকলের অবজ্ঞেয়। বঙ্কিম তখনই তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলেন। বাংলা অপেক্ষা ইংরাজীতে ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার বেশীই ছিল। তিনি বলিতেন,—বাংলা অপেক্ষা ইংরাজী লেখা তাঁহার পক্ষে সহজ। ইংরাজীতে লিখিয়া দেশ-দেশান্তরে যশোলাভের লোভ সংবরণ করিয়া তিনি দীন বঙ্গভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন। যে অবজ্ঞেয় ছিল—তাহাকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়া সকলের শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিলেন। যে শিক্ষিত লোকেরা বঙ্গভাষাকে ঘৃণা করিত তাহাদিগকে তিনি "কৃতবিদ্য নরাধম" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায়, যাহারা লিখিত, তাহাদের ভাষাকে 'মৃত সিংহের চর্ম্ম-স্বরূপ' বলিতেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্যই ইংরাজী ভাষার অনুশীলনের প্রয়োজন—ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া এই ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে-ভাষায় সকল প্রকার ভাবপ্রকাশের সুবিধা ছিল না, সেই ভাষায় তিনি এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে, চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছিলেন—"বঙ্গদর্শন পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম বাংলাভাষায় সকলপ্রকার কথাই সুন্দররূপে বলিতে পারা যায়। আর বুঝিয়াছিলাম—ভাষা ও সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ মানুষের অভাব। বঙ্গদর্শন বলিয়া দিয়াছিল,—বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে।"

বঙ্কিম বিশ্ববিদ্যালয়েও বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাধা দিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায়গণ ও মৌলবীগণ।

বঙ্কিম বলিতেন,—যে দেশের অতীত গৌরব নাই, সে-দেশ অধঃপতিত হইলে আর উঠিতে পারে না। এই অতীত গৌরবের কথা দেশের লোকের জানা চাই। বাঙ্গালার অতীত গৌরবের উদ্ধার ও প্রচারের জন্য তাই তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতি যে শৌর্য্যে অন্য কোন জাতি হইতে ন্যূন ছিল না, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি প্রবন্ধ ও উপন্যাস দুই-ই রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল শৌর্য্যের অভাব নয়—বাঙ্গালীর অসংহতি, বিশ্বাসঘাতকতা, দেশপ্রীতির অভাব বাঙলার পরাধীনতার মূল কারণ অর্থাৎ বাঙলার দুর্গতির মূলে বাঙ্গালীর দুর্ম্মতি। সতেরো জন অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়কে তিনি একটা অলীক গল্প বলিয়া এবং পলাশীর যুদ্ধকে তিনি একটা অভিনয় মাত্র মনে করিতেন। তিনি শৌর্য্যের আদর্শ দেখাইবার জন্য রাজপুতানার ইতিহাস হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙলার নিজস্ব শৌর্য্য উপাদানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অধিকতর। এজন্য তিনি সীতারামকে আবিষ্কার করিয়াছেন, মৃণ্ময়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, প্রতাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্তানসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গালীর লাঠিয়ালসম্প্রদায়কে দেবীচৌধুরাণীতে স্থান দিয়াছেন।

বঙ্কিমের লাঠি-প্রশস্তি দেশের নিজস্ব শৌর্য্যেরই প্রশস্তি। বাঙ্গালীর নারীকেও তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল মনে করিতেন না। শ্রী, শান্তি, দেবীচৌধুরাণী ইত্যাদি চরিত্র তাঁহার বিশ্বাসটা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইবার আগে দেশে ছিল অরাজকতা, দস্যুতা, বিশৃঙ্খলা, প্রবলের অত্যাচার, অন্নকষ্ট ইত্যাদি। এই সময়ে যাহাদের হাতে শাসন ভার ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই বাণীরূপ আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী। সুশাসনই অভিপ্রেত। প্রজার যদি কল্যাণ হয়-লোকে নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব হইয়া যদি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে—তবে শাসক যেই থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ঐ দুই পুস্তকে বঙ্কিম ইংরাজ শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই করিয়াছেন—পূর্ব্বের শাসনের সঙ্গে তুলনায় এই শাসন যে শ্রদ্ধেয়, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিলনা। কিন্তু জগতের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে ইংরাজ-শাসনকে আদর্শশাসন বলা যায় কি না সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে তিনি কোন আলোচনা করেন নাই। বঙ্কিম স্বেচ্ছায় ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচার করেন নাই, কিন্তু ইংরাজ-শাসনের যে যে ত্রুটী তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল সেগুলি তিনি নানা নিবন্ধে দেখাইতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। সরকারী চাকরী করিয়া এবিষয়ে যতটা সাহস ও নির্ভীকতা দেখানো চলিতে পারে বঙ্কিম তাহার অনেক অধিকই দেখাইয়াছেন।

আজকাল ইংরাজের শাসন ও ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতাকে পৃথক্ করিয়া দেখা হয়। সেকালে দুইটাকে পৃথক্ করিয়া দেখা হইত না—সে জন্য ইংরাজের কথা উঠিলেই তিনি অভিনব শিক্ষাদীক্ষাপ্রচারের জন্য ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। এই ঋণ স্বীকার করিলেও ইংরাজের শাসন-বিচার, অমাত্য-নির্ব্বাচন, শিক্ষা-প্রচারে বিমুখতা, বঙ্গদেশ

সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, রায়তদের সম্বন্ধে আচরণ, তোষামোদ প্রীতি এবং পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদির জন্য তাঁহার বিরূপ ধারণা যে ছিল না তাহা নয়। বাঙ্গালী জাতির প্রতি ইংরাজের অবজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তীব্র সমালোচনাও করিয়াছেন। বাঙ্গালীদিগকে উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত করিয়া স্বায়ত্ত শাসনের শিক্ষা ও সুযোগ দেওয়া হইতেছে না বলিয়াও তাঁহার ক্ষোভ ছিল। ইংরাজের প্রবল প্রতাপান্বিত দোর্দ্দণ্ড শাসনের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। সে-জন্য দেশাত্মবোধ ইংরাজ-বিদ্বেষে পরিণত না হওয়াই যে মঙ্গলজনক ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। সেই সঙ্গে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট আশা পোষণও করিতেন। বাঙ্গালীর বাহুবল, বাঙ্গালার কলঙ্ক ইত্যাদি প্রবন্ধে তাহার আভাস আছে। আনন্দমঠে মহাপুরুষের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান্ আর বলবান হয়, ততদিন ইংরাজ রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।" কমলাকান্তের মুখে তিনি তাঁহার আশার কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন।

ইংরাজের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিম বহুস্থলে প্রশংসাই করিয়াছেন। বাঙ্গালীদের সঙ্গে তুলনায় তাহাদের সাহস, শৌর্য্য, সহনশক্তি, সংহতি, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠতা ইত্যাদি গুণের উৎকর্ষ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীদের বলিতেন, "ইংরাজের গুণের অনুসরণ কর—দোষের অনুসরণ করিও না।" ইংরাজের গুণের অনুসরণ করিতে গিয়া সাহেব বনিয়া যাইতে হইবে এমন কথা তিনি মনে করিতেন না।*

বঙ্কিম মুসলমান জাতির কথা রায়তদের সম্পর্কে ভুলেন নাই, উপন্যাসেও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাহাদিগকে ভুলেন নাই—কিন্তু যখনই তিনি সাধারণভাবে বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধনাবেদনার কথা তুলিয়াছেন, তখন তিনি মুসলমানজাতির কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাজ্ঞান-সংস্কৃতির উৎকর্ষ যে কোন দিন সংখ্যাধিক্যের কাছে মূল্যহীন বলিয়া গণ্য হইবে তাহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। তিনি বাঙ্‌লাদেশকে হিন্দুর দেশ বলিয়াই জানিতেন—মুসলমানদের জানিতেন আগন্তুক বলিয়া। তিনি যে শৌর্য্য, তেজ, সংযম ও সাধনার উদ্বোধনের দ্বারা তাঁহার উপন্যাসে দেশাত্মবোধ জাগাইয়াছিলেন সে উদ্বোধন মুসলমান রাজত্বের কুশাসনের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। সে কুশাসনে হিন্দু-মুসলমান উভয়-জাতিই সমভাবে বিড়ম্বিত হইয়াছিল। বঙ্কিম নবাবী আমলের শেষকালের দুর্গতির জন্য রেজা খাঁ ও দেবীসিংহ দুইজনকেই দায়ী করিয়াছেন। সে রাজত্ব আর নাই, সে মোগল-

---

* ইংরেজি ভাষার প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলিয়াছেন—আমরা ইংরেজি বা ইংরেজের দ্বেষক নহি।× × অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরেজি ভাষার যতই অনুশীলন হয় ততই ভালো।× × কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙালী অপেক্ষা ইংরেজ অনেক গুণে গুণবান্। যদি এই তিন কোটি বাঙালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরেজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরেজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্য নারীও জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরেজি অপেক্ষা খাঁটি বাঙালী স্পৃহনীয়।

পাঠানও আজ নাই। অথচ মুসলমানরা উহাকে নিতান্ত সাহিত্যের ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। তবে একথাও বলিতে হয়—বঙ্কিমের বঙ্গমাতা—হিন্দুরই বঙ্গমাতা—জগন্মাতা মহামায়ার সহিত অভিন্ন—সন্তানধর্ম্ম শাক্ত ও মহাভারতীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সমন্বয়। যে দেশপ্রীতির সাধনায় ও দেশ-সেবায় বাঙ্গালী বঙ্কিমের কাছে দীক্ষালাভ করিল, তাহাতে আমরা মুসলমানদের সহযোগিতা পাইলাম না। অথচ বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ-সাধনায় আমরা ইংরাজকে হারাই নাই।

(চার)

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন। ** সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন, আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।"

বঙ্গদর্শন মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তন কর্ম্মযোগী বঙ্কিমের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে বঙ্কিমের সম্বন্ধে যে সত্যটি বিবৃত হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়াই সেই সত্যটির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। বঙ্কিম উপলব্ধি করিয়াছিলেন—আদর্শ মাসিকপত্র সাহিত্যসৃষ্টি, সাহিত্যপ্রচার ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী-রচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় উপকরণ। বঙ্কিমের সময়েও দেশে মাসিকপত্র ছিল, কিন্তু সেগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু ছিল না,—সেগুলির প্রবর্ত্তন বা পরিচালনার মূলে কোন লোকোত্তর প্রতিভাবান্ মনীষী ছিলেন না—কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সংঘের দ্বারা সেগুলি পরিষেবিত বা পরিপোষিতও হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যের এই অভাব অনুভব করিয়া আদর্শ মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করিলেন। বঙ্গদর্শন হইল বঙ্কিমের দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা প্রতিভার একটি প্রধান ভুজ। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"প্রতিভা এমন জিনিস, ইহা যাহা কিছু

** বাঙালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদের উক্ত বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। * * * যাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। * * তবে যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে, যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। * * * যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সংবর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।" বলা বাহুল্য বঙ্গদর্শন বঙ্কিমের এই প্রতিশ্রুতি সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করিয়াছিল।

স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি এরূপ মাসিক পত্রের সৃষ্টি করিলেন—যাহা প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইল।"

বাঙ্গালী জাতি এইরূপ আদর্শ মাসিকপত্রই একখানি বহুদিন হইতে চাহিতেছিল—তাই 'প্রকাশমাত্র ইহা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইল'। বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়া বঙ্কিম লঘু সাহিত্যের প্রচার করেন নাই—তবু তাহা ঘরে ঘরে কি করিয়া স্থান পাইল তাহা আমরা বর্ত্তমান যুগে ভাবিয়া বিস্মিত হই। বঙ্গদর্শনের সঙ্গে 'সারে ভারে ও ধারে' তুলিত হইতে পারে এমন মাসিকপত্র সে যুগে ছিল না, এ যুগেও একখানিও নাই। বঙ্কিম ইহার মধ্য দিয়া উচ্চ আদর্শের সাহিত্যেরই কেবল প্রচার করেন নাই, সমাজ-তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞানশাখার ফলপুষ্পে বঙ্গদর্শনের রসভাণ্ডার তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন। তবু যে বঙ্গদর্শন সে যুগে 'ঘরে ঘরে স্থান পাইয়াছিল' তাহার কারণ, সমস্তের মধ্যে বঙ্কিমের অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শ। বঙ্কিমের লেখনীস্পর্শে, পরিচালনায়, প্রবর্ত্তনায়, উপদেশ ও সুসম্পাদনায় বিবিধ বিষয়ের রচনাবলী এমনই সরস, চিত্তাকর্ষক, শ্রীসৌষ্ঠবে ও পারিপাট্যে মণ্ডিত, আতিশয্যবর্জ্জিত ও গাঢবন্ধ হইয়া উপস্থাপিত হইত যে, বঙ্গদর্শন বিষয়-গৌরবে সমৃদ্ধ ও গুরুভার হইয়াও সর্ব্বজনের উপভোগ্য ও হৃদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যে রচনা তাঁহার সমুন্নত আদর্শের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইত, সে রচনাকে তিনি বঙ্গদর্শনে স্থান দিতেন না।

নয় বৎসর কাল বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' জীবিত ছিল, প্রথম কয়েক বৎসর তাঁহার নিজের সম্পাদনায় শেষ কয়েক বৎসর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায়। নয় বৎসরে ইহা অসাধ্য সাধন করিয়াছে। বঙ্কিম এই 'বঙ্গদর্শনে'র মধ্য দিয়া বঙ্গসাহিত্যের নিজস্ব গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তাহার অন্তর্নিহিত মহিমার প্রচার করিয়াছেন, মাতৃভাষা-বিমুখ শিক্ষিত লোকদের মাতৃভাষার সেবায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ইংরাজিশিক্ষিত বাঙ্গালীদের বাঙ্‌লা লিখিতে শিখাইয়াছেন, তাহাদিগকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন, দেশে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার প্রবর্ত্তনা দান করিয়াছেন, দেশের সাহিত্য-চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, দর্শন-বিজ্ঞানাদি বিষয়ের রূঢ়তা ও নীরসতা হরণ করিয়া তথ্যগুলিকে সাহিত্যের পাংক্তেয় ও উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের মারফতে বঙ্কিম এমন একটা সাহিত্যিক আভিজাত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, তাহার পরিবেষ-মণ্ডলে হঠকারী, অনধিকারী, অক্ষম ও প্রতিভাহীন ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার ছিল না।*

বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া বঙ্কিম শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই—সাহিত্যিকদেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন অর্থাৎ সে যুগের যে সকল সুপণ্ডিত মনীষীর সারস্বত জীবনে সাহিত্যিক প্রতিভা প্রচ্ছন্ন ছিল, বঙ্কিমের সংস্পর্শে তাঁহাদের সে প্রতিভা সৃষ্টিশক্তিতে পরিস্ফুর্ত্ত ও পূর্ণবিকশিত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনার

* বঙ্কিমচন্দ্র পত্রসূচনায় লিখিয়াছিলেন—"আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।"

রত্নভাণ্ডার।) বঙ্গদর্শনে তাঁহাদের এমন রচনা অজস্রই আছে, যেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

বঙ্গদর্শনেই সব্যসাচী বঙ্কিম একহাতে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং অন্য হাতে ধূম ও ভস্মরাশি দূর করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের চত্বরে যাহাতে আবর্জনা জঞ্জাল জমিয়া অস্বাস্থ্য ও অস্বস্তির সৃষ্টি না করে সে দিকে বঙ্কিমের ছিল প্রখর দৃষ্টি। এজন্য তাঁহাকে সমালোচকের অঙ্কুশ ধারণ করিতে হইয়াছিল। তিনি এজন্য বঙ্গদর্শনে আদর্শ অপক্ষপাত সমালোচনার প্রবর্ত্তন করেন। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে পুরাতন বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাগুলি অনুসন্ধান করিতে হয়।

Universityর বাহিরে বঙ্গদর্শন একটা Cultural and educational institution হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা অন্যান্য পত্রিকার আদর্শস্থানীয় ছিল, সামসময়িক পত্রিকাগুলি ও পরবর্ত্তী পত্রিকাগুলি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা, রচন রীতি ও আদর্শের অনুসরণ করিত। এক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথিগণের রচনার একত্র সম্মেলন আর কোন পত্রিকায় আজ-ও হয় নাই। যাঁহারা লিখিতেন তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সহিতই লিখিতেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের মত কঠোর সমালোচকের মনোমত হওয়া চাই। যে-সকল নিবন্ধে সারবস্তু থাকিত, অথচ ভাষার দৈন্য থাকিত, বঙ্কিম সে সকল রচনা পরিমার্জ্জিত করিয়া লইতেন। এই ভাবে লেখকগণ উপদেশ ও পরিচালনা পাইত এবং এই ভাবে নূতন লেখকের সৃষ্টি হইত। বঙ্কিম সুপণ্ডিত কৃতবিদ্য বন্ধুগণকে বাঙ্‌লা লিখিতে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারা ভাষাজ্ঞানের অজুহাত দেখাইতেন। বঙ্কিম সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিতেন—অর্থাৎ নিজে তিনি ভাষার যথাযোগ্য সংস্কার করিয়া লইবেন এই আশ্বাস দিতেন। এই ভাবে তিনি অনেক ইংরাজীনবীশকে বাঙ্‌লার লেখক করিয়া তুলিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির তত্ত্ব বাঙ্‌লায় ব্যক্ত করা যায় না বঙ্গদর্শন এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিয়াছিল, তাহা কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত বান্ধবের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে বুঝা যাইবে—

"বঙ্গদর্শন সারস্বত দুগ্ধসিন্ধু মন্থন করিয়া অমৃতটুকু বিতরণ করিত—তাই সেকালের শিক্ষিত সমাজ বঙ্গদর্শনের জন্য চাতকের মত উৎকণ্ঠ হইয়া থাকিত।"

বঙ্কিমের শেষ জীবনে বঙ্গদর্শন তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত লেখনীতেও নব বল সঞ্চার করিয়াছিল এবং তাঁহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতি সংখ্যায় বহু পৃষ্ঠাই তাঁহার নিজের রচনায় সমৃদ্ধ থাকিত। যে কালে সাময়িক পত্রের উৎকৃষ্ট আদর্শের অভাব ছিল, ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিরা বাঙ্‌লাভাষাকে ঘৃণা করিত, ভাষার দীনতাও ঘুচে নাই—দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পরিভাষার সৃষ্টি হয় নাই—লেখকের সংখ্যা ছিল অল্প, দেশে শিক্ষাবিস্তার হয় নাই; সেকালে এ হেন অবস্থায় আদর্শ মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করিতে বঙ্কিমকে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল—কত চিন্তা করিতে হইয়াছিল—তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল—বহু কাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ-সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল—প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইত। বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল।"

পাঁচ

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যে নরনারীর অধিকার-সাম্য বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয় তবে মৃত-ভার্য্য পুরুষদের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন?" ইহাতে মনে হইবে বঙ্কিম বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে তিনি ঐ সঙ্গেই বলিয়াছেন, "সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নয়, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।" এই কথাই বঙ্কিমের প্রাণের কথা বলিয়া মনে হয়। বাল-বিধবার বিবাহের পক্ষপাতী সে কালের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই ছিলেন—বঙ্কিম এবিষয়ে পিছাইয়া ছিলেন মনে করার হেতু নাই। কুন্দ বিধবা ছিল বলিয়া বিষবৃক্ষ নামের সার্থকতা লাভ করিল ইহা সত্য নয়। পাত্রপাত্রীর ইন্দ্রিয়-লালসার বিষই বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। সূর্য্যমুখী কমলমণির নামে চিঠিতে বিধবা-বিবাহের বিধানদাতাকে মূর্খ বলিয়াছে! বলা বাহুল্য, ইহা সূর্য্যমুখীরই কথা, বঙ্কিমের নয়।

বহুবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিম স্বতন্ত্রভাবে কোন মত প্রচার করেন নাই। ইহাকে তিনি কুপ্রথা মনে করিতেন বটে, কিন্তু ইহার জন্য কোন আন্দোলনের প্রয়োজন আছে মনে করিতেন না। বিদ্যাসাগর যখন এজন্য খুব প্রবল আন্দোলন চালাইতেছিলেন, তখন তিনি বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা—অশাস্ত্রীয়তার বাদানুবাদকে উপহাসই করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'আপনা হইতেই যাহা উঠিয়া যাইতেছে, তাহার জন্য আবার আন্দোলন কেন?'*

বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসের মধ্য দিয়া স্পষ্টভাবে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করেন নাই, বরং সহযোগী দীনবন্ধু তাহা করিয়াছিলেন। সাপত্ন্যদ্বন্দ্বের চিত্রের দ্বারাই বহুবিবাহ প্রথার বিদূষণ হইয়া থাকে। বঙ্কিম চন্দ্র উপন্যাসে সে বিদূষণ-চিত্র দেখান নাই। সীতারামে রমা ও নন্দার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। শ্রীর সঙ্গেও ইহাদের বিরোধ নাই। শ্রী যে সীতারামকে ধরা দেয় নাই তাহার কারণ অন্যবিধ। দেবী চৌধুরাণীতে নয়ান্ বৌয়ের

* '১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা, যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। ২। বহুবিবাহ এদেশে স্বতই নিবারিত হইয়া আসিতেছে, অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে। ৩। একথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।'

দ্বারা যে উপদ্রবের কথা বলিয়াছেন—সাগর বৌয়ের দ্বারা তাহা সারিয়া লইয়াছেন। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের তরুণীর প্রতি মোহটাই বড় কথা—বিবাহটা বড় কথা নয়। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে যে চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে দূষণীয় নয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের এই উক্তিতে বঙ্কিমের সায় আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। মোটের উপর, বঙ্কিম ইহাকে কুপ্রথা মনে করিলেও অবস্থা বিশেষে ইহাকে খুব বড় একটা অপরাধ মনে করিতেন না।

জাতি ভেদ সম্বন্ধে বঙ্কিমের যে মত 'সাম্যে' উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে জাতিভেদকে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধই মনে করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল—প্রাচীন ভারতে বর্ণবিভাগের প্রয়োজন ছিল একথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তাহার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই কেহ শ্রদ্ধেয় হইবেন তাহা তিনি মনে করিতেন না। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণের গুণ যাঁহার মধ্যে আছে তিনিই ব্রাহ্মণ—তিনি যে জাতির লোকই হউন। বঙ্কিম বলিয়াছেন—

"যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক তাঁহাকে ভক্তি করিব।" তিনি নিজে কোথাও ব্রাহ্মণ্য অভিমান প্রকাশ করেন নাই।

শিক্ষা-দীক্ষায় অনুন্নত সমাজের সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না—সেজন্য তাঁহার উপন্যাসে ঐ সমাজের লোকদের স্থান হয় নাই— তাহাদের প্রতি অবহেলার জন্য নয়।

সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, "সমুদ্র-যাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত।" সকল প্রাচীন আচার সম্বন্ধেই তাঁহার এই মত। যে আচার লোকহিতকর তাহা শিরোধার্য্য, যাহা লোকের ক্ষতিকর তাহা বর্জ্জনীয়। আচার দেশকালপাত্রগত ব্যবস্থা মাত্র, উহাকে বেদবিধান মনে করার কারণ নাই। প্রাচীন কালের আচার প্রাচীনকালের পক্ষে উপযোগী। বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রার পক্ষে যদি উহা অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন বাঞ্ছনীয়। ক্ষতিকর যদি না হয় তাহা হইলে দেশীয় আচার ত্যাগের কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। বঙ্কিমের মত এইরূপ ছিল।

আপনার ন্যায়বুদ্ধি ও বিবেকবুদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দেয় তাহাদের প্রতি বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিম একস্থলে বলিয়াছেন—"পূর্বজন্মার্জিত 'পুণ্য-বলে' ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মূর্খ।"

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমের কোন মতামত দেখা যায় না। তবে মনে হয় তিনি বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি উপন্যাসগুলিতে যেরূপ পূর্ব্বরাগ ও প্রণয়ের জয়গান করিয়াছেন তাহাতে বাল্যবিবাহের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব থাকার কথা নয়। তাঁহার উপন্যাসে বরং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততির বিবাহে অভিভাবকদের অবিবেচনা যে উত্তরকালে দাম্পত্যজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছে ইহা একাধিক স্থলে দেখানো হইয়াছে।

ইহা বাল্যবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে যায়। বাঙ্গালীর বাহুবল নিবন্ধে বঙ্কিম বলিয়াছেন—"ভরসা করা যাইতে পারে যে সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনে এ কুপ্রথা (বাল্য বিবাহ) সমাজ হইতে দূর হইবে।"

বঙ্কিম ইংরাজজাতি ও ইংরেজি ভাষার নিকট বার বার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। ইংরেজ শাসনের প্রশংসাও তাঁহার দুইখানি উপন্যাসে আছে। ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি আমাদের পক্ষে পরম সম্পদ্ একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাই বলিয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, এবং স্বাধীনতার মর্য্যাদাকে কোথাও ছোট করিয়া দেখেন নাই।

তিনি বিলাতি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু দেশীয় শিল্প-সাহিত্য শিক্ষাদীক্ষাকে অধিকতর শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া দেশের লোকের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষা 'অনন্তরত্নপ্রসূতি' বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, মাতৃভাষা দরিদ্রা বলিয়া তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

তিনি বলিতেন—"সদনুষ্ঠান কর দেশের মঙ্গলের জন্য সাহেবেরা প্রশংসা করিবে বলিয়া কিছু করিও না। সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য হউক—জাতির মঙ্গল-সাধন—সাহেবের তুষ্টিসাধন নয়।"

এ দেশে শিক্ষিত সমাজ ও অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা সহানুভূতির সম্পর্ক নাই—ইহা তাঁহাকে বড়ই ব্যথিত করিত। যাহাতে এই সহানুভূতির সৃষ্টি হয় এইজন্য তাঁহার একটা প্রয়াস ছিল। যে দেশহিতৈষণায় কৃষক মজুরদের কোন মঙ্গল না হয় তাহাকে তিনি অসার বাক্‌সর্ব্বস্ব মনে করিতেন। যে সকল বক্তা ও সংবাদপত্রসেবীরা তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া উচ্চশ্রেণীর লোকদের স্বার্থ লইয়া ইংরাজিতে আন্দোলন করিতেন তাহাদিগকে তিনি উপহাস করিয়াছেন। দেশের জনসাধারণ যে শিক্ষার সুফলের অংশ পাইল না, সে শিক্ষাকে তিনি অ-শিক্ষা বলিয়াছেন।

পূর্ব্বে কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদির মধ্য দিয়া দেশে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমান যুগে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, কিন্তু লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইতেছে ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল।

বঙ্কিম লোকশিক্ষা নিবন্ধে বলিয়াছেন—'ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না। কারণ, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই।

** মরুক রামা লাঙল চ'ষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, কি তার অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কানা ফসেট সাহেব, এদেশে সার এসলি ইডেন ইহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা।** সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্‌লার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।"

বঙ্কিমবাবুর সময়ে কলকারখানার প্রাদুর্ভাব হয় নাই। মজদুর বা মজুর বলিতে তখন কৃষকদেরই বুঝাইত। বঙ্কিম এই কৃষকদের কল্যাণসাধনের জন্য আন্তরিক ভাবে উৎকণ্ঠ ছিলেন। একাধিক প্রবন্ধে বঙ্কিম তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। এখানে তাঁহার একটি মন্তব্য উৎকলন করি—

"আজিকালি বড় গোল শোনা যায় যে, আমাদেব দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজেব শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড মঙ্গল হইতেছে ** দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি—তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশেব কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? হিসাব কবিলে তাহারাই দেশ। ** যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

ছয়

বঙ্কিমবাবু চবিত্রহীনা নাবীগুলি লইয়া তাঁহার উপন্যাসগুলিতে বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহাদের জীবনেব পবিণতি তাঁহার নিকট একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। প্রকৃতিব হাতে তাহাদের ছাড়িয়া দিতে পাবেন নাই। যদি তাহা দিতেন তাহা হইলে অল্প পবিসবেব মধ্যে তাঁহার উপন্যাসগুলিকে কিছুতেই শেষ করা যাইত না। বাধ্য হইয়া তাঁহার কল্পনাকে প্রকৃতিব সহিত শেষ পবিণাম পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে হইত। এই ভাবে অনুসবণ করিতে গিযা তাঁহাব কল্পনাকে যে বীভৎস পৈশাচিক রাজ্যে যাইতে হইত—বঙ্কিম তাঁহাব কল্পনাকে সেখানে প্রেবণ করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার শুচিসংযত আভিজাত্যদৃপ্ত চিত্ত বেশী দূব নামি‌তে প্রস্তুত ছিল না। প্রকৃতি অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই হীন চরিত্রকে নরকে লইযা যায় না। স্বর্গেব পথে না হউক এই মর্ত্ত্যেরই সত্যের পথে, মনুষ্যত্বের পথে তাহাকে ফিবাইয়াও আনে। বঙ্কিম প্রকৃতির সে পথও অনুসবণ করিতে চাহেন নাই—তাড়াতাড়ি তাহাদেব দণ্ড দিয়া বিদায় কবিবাব জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রধান চরিত্র বলিয়াও কাজ ফুরাইয়া গেলে তাহাদের তাড়াতাড়ি বিদায় দিতেন।

মতিবিবির কি পবিণতি ঘটিল তাহা বলিবার তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কপালকুণ্ডলার পরিণতিব পব চিত্ত এমন ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকে—নিয়তির গূঢ় রহস্য-চিন্তায় মন এমন তদ্‌গত থাকে যে, মতি বিবির খোঁজ লইতে আমাদের প্রবৃত্তিই জন্মে না। শৈবলিনীকে তিনি প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া তাহাব প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাহাকে রমানন্দ স্বামীর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাহার পরিণতি স্বাভাবিক হয় নাই। বঙ্কিমের সহানুভূতি মাথায় ধরিয়া শৈবলিনী নারী-জীবন আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার প্রতি সমাজ ও চন্দ্রশেখর রীতিমত অবিচার করিয়াছে এ কথা বঙ্কিম স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন। শৈবলিনীর চিত্তের আবিলতাব জন্য বঙ্কিমের ক্রোধ জন্মে নাই—কাহারও ভ্রূকুটি বা শাসনে কাহাকেও ভালবাসানো যায় না। শৈবলিনী যদি স্বামীকে ভালবাসিতে না পারিয়া থাকে,

তাহার জন্য শৈবলিনী দায়ী নয়—দায়ী সমাজ, চন্দ্রশেখর, অদৃষ্ট-দেবতা বা প্রেম-দেবতা। বঙ্কিমের কোপ সে জন্য নয়। হিন্দু সংসারের গৃহিণী হইয়া, আদর্শ-চরিত্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সহধর্ম্মিণী হইয়া সে যে দুঃসাহসের ও প্রগল্‌ভতার কাজ করিয়াছে, সে যে পতিনিষ্ঠতার কথা ছাড়া সাংসারিক জীবনের অন্যান্য দায়িত্বের কথাগুলি ভাবিতে পারিল না, সে যে ধৈর্য্যশীলা বুদ্ধিমতীর মত কাজ করিল না, এই জন্যই বঙ্কিমের কোপ। তাঁহার দুইটি আদর্শ চরিত্রকে সে যে তাঁহার নিজের বাসনার অতৃপ্তির জন্য ধ্বংস করিল, সে জন্যও বঙ্কিমের কোপ ছিল। যাহার উপর লেখকের কোপ থাকে, লেখক তাহাকে প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিতে পারেন না, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিজের হাতেই গ্রহণ করেন।

কুন্দের প্রাণহানির জন্য বঙ্কিম হীরার অবতারণা করিয়াছিলেন, গোড়া হইতেই হীরা বঙ্কিমের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত। হীরা একটি গৌণ চরিত্র। কিন্তু উপন্যাসের ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে হীরা প্রাধান্য লাভ করিল, তখন বঙ্কিম তাহার প্রাণের গভীর ব্যথা কোথায় তাহাও দেখিতে ও দেখাইতে বাধ্য হইলেন। বঙ্কিম তখন নিজেই আবিষ্কার করিলেন সমাজের বিরুদ্ধে তাহারও অভিযোগ করিবার আছে। কোন্ দোষে সে জীবনের সর্ব্বসুখ হইতে বঞ্চিত? অপরাধিনী হইযাই ত' সে জন্মে নাই। সমাজের অবিচারই তাহাকে অপরাধিনী করিয়া তুলিতেছে। এই ভাবে সে বঙ্কিমের সহানুভূতি পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু যাহার দ্বারা কুন্দকে হত্যা করাইতে হইবে তাহাকে ভালবাসিলে ত' চলে না। তাহাকে সেই মহাপাপের দিকে ক্রমে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইল।

তারপর বঙ্কিম হীরার পরিণতি দেখাইযাছেন উন্মত্ততায়। এই দণ্ডও বিচারক বঙ্কিমের কোপের ফল বলিয়াই মনে হয়। হীরার পরিণতির কথা বঙ্কিম বলিতে বাধ্য ছিলেন না। কুন্দের মৃত্যুতে গ্রন্থ শেষ হইলে বোধ হয় হীরার কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না। পাঠকেরও হীরার কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি হইত না। তবে হীরাও ক্রমে উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র হইয়া পড়িয়াছিল। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের পুনর্মিলনের কথা বলিতে গিয়া হয় ত' হীরার পরিণতির কথা বলিতে হইয়াছে।

এক হিসাবে হীরার পরিণতিকে প্রকৃতি-সঙ্গত বলা যাইতে পারে। হীরার জীবনের অপরিতৃপ্ত লালসা, প্রত্যাখ্যাত প্রণয়-পিপাসা ও চরিত্রের অঙ্গীভূত দারুণ ঈর্ষ্যার স্বাভাবিক পরিণতি উন্মাদগ্রস্ততা কি না বিশেষজ্ঞরা বলিতে পারেন।

সবচেয়ে দারুণ সমস্যা হইয়াছে রোহিণীকে লইয়া। রোহিণীর পরিণতির জন্য তিনি পিস্তলের প্রয়োগ করিয়াছেন। গোবিন্দলালকে চরমতম পাপী করিয়া তোলা ও রোহিণীর অপসারণ ঐ দুই পাখী তিনি এক ঢিলে মারিয়াছেন।

যাহাদের জীবনে শিল্পী ট্র্যাজেডি ঘটান, তাহারা একেবারে পাঠকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলে রস জমে না বলিয়াই আমরা মনে করি। 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' এই নীতির সার্থকতায় আমাদের ন্যায়-তৃষ্ণার তৃপ্তি হয়। ইহা অভাবমোচন মাত্র, ইহা নূতন একটা লাভ নয়। সেজন্য মনে হয় গোবিন্দলালকে খুনী বানাইয়া তাহাকে পাঠকের সহানুভূতি হইতে

বঞ্চিত না করিলেই ভাল হইত—অনেকে ইহাই মনে করেন। পক্ষান্তরে রোহিণীর জীবনেও পাঠক একটা ট্র্যাজেডির প্রত্যাশা করিতেছিল। বলা বাহুল্য, এ ট্র্যাজেডির অর্থ মৃত্যু নয়। পাপের স্বাভাবিক পরিণতিই এই ট্র্যাজেডি, অন্ততঃ জীবনের গতির একটা পরিবর্ত্তন—তাহাই প্রকৃতি-সম্মত। কিন্তু বোহিণীর হত্যায় দুইএর একটাও হইল না।

বঙ্কিমের জীবদ্দশাতেই এই ব্যাপার লইয়া সমালোচনা হইয়াছিল—বঙ্কিম অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"আমার ঘা'ট হইয়াছে। কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, একথা যিনি না বুঝিয়া একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাসপাঠে নিযুক্ত, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না কবিলেই বাধ্য হই।"

বলা বাহুল্য, ইহা উত্তরই নয়, ইহা তাঁহার হাকিমি আসন হইতে তিরস্কার মাত্র।

বলা বাহুল্য, রোহিণীবধ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা নয়। বঙ্কিমের তিরস্কার যেমন জবাব নয়, হত্যাও তেমনি criticism of life নয়। সমালোচকবাই বরং রোহিণীর জীবনের ব্যাখ্যা তাঁহাব কাছে চাহিয়াছিল। তাহাই তিনি পুস্তকেব গোড়া হইতে দিতেও ছিলেন, এইখানে আসিয়া ব্যতিক্রম করিলেন বলিয়াই পাঠকেব ক্ষোভ। অথচ বঙ্কিমকে এই অসঙ্গত ব্যাপারটি ঘটাইবাব জন্য অসঙ্গত আয়োজনও করিতে হইয়াছে কম নয়।

সাত

বাঙ্‌লার আদর্শ গদ্য ভাষা কি হওয়া উচিত এ বিষয় লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যত চিন্তা করিয়াছেন এদেশে কেহই ততটা করেন নাই। এজন্য তিনি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এত শ্রম স্বীকারও কেহ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টিকে তাঁহার দায়িত্বস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। বাঙ্‌লা গদ্য ভাষাকে তিনি যে অবস্থায় পান এবং তাহাকে যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন দুইএব তুলনা কবিলে তাঁহাব মহাব্রতকে পূর্ণ এক শতাব্দীর জাতীয় অনুশীলন এবং একাধিক সাহিত্য-বথীব সাধন-পরম্পবা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তিনি একাই ত্রিশ বৎসবের অক্লান্ত একনিষ্ঠ সাধনায় তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগব মহাশয়ের ভাষা আর রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই দুইয়ের মধ্যে কতকগুলি স্তর আছে। বাঙলা গদ্য ভাষার সব স্তবগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের হাত দিয়া অতিক্রম করিয়াছে।

বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের এই ক্রমোন্নতির প্রধান কাবণ, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্‌লা গদ্যের কোন স্তবেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। সংস্কৃতেব অনুবাদের মত গদ্যকে খাঁটি বাংলা গদ্যে পরিবর্ত্তিত করিবাব জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেবল পণ্ডিতি বাঙ্‌লার বিরুদ্ধেই তাঁহাব অভিযান নয়, তাঁহার মতে পণ্ডিতি বাঙ্‌লাও যেমন খাঁটি নয়—ইংরাজী তর্জ্জমা-করা বাঙ্‌লাও তেমনি খাঁটি বাঙ্‌লা নয়। তিনি যে সকল ইংরাজী-নবীশদের বাঙলা লিখিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং যে সকল সামসময়িক ইংরাজীনবীশরা বাঙ্‌লা লিখিত, তাহাদের ভাষা 'বাঙ্‌লা হরফে ইংরাজী' বলিয়া তাঁহার প্রীতিকর হইত

না। শেষোক্ত দোষটি তিনি ভাল করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করিবার সময়। ইংরাজীনবীশদের লেখাগুলিকে তাঁহার আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইত। শেষজীবনে তিনি বলিয়াছিলেন—'বাংলা গদ্য লেখা বড়ই শক্ত, এখন পর্য্যন্ত খাঁটি বাঙ্‌লা লিখিতে পারিলাম না।' উৎকর্ষসাধনের এই আগ্রহের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা গদ্য অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে।*

বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্রজীবনে যে গদ্য ভাষার সহিত পরিচিত হ'ন তাহার কতকটা আদালতি, কতকটা পণ্ডিতি এবং কতকটা সেকালের সংবাদপত্রের প্রচলিত ভাষা। তাঁহার হাকিম পিতার সাহচর্য্য, ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণের সাহচর্য্য ও প্রভাকর ইত্যাদি পত্রিকার সংসর্গ হইতে তাঁহার যে শ্রেণীর গদ্যভাষার সহিত পরিচয় ঘটে, তাহা তাঁহার নিকট পরে অদ্ভুতই মনে হইয়াছিল। তিনি নিজে ঐ ভাষায় ললিতাও মানসের বিজ্ঞাপন লেখেন, সে ভাষার নমুনা এই—

"সুকাব্য-সমালোচকদের অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে, ইহা বঙ্গীয় কাব্যরচনারীতিপরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়—গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সে অজ্ঞতাজনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।" ইহা তাঁহার কিশোর বয়সের ভাষা। এই ভাষাকে বঙ্কিম বলিয়াছেন—লৌকিক বাঙ্‌লা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তারপর বঙ্কিম অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের ভাষার সহিত পরিচিত হইলেন। বিদ্যাসাগরের ভাষাকে তিনি মার্জ্জিত, সুমধুর ও মনোহর বলিয়াছেন। কিন্তু এ ভাষায় তিনি বৈচিত্র্য ও ওজস্বিতার অভাব আছে মনে করিতেন। আর একটি অভিযোগ এই ভাষার বিরুদ্ধে এই—এই ভাষায় সকল প্রকার ভাবের প্রকাশ হয় না। অতীত যুগের কথা ইহাতে বেশ বলা চলে—কিন্তু বর্ত্তমান যুগের কথা ইহাতে প্রকাশ করিতে গেলে অস্বাভাবিক শুনায়। ইহাতে সম্যক্‌রূপে ভাবপ্রকাশও হয় না। বিদ্যাসাগরী ভাষা যদি চলিতে থাকে তবে সাহিত্যের বিষয়বস্তু তদুপযোগীই হইবে, বহু বিষয়বস্তু বর্জ্জিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে সাহিত্যের গণ্ডী সংকীর্ণ হইবেই, সাহিত্যের ক্রমোন্নতি হইতে পারে না বঙ্কিমবাবু ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন।

দেশের ভাষায় শক্তির পরিসর সংকীর্ণ হইলে কি অসুবিধা তাহা অপরে তেমন বুঝিবে না, যেমন বুঝিবে সাহিত্যের রচয়িতারা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস দুই তিনখানিতে

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে যাঁহারা খাঁটি বাঙ্‌লা লিখিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্য-রথিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল রামেন্দ্রসুন্দর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার। এই খাঁটি বাঙ্‌লাকে পুষ্পিত, অলঙ্কৃত, হিল্লোলিত ও সুরভিত করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বকবি হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত খাঁটি বাঙ্‌লার রূপটিকে রক্ষা করেন নাই। তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারের উপযোগী করিয়া বাঙ্‌লা গদ্য ভাষার একটা অভিনব রূপ দিয়াছেন। আমরা বঙ্কিম-ভক্ত সাহিত্যিকরা এ ভাষাকে বরণ বা হরণ করিতে পারি নাই। চারিদিকে ঐ ভাষার অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণ দেখিয়া আমরা ব্যথাই পাই।

বিদ্যাসাগর-প্রবর্ত্তিত ভাষাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির আখ্যানবস্তু অতীত যুগের এবং এগুলি ইতিহাস-রচনার ভঙ্গীতে লেখা। সেজন্য ভাষা ততটা অস্বাভাবিক মনে হয় না। বঙ্কিম কিন্তু এই বইগুলি লিখিতে গিয়া বুঝিলেন উপন্যাসের ভাষা এরূপ হওয়া উচিত নয়। উপন্যাস সর্ব্বসাধারণের জন্য রচিত, সর্ব্বসাধারণ যদি তাঁহার উপন্যাস উপভোগ করিতে না পায় তাহা হইলে তাঁহার রচনাই ব্যর্থ। বড় বড় সমাস ভাষাকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে, সংস্কৃতে যথেষ্ট অধিকার না থাকিলে ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করাই কঠিন। তারপর উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর মুখের কথা থাকে। এসকল কথা পুস্তকের মৌলিক ভাষা হইতে পৃথক হওয়া চাই। মুখের কথা মৌখিক ভাষার কাছাকাছি না লইলে অস্বাভাবিক শুনায় ও তাহাতে আর্ট ক্ষুণ্ন হয়। তাহা ছাড়া তিনি অনুভব করিয়াছেন—বর্ত্তমান যুগের আখ্যানবস্তু লইয়া উপন্যাস রচনা করিতে হইলে, এই ভাষা একেবারেই অচল হইবে। এই সকল কারণে তিনি পণ্ডিতি ভাষার উপর রীতিমত বিরূপ ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। পণ্ডিতি ভাষাকে তিনি রীতিমত বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। অপরপক্ষে পণ্ডিতেরা তাঁহার রচনার ভাষার দোষ ধরিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

এই সময়ে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরে দুলাল' বইখানি দেখিয়া তিনি উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। এই গ্রন্থপ্রকাশকে তিনি "বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত" বলিয়াছেন। আলালী ভাষাকে বঙ্কিম আদর্শ গদ্যভাষা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লসিত হ'ন নাই, পণ্ডিতি ভাষার ঠিক বিপরীত ভাষায় গ্রন্থ-রচনা দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইয়াছিল, গ্রন্থ-রচনায় পণ্ডিতি ভাষাকে একেবারে অস্বীকারের সাহস দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একদিকের চূড়ান্ত ভাষা প্রচলিত ছিল—আর একদিকের চূড়ান্তের আবির্ভাবে তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল যে, এবার দুই ভাষার মধ্যে একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনে আদর্শ গদ্য ভাষা পাওয়া যাইবে।

আলালী ভাষায় কি কি দোষ তাহাও তিনি বলিয়াছেন—

"ইহাতে গাম্ভীর্য্যের ও বিশুদ্ধির অভাব আছে···হাস্য ও করুণ রসের ইহা উপযোগী, গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাগর্ভ বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না এ ভাষা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল ও অপরিমার্জ্জিত।" আর Slangএ পরিপূর্ণ বলিয়া হুতোম পেঁচার নক্সা'র ভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই আমল দেন নাই।

তবু আলালী ভাষার আবির্ভাবে বঙ্কিম কেন উল্লসিত হইয়াছিলেন তাহার কৈফিয়ত তিনি দিয়াছেন—

"ইহাতে প্রথম বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্লাভাষা জনগণমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়। যে সর্ব্বজনগ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এভাষার পক্ষে তাহা সহজগুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নয় এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাংলা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুত চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার একসীমায় তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ

আর এক সীমায় প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহাদের কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশের দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতার দ্বারা আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই করিলেন—দুই ভাষার সমাবেশে নূতন ভাষার সৃষ্টি করিলেন। ইহাকে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—সাগরী ভাষা ও আলালী ভাষার মধ্যগা।

বঙ্কিমবাবু দুই ভাষার সমাবেশে যে ভাষায় বই লিখিতে লাগিলেন—সে ভাষা ইংরাজী-নবীশদের প্রিয় হইল। কিন্তু পণ্ডিতরা গালি পাড়িতে লাগিল। যাহাদের কাছে সাহিত্য-রস বড় কথা নয়—সমাস-সন্ধিই বড় কথা—তাহারা বঙ্কিমের রচনাকে অবজ্ঞেয় বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিল। তাহারা সংস্কৃত শব্দের সহিত খাঁটী বাঙ্‌লা শব্দের সমাবেশকে গুরু-চণ্ডালী দোষ বলিয়া ঘোষণা করিল এবং বঙ্কিম ও তাঁহার সমর্থকদলকে 'শব-পোড়া মড়া-দাহের দল' বলিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীর ভাষা অনেকটা সংস্কৃতানুগ। তবু রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার ভাষা সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন—"ঐ ভাষারই কেমন একটা ভঙ্গী আছে যাহা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়।"

অর্থাৎ মৃণালিনীর ভাষাও ভদ্রজনোচিত নয়। এই উক্তি হইতে মনে হয়—এই সকল 'পণ্ডিতগণ সাহিত্যের মাধুর্য্য বুঝিতেন না—ভাষার গাম্ভীর্য্যকেই সাহিত্য মনে করিতেন।'

যাহাই হউক, বঙ্কিম আলালী ভাষার অনুসরণ করেন নাই। করিলে আর একটি দোষ হইত। সে দোষ এই—পণ্ডিতি ভাষা জনসাধারণের কাছে যেমন দুর্ব্বোধ্য, আলালী ভাষা কলিকাতার বাহিরের লোকের কাছে তেমনি দুর্ব্বোধ্য। ইহাতে যে শহুরে idiom এবং আরবি পারসী শব্দবাহুল্য আছে—তাহা অনেকের কাছেই অপরিচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনায় যে চল্‌তি ভাষার সহায়তা লইলেন—তাহাতে এ দোষ নাই। বাঙ্গালীমাত্রের পক্ষেই তাহা সহজবোধ্য হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে সমাস-সন্ধি যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া চলিতে লাগিলেন—এবং বাক্যগুলিকে যতদূর সম্ভব ছোট ছোট করিয়া রচনা করিতে লাগিলেন, তৎসম শব্দের বদলে প্রচুর তদ্ভব শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতি ভাষায় বাঙ্‌লা idiomএর প্রবেশ নিষেধ ছিল—বঙ্কিমী ভাষায় ক্রমে সেগুলির স্থান হইতে লাগিল।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু বর্ত্তমান যুগের কাছাকাছি যত আসিতে লাগিল—ভাষাও তত প্রাঞ্জল ও চল্‌তি ভাষার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

পাত্র-পাত্রীর মুখের কথা প্রথম প্রথম পণ্ডিতি ভাষাতেই লিখিত হইত—শেষের দিকে তাহা সম্পূর্ণ চল্‌তি ভাষাতেই দাঁড়াইল। ভাষার আড়ষ্ট ভাব, পণ্ডিতি ভঙ্গী, ও সংস্কৃত ব্যাকরণের কড়া শাসন যত কমিয়া আসিল—ভাষা ততই সরস ও কবিত্বময় হইয়া উঠিল। স্বাধীনতা ও স্বাবলীলতা লাভ না করিলে কখনও ভাষায় রসসৃষ্টি হইতে পারে না।

ভাবপ্রকাশের জন্য অসংখ্য শব্দের প্রয়োজন। বাঙ্‌লার চলিত ভাষায় তাহা নাই—

সর্ব্ববিধ ভাবের সুপ্রকাশ দান করিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রয়োজনমত শব্দ আহরণ করিতে হইবে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে নব নব শব্দ গঠন করিতে হইবে—একথা বঙ্কিমবাবু বুঝিতেন। সে সকল শব্দের সমাবেশ তাঁহার রচনাভঙ্গীর পক্ষে অশোভন বা অস্বাভাবিক মনে করিতেন না। কেবল সংস্কৃত শব্দ কেন—গ্রাম্য, পার্শী, ইংরাজী, হিন্দী,—ভাবপ্রকাশের জন্য যে-কোন শব্দের প্রয়োজন হইয়াছে—তাহাই তিনি নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ বহু শ্রেণীর শব্দের সমাবেশ সেকালের পণ্ডিতদের কাছে অসঙ্গত ও অশোভন মনে হইয়াছে—কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। আমরা মনে করি উহাতে বাঙ্‌লার আদর্শ গদ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সংস্কৃতানুগ ভাষার একেবারে প্রয়োজন নাই—তাহা বঙ্কিম মনে করিতেন না। যেখানে বর্ণনীয় বিষয় বেশ গুরু-গম্ভীর, যেখানে হৃদয়ের কোন একটা গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে, যেখানে প্রকৃতির একটা অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য বর্ণনার প্রয়োজন হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে সমাসসঙ্কুল সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি এ ভাষাকে বর্জ্জন করেন নাই—নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র ঐ ভাষা প্রয়োগেরই বিরোধী ছিলেন।

আবার আলালী ভাষাকেও তিনি অপাংক্তেয় মনে করেন নাই। যেখানে বর্ণনীয় বিষয় লঘু-তরল সেখানে আলালী ভাষাই আসিয়া পড়িয়াছে। মুচিরাম গুড়ের কাহিনীতে, কৃষ্ণকান্তের উইলের স্থলে স্থলে এবং কমলাকান্তের দপ্তরের কোন কোন স্থলে বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া আলালী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা লইয়া যে দ্বন্দ্বের আজিও নিষ্পত্তি হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্র বহুপূর্ব্বেই তাহার সমাধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—রসসৃষ্টিই সাহিত্যের উদ্দেশ্য,—পাণ্ডিত্যপ্রকাশ উদ্দেশ্য নয়। যে বিষয় লইয়া রস সৃষ্টি করিতে হইবে সে বিষয়টি যে ভাষায় সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হয়—সেই ভাষাই গ্রহণ করিতে হইবে। অধিকাংশ বিষয়কে সহজ, সরল, সর্ব্বজন বোধ্য ভাষাতেই সরস শোভন প্রকাশ দান করা চলে—অতএব সেগুলির জন্য অযথা দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতানুগ ভাষার আশ্রয় লইবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি কোন বিষয়ের সরস অভিব্যক্তির জন্য সংস্কৃতানুগ ভাষার প্রয়োজন হয়—তবে সেই ভাষাতেই প্রকাশ করা হউক—অযথা বিনা প্রয়োজনে, সংস্কৃতানুগ ভাষা ব্যবহার করিবার কোন সঙ্গত হেতু দেখা যায় না। বঙ্কিমবাবুর চমৎকার মীমাংসা নিম্নলিখিত বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে—"বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে—সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরাজী, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য—যে ভাষার শব্দের প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র কোন শব্দকেই অপাংক্তেয় মনে করিতেন না—কেবল তাঁহার বলিবার কথা—যে শ্রেণীর শব্দ হউক না কেন—তাহা যেন পংক্তির যথাযোগ্য স্থানে বসে এবং যেন রসসৃষ্টি বা সম্যক্ ভাব প্রকাশের জন্যই তাহার প্রয়োগ হয়।

চল্‌তি ভাষা সম্বন্ধেও বঙ্কিমবাবুর নিজের একটা বিশিষ্ট মত ছিল। ইতর লোকের মুখের ভাষাকে তিনি কোন দিনই সাহিত্যে প্রযোজ্য ভাষা মনে করেন নাই। শিক্ষিত লোকে বা সাধারণ ভদ্রলোকে যে ভাষায় কথা বলে তিনি সেই ভাষাকেই ঈষৎ মার্জ্জিত করিয়া গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আলালী ভাষা বা হুতোমী ভাষা বাংলার চল্‌তি ভাষা বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত লোকের মুখের ভাষা। ঐ ভাষাতে গভীর বিষয়ের আলোচনা চলে না—সেজন্য ঐ ভাষাকে তিনি মার্জ্জিত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন—সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিশালী। কেন শক্তিশালী তাহা তিনি বলেন নাই। প্রচলিত ভাষায় আমরা প্রচুর লক্ষ্যার্থক বাক্যগুচ্ছ বা idiom পাইয়া থাকি। এই idiom সংস্কৃতবহুল ভাষায় নাই। সংস্কৃতবহুল ভাষায় ঐগুলিকে ব্যবহার করিতে হইলে মার্জ্জিত করিয়া লইতে হয়—ঐ মার্জ্জনায় ভিটামিনের মত তাহাদের অর্থশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই idiom-গুলির জন্যই প্রচলিত ভাষা এত জোরালো। বঙ্কিমবাবু তাহা অনুভব করিয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—তাঁহার পরবর্ত্তী রচনায় বিশেষতঃ কমলাকান্তের দপ্তরে idiom এর বাহুল্য দেখিয়া।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যস্রষ্টা, কলাকুশল ও প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্ট, শব্দাবলীর ধ্বনি, ওজন, সমাবেশের উপযোগিতা ইত্যাদি বুঝিবার কাণ তাঁহার মত কাহার ছিল বা আছে? লোকে বৃথাই দোষাবিষ্কারের চেষ্টা করিত। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই করিয়াছেন। অনেক স্থলে কোন ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন হয় নাই। স্বভাবতই তাঁহার রসগর্ভ লেখনী হইতেই যথাযোগ্য ভাষাই নির্গত হইয়াছে। উপন্যাসে তাঁহার প্রয়োজন ছিল রসের ভাষা। ইহা কোন চতুষ্পাঠীতে পাওয়া যায় না। ইহার জন্ম রসিকের মনোভূমিতে। তাঁহার রসিক মন যাহার জন্ম দিয়াছে—তাহা যে যথাযোগ্য, সে বিষয়ে কোন রসিক পাঠকের সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমবাবুর ভাষায় পণ্ডিতরা আর একটি দোষ ধরিত—আজও কোন কোন পণ্ডিত দোষ ধরে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-লঙ্ঘন। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম তিনি সংস্কৃত পদ-বিন্যাসেও মাঝে মাঝে লঙ্ঘন করিয়াছেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু অতি যত্ন সহকারেই সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনা হইতেই প্রমাণিত হয়। তবু কেন যে এইরূপ ক্রটী ঘটিত—তাহা বলা শক্ত। একজন এই ক্রটীর কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল, তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—তিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা এ বিষয়ে কাণকেই অধিকতর সূক্ষ্ম বিচারক মনে করেন। এ কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের কড়াকড়ি নিয়ম মানিবার প্রয়োজন আছে, তিনি মনে করিতেন না। তাহা ছাড়াও পণ্ডিতি ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের জন্যও হয় ত তিনি এ বিষয়ে সাবধান হইতেন না। এজন্য অজ্ঞতা দায়ী নয়, অসতর্কতাও দায়ী নয়, বোধ হয়, দায়ী অর্জুন সুলভ তেজস্বিতা।

যে সকল শব্দ বাংলায় চলিয়া গিয়াছে, সেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও

সেইগুলির প্রয়োগের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত নিয়মলঙ্ঘন। পণ্ডিতেরা এইগুলিকে দোষ মনে করিতেন এবং এখনও করেন, আমরা তাহা দোষ মনে করি না।" আমরা জানি ইতঃপূর্ব্বে, বিধাতৃ-পুরুষ, চক্ষুর্লজ্জা ইত্যাদি সংস্কৃত মতে বিশুদ্ধ। ইতিপূর্ব্বে, বিধাতাপুরুষ, চক্ষুলজ্জা লিখিলে ভুল ত' মনে করিই না, বরং এইরূপই সঙ্গত মনে করি। বঙ্কিমবাবুর মতও ইহাই ছিল

পরিশেষে বক্তব্য—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় কোন অঙ্গের বা উপকরণের আতিশয্যও নাই, দৈন্যও নাই। সংযম সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। রসনায় যেমন তিনি মিতবাক্ ছিলেন—রচনাতেও তেমনি ছিলেন। বাচালতার তিনি পক্ষপাতী নহেন। বঙ্কিমের ভাষায় বাগ্‌বাহুল্য নাই বলিয়া ইহা একদিকে যেমন গাঢ়বন্ধ, অন্যদিকে তেমনি ব্যঞ্জনাময়। রচনায় তিনি পাণ্ডিত্য প্রকাশের লোভ সংবরণ করিয়াছেন—আর তাঁহার নিজের কাছে যাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয় নাই ভাষায় তাহার প্রকাশ দানের চেষ্টা করেন নাই। তাহার ফলে ভাষা কোথাও আবিল বা অস্বচ্ছ হয় নাই, অর্থবোধ করিতে কোথাও কষ্ট হয় না, ঠারে-ঠোরে বুঝিতে হয় না। অকুণ্ঠিত নিঃসঙ্কোচ নির্ভীক স্পষ্টতার সহিত তাঁহার বক্তব্য সর্ব্বত্র উপস্থাপিত। ভাষা যেখানে ব্যঞ্জনাময় সেখানেও তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যঙ্গার্থেরই দ্যোতনা দেয়—পাঠককে অনির্দ্দেশের পথে লইয়া যায় না। ভাষার লীলা-কৌশল-চাতুর্য্য শব্দের ছটাঘটা-সমারোহ কোথাও ভাবকে গৌণ করিয়া তুলে নাই। ভাব সর্ব্বত্রই প্রধান। ভাষা তাহার বাহন মাত্র। ভাবের পরিচালনায় ও অনুশাসনে ভাষার যত কিছু লীলাবিলাস, যত কিছু কলা-কৌশল।

বঙ্কিমবাবুর আর একটি বিশেষত্ব—তিনি পাঠককে শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছেন। পাঠককে অল্পবুদ্ধি মনে করিয়া তিনি কোন জিনিসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন নাই—একটা ভাবঘন বা রসঘন কথা বলিয়া তাহার জন্য এক পাতা ধরিয়া টীকাভাষ্য করেন নাই। পাঠকের রসবোধের প্রতি বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ছিল—বঙ্কিমের মত আভিজাত্যাভিমানী লোকের পক্ষে ইহা বিচিত্র কথা বটে। কিন্তু তিনি যেমন দাম্ভিক ছিলেন তেমনি মিতভাষী ছিলেন। মিতবাক্ দাম্ভিক লোকেরা বেশী কথা বলিয়া শিক্ষকতা করিতে ভালবাসেন না।

আট

বঙ্কিমচন্দ্র এক বিষবৃক্ষ ছাড়া অন্য কোন উপন্যাসের নামকরণে গ্রন্থের মর্ম্মকথার দ্যোতকতা রক্ষা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার কল্পিত চরিত্রগুলির নামকরণে একটা সার্থকতা আছে। যেমন সূর্য্যমুখী, কুন্দ, কমলমণি, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, শৈবলিনী, ভ্রমর, রোহিণী, নন্দা, শ্রী ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"স্ত্রীরাই এ দেশে মানুষ।" ভক্তির পাত্র নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"স্ত্রীও আদর্শ মহিলা হইলে স্বামীর ভক্তির পাত্র।" বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকটিত হইয়াছে এবং স্ত্রীচরিত্রগুলিই প্রবল ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন।

Realistic উপন্যাসে বাঙ্গালী স্ত্রীচরিত্রের কথা—লাঞ্ছনা, দুঃখ-ক্লেশ ও অবিচারের কাহিনী ছাড়া আর কিছু হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস Realistic নয়, তাই তিনি নিজের আদর্শবাদের স্বপ্ন দিয়া স্ত্রী-চরিত্রগুলিকে তেজস্বিনী ও শক্তিমতী করিয়া গঠন করিয়াছেন। সমাজে তাহারা অসহায়া, অবলা। বঙ্কিম, তাহাদের সামাজিক জীবনের দুর্দ্দশা দূর করিতে পারেন নাই, সাহিত্যে তাহাদিগকে মহিমার সিংহাসনে বসাইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শ হইতে যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া হিন্দুর ঐতিহ্য ও আদর্শের সহিত মিলাইয়া তিনি বীরাঙ্গনা-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। নারীত্বের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ভ্রমরচরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গীতার বাণীকে তিনি মূর্ত্তি দান করিয়াছেন—প্রফুল্ল চরিত্রে। সীতা-রামের মত মহাবীর চরিত্র শ্রীর কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে। এমন কি শৈবলিনীর জন্য প্রতাপ জীবন উৎসর্গ করিল। বঙ্কিম প্রথম প্রথম নারীকে বলীয়সী করিয়াছিলেন রূপ-জ্যোতিতে—পুরুষ তাহাতে শলভতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে তিনি নারীত্বের আদর্শ মহিমার আবিষ্কার করিয়াছিলেন—চরিত্রবলই নারীত্বের প্রধান বল, এই সত্যকে তিনি বাণীরূপ দান করিয়াছিলেন। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর চরিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, ঐ চরিত্র লইয়া তাঁহার উপন্যাস রচনার ইচ্ছা ছিল।

বঙ্কিম উপন্যাস রচনা করিতেন ইতিহাসের ছন্দে। এমন ভাবে উপন্যাস তিনি আরম্ভ করিতেন যেন তিনি একটি পুরাতন ঘটনা বা একটি ঐতিহাসিক বিষয় বিবৃত করিতেছেন। সেজন্য বর্ত্তমান যুগের বিষয় ছাড়িয়া তিনি পুরাকালের আবহাওয়ার সাহায্য লইতেন। রচনার ভাষাভঙ্গীও সেজন্য ইতিহাসেরই উপযোগী হইত। ঘটনাপরম্পরা ও জীবনের বৈচিত্র্যের সাহায্যে তাঁহার উপন্যাস অগ্রসর হইত। চরিত্রগুলির আচরণের দ্বারা উপন্যাসের পুষ্টি হইত। চরিত্রগুলির মনের খবর বেশিকিছু বঙ্কিম জানাইতেন না—তাহাদের মুখের উক্তি ও আচরণ হইতে তাহাদের মনের কথা অনুমান করিয়া লইতে হয়। বঙ্কিমের উপন্যাসে মানসিক দ্বন্দ্ব অপেক্ষা বাহিরের জীবন-সংগ্রামই প্রবল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে মূলচরিত্র ধনিসম্প্রদায় বা অভিজাতসম্প্রদায় হইতে পরিকল্পিত। নিম্নশ্রেণীর নরনারীর স্থান কেবল ভৃত্যরূপে। দেশের আর্ত্ত লাঞ্ছিত জনগণের বেদনা তাঁহার উপন্যাসের উপজীব্য হয় নাই—রসসৃষ্টির সহায়তাও করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের জনসাধারণকে উপেক্ষা করিতেন তাহা নহে, তাহাদের জীবন লইয়া, তাহাদের দুঃখকষ্ট অভাব অভিযোগ লইয়া খেলা করা, রঙ্গ করা বা সহানুভূতির অভিনয় করাকে তিনি হৃদয়হীনতা মনে করিতেন।

বঙ্কিমের কল্পনাশক্তি ছিল অবাধ ও সুদূরপ্রসারী। মোগলরাজের অন্তঃপুর হইতে, গ্রামের পোষ্টাপিস, রাজপুতনার গিরিসঙ্কট হইতে হিজলির বালিয়াড়ি কোথাও তাঁহার কল্পনা বাধা পায় নাই। এইরূপ কল্পনার অবাধ লীলার জন্য তাঁহার উপন্যাসগুলি অপূর্ব্ব Romanceএ পরিণত হইয়াছে।

বঙ্কিমের অনেক চরিত্র রক্তমাংসের মানুষ নয়। কোন একটা ভাবকে তিনি নারী

বা নরের রূপ দান করিতেন। যাহাকে বলে ভাববিগ্রহ (Personified Ideas,) তাহাই। যেমন—চরিত্রগুলির কোনটিতে সতীধর্ম্ম, কোনটিতে সংযম, কোনটিতে বীরধর্ম্ম, কোনটিতে ইন্দ্রিয়-লালসা, কোনটিতে সারল্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

ট্র্যাজেডি নানা ভাবেই সংঘটিত হয়। মানুষ সমাজের দাস। মানুষের স্বাভাবিক জীবন-প্রবাহে যখন সমাজবিধান বাধা দেয়, তখন ট্র্যাজেডি হয়। মানুষ প্রবৃত্তির দাস—প্রবৃত্তিকে জয় করিতে না পারিলে অসৎ প্রবৃত্তি পরিণামে ট্র্যাজেডি ঘটায়। লখীন্দরের লৌহগৃহে একটিমাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল—সেই ছিদ্রই বেহুলার দাম্পত্য জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটাইল! একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সবল চরিত্রেও এমনি একটি কোন অঙ্গহানি থাকিতে পারে—সেই অঙ্গহানিই শেষপর্য্যন্ত ট্র্যাজেডি ঘটায়। একটি স্ফুলিঙ্গই একটি পুরী ধ্বংস করিতে পারে। সব চেয়ে বড় কথা—দেহের মৃত্যুর চেয়ে মনের শোচনীয় পরিণামেই ট্র্যাজেডি অধিকতর সাফল্য লাভ করে।

সাধারণতঃ Tragedy বলিতে আমরা বুঝি—নিয়তির বেদীর পাশে মানুষের বলিদান। কিন্তু প্রকৃত Tragedy বলিদান নহে—নিয়তির সহিত সংগ্রামে মানুষের পরাজয়েই হয় প্রকৃত Tragedy। মানুষ আর মহাষ্টমীর ছাগ এক নহে। মানুষকে যদি নিয়তির সহিত সংগ্রাম করিতে না দেওয়া হয় তাহা হইতে তাহাকে খুব ছোট করিয়া দেখা হয়। মানুষের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা—কবি না বুঝিলে আর কে বুঝিবে? পরাজয়ে মানুষের অগৌরব নাই,—কী মহাশক্তির সঙ্গে তাহার সংগ্রাম তাহা ভাবিয়া দেখিলেই হয়। মানুষ ঘটনার দাস—নিয়তির ক্রীড়নক।—তবু মানুষ যে নিয়তির দাসত্ব সহ্য করিতে চাহে না,—নিয়তির ইঙ্গিতে শ্মশাননৃত্য নাচিতে চাহে না।—সে বিদ্রোহী হয়—মনুষ্যত্বের সমগ্র শক্তির উদ্বোধন করিয়া সংগ্রাম করে এবং শেষে মৃত্যুকেই বরণ করে—ইহাতেই তাহার গৌরব। মনুষ্যত্বের এই গৌরব যে রচনায় পরিস্ফুট তাহাই প্রকৃত ট্র্যাজেডি। কোন প্রকারে বিয়োগান্ত করিয়া তোলাই ট্র্যাজেডি নয়। পরাজয়ে বা মৃত্যুতে বৈচিত্র্য নাই সংগ্রামেই বৈচিত্র্য,—এই সংগ্রামই কবির রচনাকেও বৈচিত্র্য দান করে। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় Tragedy একটা আদর্শ বা বড় একটা ব্রত কোন অন্তর্নিহিত পাপ বা দুর্ব্বলতার জন্য যখন বিনষ্ট হয়।

বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসই ট্র্যাজেডি। কপালকুণ্ডলা ট্র্যাজেডি—এখানে নিয়তির বেদীতে নায়কনায়িকার বলিদান—ইহা প্রাচীন গ্রীক প্রথার ট্র্যাজেডি। কৃষ্ণকান্তের উইলও ট্র্যাজেডি ইহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। গোবিন্দলালের অতৃপ্ত রূপপিপাসা এখানে Tragedyর বীজ। বিষবৃক্ষও ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সূর্য্যমুখীর সহিত শেষে নগেন্দ্রনাথের মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নয়?" এখানে কুন্দের আত্মহত্যা নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর দাম্পত্য জীবনকে যে ভীষণ আঘাত দিয়া গেল, তাহাতেই হইল ট্র্যাজেডি। নায়ক-নায়িকার মনের শোচনীয় পরিণামই এখানে ট্র্যাজেডি। চন্দ্রশেখরে প্রতাপ, শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর তিনের জীবনে তিনভাবে ট্র্যাজেডি সংঘটিত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখরে সামাজিক বিধানই নিয়তির কাজ

করিয়াছে। বৈবাহিক সম্বন্ধের অসামঞ্জস্যই ট্র্যাজেডির মূল। রোহিণীর সহিত গোবিন্দলালের এবং প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইলে এইরূপ ট্র্যাজেডি হইত না—বঙ্কিম প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন।

আনন্দমঠ ও সীতারাম দুইই ট্র্যাজেডি—অন্তর্নিহিত পাপ ও দুর্ব্বলতার বীজের জন্য একটি মহাব্রত বা একটি বিরাট আদর্শের পতনে ট্র্যাজেডি হইয়াছে। মৃণালিনীকেও ট্র্যাজেডি বলা যায়। National Tragedyই এখানে গ্রন্থের Tragedy। দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্ল রাণীগিরি ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার সংসারে দাসীত্ব করিতে লাগিল—প্রফুল্লের সঙ্গে ব্রজেশ্বরের মিলন ঘটিল। তবু দেবী চৌধুরাণী একটি ট্র্যাজেডি। এখানেও একটি মহাব্রতের শোচনীয় পরিণাম দেখানো হইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে সর্ব্বশ্রেণীর ট্র্যাজেডিই দেখা যায়। প্রায় সকল ট্র্যাজেডিতেই পাত্রপাত্রী—নিয়তি বা প্রকৃতির বিধানের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পরাভূত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর

চন্দ্রশেখরকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হয়, কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইহাতে মীরকাসেম, তকি খাঁ, গুরগণ খাঁ ইত্যাদি কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু ঘটনাগুলির অধিকাংশ বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসূত। বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় বলিয়াছেন—'ইহার ঐতিহাসিক অংশ 'সয়ের উল মুতাক্ষরীণ' হইতে গৃহীত।' গ্রন্থের মূল আখ্যায়িকার পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী ছিল না, যুগপরিবেশসৃষ্টির জন্য তাহার প্রয়োজন ছিল।

চন্দ্রশেখরে দুইটি আখ্যায়িকাকে অনুস্যূত করা হইয়াছে, একটি শৈবলিনীর, অপরটি দলনীর। প্রথমটি মুখ্য, দ্বিতীয়টি গৌণ, দুইটির মধ্যে ভিতরকার যোগ নাই। বঙ্কিম যে সংযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাহিরের। গৌণ আখ্যায়িকার সঙ্গেই ইতিহাসের সংযোগ আছে; দ্বিতীয় আখ্যায়িকাটিকে ঐতিহাসিক আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিফলিত করা হইয়াছে। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যময়ী কল্পনা সহজেই ঐতিহাসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারিত। তাহার ফলে প্রাচীন সংস্থিতিকে অবলম্বন করিয়া রচিত তাঁহার উপন্যাসগুলি যুগপ্রতীকরূপে ঐতিহাসিকতার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থে সেকালের ইংরেজ, বাঙ্গালী ও মুসলমানের চরিত্র ও জীবনযাত্রা পরিবেষ্টনীর অঙ্গীভূত হইয়া যথাযথ রূপেই ফুটিয়াছে। বঙ্কিম কেবলমাত্র শিল্পী হইলে ইহা পারিতেন না, তিনি পুরাতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার কল্পনা ইতিহাসের অস্পষ্ট উপকরণ হইতে প্রাচীন যুগ-বিশেষকে গড়িয়া লইতে পারিত বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

নবাব মীরকাসেম স্বাধীনচেতা ছিলেন, তিনি কোম্পানির কর্তাদের গোলামি করিতে রাজি ছিলেন না; তিনি ন্যায়নিষ্ঠ নবাব ছিলেন, কোম্পানির ব্যাপারীদের যথেচ্ছাচার ও প্রজাপীড়ন তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল, তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নবাব ছিলেন—স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে ও রাজ্যবিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন। বাণিজ্যের শুল্ক লইয়া তাঁহার সহিত ইংরেজের বিবাদ বাধে। তিনি ইংরেজকে দেশ হইতে তাড়াইতেও চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজের মতো কৌশলময়ী বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে দেশীয় সেনা কেমন যেন হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল, ইংরেজের বাহুবলের ও রণকৌশলের সম্মুখে দেশীয় সৈনিক দাঁড়াইতে সাহস করিত না। মীরকাসেম ইংরেজের রণনীতি দেশীয় সৈনিকগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইউরোপীয় যোদ্ধার দ্বারা দেশীয় সৈনিকপরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অস্ত্রশস্ত্রের বলেও নবাবী সেনা ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও দেশীয় সেনা বীর্যে, অধ্যবসায়ে, রণজয়ের আন্তরিক আগ্রহে, তেজস্বিতায়, দুর্দ্ধর্ষতায় ইংরেজের কাছে হীনবল ছিল। প্রথম মুসলমান আক্রমণের সময়ে ভারতে হিন্দুসেনার যে অবস্থা, ইংরেজ আক্রমণের সময়ে মুসলমান সেনারও সেই অবস্থা। কাটোয়া, গিরিয়া ও উধুয়ানালা এই তিন স্থলে ইংরেজের সহিত নবাবী সেনার যুদ্ধ হয়, তিনটি যুদ্ধেই মীরকাসেম পরাভূত হন।

পক্ষান্তরে ইংরেজ প্রধানতঃ দেশীয় সৈন্তের সাহায্যেই দেশ জয় করে। ইংরেজ বণিকদের অর্থবল ছিল ঢের বেশী। অর্থের সাহায্যেই উভয় পক্ষে সৈন্য বল সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। ইংরেজেরা যথেষ্ট দেশীয় সিপাহী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। আপনাদের দেশরক্ষা করিতে হয় দেশপ্রাণতার প্রেরণায়। কিন্তু এদেশের কোন লোক দেশাত্মবোধের প্রেরণায় নবাবকে সাহায্য করে নাই। বেতনভোগী সৈনিকেরা যুদ্ধ করে বটে, কিন্তু প্রাণপণে যুদ্ধ করে না। পক্ষান্তরে ইংরেজরা এ দেশে বাণিজ্য করিতে করিতে বুঝিল—এ দেশ সম্পূর্ণ জয় করিতে না পারিলে তাহাদের বাণিজ্যের উন্নতি তো নাই-ই, ক্রমে কুঠিও উঠাইয়া দিতে হইবে। পরাভবস্বীকারের জন্ত তাহারা সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া এ দেশে আসে নাই। তাহাদের স্বার্থবুদ্ধি অতি প্রখর, তাহার চেয়েও প্রখর তাহাদের জাতীয় ভাব। তাহারা বুঝিত প্রাণ দিয়াও যদি ইংরেজ জাতির সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলেও প্রাণদান সার্থক। পলাশীর যুদ্ধ হইতেই তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল—এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব-প্রতিষ্ঠা অতি সহজ। বুঝিতে পারিয়াছিল—দেশীয় লোকদের কাছ হইতে তাহারা কোন বাধাই পাইবে না, বরং সহায়তাই পাইবে। এই সহায়তা তাহারা বিনা অর্থ ব্যয়েই পাইবে। তাহাদের জাতীয় চরিত্রের সহিত দেশকালগত ধারণার যোগ হওয়ায় তাহারা দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যন্ত দৃঢ়তা, আন্তরিকতা, তেজস্বিতা ও দুর্দ্ধর্ষতার সঙ্গে তাহারা লড়িয়াছিল, দেশীয় বেতনভোগী সিপাহীরাও ইহাদের সঙ্গে বাধ্য হইয়া দৃঢ়তার সহিতই যুদ্ধ করিয়াছিল।

আবেষ্টনীসৃষ্টির জন্ত বঙ্কিম এই পুস্তকে এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি মিরকাসেমের কোন কোন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার কথাও বলিয়াছেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা স্বার্থসাধন এ দেশের ক্ষমতাপন্ন লোকদের মজ্জাগত—ইহার ঐতিহ্য বরাবর চলিয়া আসিতেছে। অল্পদিন আগে তাহার ফলে সিরাজের পতন হইয়াছে—মিরকাসেমের সময়ও তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তকি খাঁর কথা বঙ্কিম যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, তকি খাঁই যে মিরকাসেমের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন এবং তিনিই যে প্রাণপণে নবাবী মসনদ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসে সুপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিম তকি খাঁর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। দলনী বেগমের কাহিনীতে ইতিহাসের সমর্থন আছে বলিয়া মনে হয় না—বোধ হয় সম্পূর্ণ বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসূত।

চন্দ্রশেখরকে বঙ্কিম ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া চালাইতে চাহেন নাই, তাহার প্রমাণ পুস্তকের মধ্যেই আছে। তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র মিরকাসেমের সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করিয়া, সেগুলিকে পাশ কাটাইয়া দলনী ও শৈবলিনী লইয়াই ব্যস্ত। ঐতিহাসিক তথ্য ও সংস্থিতি পরিবেষ্টনীর অঙ্গ মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন ইংরেজের কামান শিবিরের বাহিরে গর্জন করিতেছে, তখন তিনি দলনী ও শৈবলিনী অকলঙ্কিতা কি না তাহাই জানিবার জন্ত জবানবন্দি শুনিতেছেন। প্রতাপ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইতেছে—শৈবলিনীর সুখের জন্ত প্রাণ দিতে। বাঙলার ভাগ্য যাহাতে চিরদিনের জন্ত অন্ধকার হইল, সেই তিনটি যুদ্ধের কথা চার পংক্তিতেই শেষ হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরে দুইটি প্রধান সত্যকে রূপায়িত করিয়াছেন। একটি চন্দ্রশেখরের পক্ষ হইতে। যিনি কোন একটি মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া তাহাকে একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করেন, তিনি অনেক সময়ে চারিপাশের নিত্যপরিচিত চিরন্তন সত্যগুলিকে দেখিতে ভুলিয়া যান। তিনি মহাপ্রাজ্ঞ হইয়াও ভ্রান্ত। উচ্চতর সাধনায় তন্ময় তদ্গত ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী। তাঁহার সংসারী না সাজাই উচিত। দাম্পত্য সম্পর্ক কেবল অন্নবস্ত্রের সম্পর্ক নয়। এই সম্পর্ক অত্যন্ত গূঢ় ও গভীর। দাম্পত্য জীবনের সর্বাঙ্গীণ কর্তব্য যিনি পালন করিতে পারেন না, কেবল গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধন রক্ষার জন্য সুন্দরী পত্নী ঘরে আনেন, তাঁহার দণ্ড ও দশা চন্দ্রশেখরের মতোই হয়।

আর একটি সত্য শৈবলিনীর পক্ষ হইতে। বাল্য কৈশোরের প্রণয় অত্যন্ত গাঢ়, গভীর ও দুর্দম। এই প্রণয় যদি একবার জন্মে, সামাজিক সংস্কার যদি তাহাতে মিলনের অন্তরায় হয় এবং যদি অন্য কাহারও প্রেমপ্রীতিবাৎসল্য বা অন্য কোন বন্ধন তাহা ভুলাইতে না পারে, তবে তাহা শেষ পর্যন্ত অনর্থের সৃষ্টি করে। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মসংযমই মানুষকে রক্ষা করিতে পারে। এই আত্মসংযম যদি স্বভাবতঃ না থাকে, অথবা আত্মসংযমের সাধনা বা শিক্ষা না হয়, তাহা হইলে নরনারী নিজে দগ্ধ হয় ও অপরকেও দগ্ধ করে।

বঙ্কিম এই গ্রন্থে অবৈধ প্রণয়ের চিত্র অঙ্কন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিষময় ফল বা প্রায়শ্চিত্ত দেখাইবার জন্য এরূপ চিত্র অঙ্কনে দোষ নাই—ইহাই বঙ্কিমের ধারণা ছিল। তিনি মনে করিতেন ইহাতে আর্ট ক্ষুণ্ণ হয় না, অথচ সমাজের মঙ্গল হয়। যে কুপথে যায় সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—ইহাই তিনি অন্যান্য গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। যে কুপথে যায়, সে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সুপথে ফিরিতে পারে ইহাও সত্য। এই সত্য চন্দ্রশেখরে রূপায়িত করিবার জন্য শৈবলিনী-চরিত্র আঁকিয়া লেখনী কলঙ্কিত (?) করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"একদিন সে একথা বুঝিবে, একদিন প্রায়শ্চিত্তের জন্য সে অস্থি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে আমরা এ পাপচরিত্রের অবতারণা করিতাম না।"

গ্রন্থের নাম চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের জীবনকে বেষ্টন করিয়া এই উপন্যাসের সৃষ্টি। চন্দ্রশেখর একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। "তিনি ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত—ব্রাহ্মণপণ্ডিত নহেন, ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, কাহারও দান গ্রহণ করেন না। তিনি সর্বদা শাস্ত্র আলোচনাতে তন্ময় ও অন্যমনস্ক হইয়া থাকিতেন। বাহ্যবস্তুতে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, লোভও ছিল না। এইরূপ মানুষের জীবন সর্বদেশেই নমস্য—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে। জ্ঞানচর্চার পরমানন্দ, আধ্যাত্মিক আনন্দ ও জনগণের শ্রদ্ধা লইয়াই এ জীবন। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিও যদি প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে, তবে প্রকৃতি তাহাকে ক্ষমা করে না।

বত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর বিবাহ করেন নাই। সেকালে ১৮।১৯ বৎসর বয়সেই বিবাহ হইত। 'সময়ে বিবাহ' অর্থে তাহাই বুঝাইত। সময়ে বিবাহ হইলে চন্দ্রশেখরের জীবন হয়ত অন্যরূপ হইত। দারপরিগ্রহে জ্ঞানার্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তিনি বিবাহ

করেন নাই। যতই বয়ঃক্রম বাড়িতে লাগিল ততই তাঁহার জ্ঞানানুরাগ বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার বিবাহ করিবার অধিকারও কমিয়া আসিতে লাগিল।

বত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করিলেন। অন্তর হইতে বিবাহের তাগিদ পাইলে তাহাতেও দোষ হইত না। তাহা তিনি পান নাই। সাংসারিক নানা অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তাঁহার বিবাহ। এরূপ উদ্দেশ্যে বিবাহ করিবার অধিকার কতটা আছে, ভাবিয়া দেখা দরকার ছিল, এবং বিবাহ করিলে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কন্যা নির্বাচন করা উচিত ছিল। চন্দ্রশেখরের শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট ছিল, কিন্তু লৌকিক জ্ঞান ছিল না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, "যদি বিবাহ করি, সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না।" কিন্তু এখানেও তাঁহার গণনায় ভুল ছিল। সুন্দরীর পক্ষ হইতে ভাবিয়া এ সংকল্প করেন নাই, নিজের পক্ষ হইতে ভাবিয়াছিলেন। সুন্দরীর দ্বারা মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা—সংসারমায়ায় মুগ্ধ হওয়া চলিবে না। সুন্দরীর পক্ষ হইতে ভাবিলে চন্দ্রশেখরের পক্ষে এ সংকল্প স্থির থাকিত। নিজের পক্ষ হইতে ভাবিয়াছিলেন বলিয়া এ সংকল্প টলিল। রূপের পূজারী বঙ্কিম রূপের মর্য্যাদা না রাখিয়া পারেন না। তিনি সংযমীর ব্রতের চেয়ে রূপের শক্তি প্রবলতর বলিয়া মনে করেন। 'সৌন্দর্য-মোহে কে না মুগ্ধ হয়? তাই শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল'—চন্দ্রশেখর রূপমুগ্ধ হইয়াই শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। শৈবলিনী তখন ষোড়শী।

তারপর ষোড়শীকে লইয়া চন্দ্রশেখর কি করিলেন? তিনি ভুলিয়া গেলেন, শৈবলিনী রক্ত-মাংসের মানুষ—তাহার যৌবন আছে, যৌবনের তৃষ্ণা আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা সবই আছে। তাহার নারীত্বকে চন্দ্রশেখর উপেক্ষা করিলেন, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, নিজের ভুল বুঝিলেন না। একেবারেই বুঝিতেন না তাহা নহে, কিন্তু তাহা সাময়িক উদ্বোধন মাত্র, ভুল তাঁহার চরিত্রের অঙ্গীভূতই ছিল। তাঁহার নিজের উক্তি—'হায় কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি? এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত, শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া 'আমি' সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স তাহাতে শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত, আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেইজন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এখন আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া রমণীমুখপদ্ম কি জন্মের সারভূত করিব? ছি ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে?"

শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখরের আচরণ ও মনোভাব ইহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের চরিত্রও ইহাতে স্ফুটতর হইয়াছে।

তাহার পর শৈবলিনীর মুখের কথা—"গৃহে থাকিতে মনে করিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি, নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া

থাইব, নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব।" শৈবলিনীর এই ক্ষোভই চন্দ্রশেখরের ভ্রান্তির কথা পরিপোষণ করিতেছে।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর যৌবনতৃষ্ণা নিবারণ করেন নাই, এবং মহাপণ্ডিত হইয়াও শৈবলিনীকে মৈত্রেয়ীর মত জ্ঞানসঙ্গিনী করিবারও চেষ্টা করেন নাই। তাহাও একটা বন্ধন হইতে পারিত। অবশ্য তাহা হয়ত বালির বাঁধ, কিন্তু তাহার চেষ্টাও তিনি করেন নাই।

ইহার অনিবার্য ফল ফলিল। চন্দ্রশেখর দেখিলেন—শৈবলিনী পালাইয়াছে। তিনি তাঁহার গ্রন্থরাশিতে অগ্নিদান করিলেন। ঐ অগ্নি যতই জ্বলিতে লাগিল, চন্দ্রশেখর-চরিত্র ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই চিত্রটির তুলনা নাই।

এখানে একটি কথা আছে, চন্দ্রশেখর তখনও জানেন নাই—শৈবলিনী নিজে ইচ্ছা করিয়া কুলত্যাগ করিয়াছে, জানেন যে সে সবলে অপহৃতা।

শৈবলিনীকে অবিশ্বাসিনী জানিয়া গ্রন্থরাশিতে অগ্নিদান করিলে চিত্রটি শোভনতর হইত। শৈবলিনীর মৃত্যু হইলে চন্দ্রশেখর যে বেদনা পাইতেন, সেইরূপ বেদনাতে সন্তপ্ত হইয়া তিনি গ্রন্থরাশিতে অগ্নিদান করিয়া গৃহত্যাগী হইলেন। চন্দ্রশেখর নারীজীবনের মর্যাদা বুঝিতেন না, কিন্তু শৈবলিনীকে ভালবাসিতেন।

তারপর চন্দ্রশেখর কয়েকবার দেখা দিয়াছেন, কিন্তু আত্মস্বাতন্ত্র্য হারাইয়া গুরুর করপুত্তল রূপে। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর দৈহিক শুদ্ধির পরীক্ষা করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে চন্দ্রশেখরের চরিত্রের গৌরব কি রক্ষিত হইল? তিনি জীবনসর্বস্ব পুঁথিগুলি অগ্নিসাৎ করিয়াছেন, তাঁহার কি আর সংসারী হইবার কথা? ইহা তাঁহার মহানুভবতা না দুর্বলতা? শৈবলিনীর প্রকৃত বিবাহ (মনে মনে) হইয়াছিল প্রতাপের সঙ্গে। এই প্রতাপ বাঁচিয়া থাকিতেও তাহাকে গ্রহণ করা যায় না, মরিলেও গ্রহণ করা যায় না। চন্দ্রশেখর জানিয়া শুনিয়া তাহাকে কি করিয়া গ্রহণ করিলেন? চন্দ্রশেখর নিশ্চয়ই স্বীকার করিতেন বিধবা হইলেই স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ যায় না। সতীত্বধর্মের মর্ম যদি শৈবলিনী কিছু শিখিয়া থাকে, তাহাতে চন্দ্রশেখরের লাভ নাই। শৈবলিনীর সত্য সত্যই যে স্বামী তাহার প্রতিই ভক্তি বাড়িবার কথা! প্রতাপ শৈবলিনীর জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহার চিত্ত হইতে বিদায় লইল না—আরো দৃঢ়তর করিয়া তাহার চিত্তে শাশ্বত আসন প্রতিষ্ঠিত করিল। বৈবাহিক সংস্কারের বশে নামমাত্র স্বামীর জন্য প্রাণ দেওয়া যায়, হৃদয় দেওয়া যায় না। এই মিলনকে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবালিনীর দ্বিতীয়বার বিবাহ বলা যাইতে পারে। চন্দ্রশেখর প্রথমবার যে কারণে বিবাহ করিয়াছিলেন, এ বিবাহও সেই কারণে। চন্দ্রশেখরের একজন গৃহিণীর প্রয়োজন ছিল। চন্দ্রশেখর প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, পুঁথিপত্রের প্রয়োজন তাঁহার পক্ষে বহুগুণে বাড়িয়াছে। আবার তিনি পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিবেন। এবার নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্মচর্চায় ও গ্রন্থপাঠে মগ্ন থাকিতে পারিবেন। শৈবলিনী আর পলাইবে না। এবার পলাইতে হইলে লোকান্তরে যাইতে হয়। তবে প্রতাপের স্মৃতি? চন্দ্রশেখর সেজন্যও উৎকণ্ঠ নহেন। তিনি প্রেম চাহেন নাই, চাহিয়াছিলেন সতীধর্ম। তাহা আর বিচলিত হইবে না—

এই অবস্থায় চন্দ্রশেখর নিশ্চিন্ত। মোটের উপর, চন্দ্রশেখর স্বামিত্বের ছায়াতলে অভাগিনী শৈবলিনীকে আশ্রয় দিলেন, এজন্য প্রত্যাসন্ন সামাজিক শাসনপীড়নও শিরে ধারণ করিলেন। চন্দ্রশেখর সত্যই মহানুভব। চন্দ্রশেখর শৈবালিনীর পুনর্মিলনই আসল ট্রাজেডি। কুন্দের আত্মাহুতি যেমন নগেন্দ্র সূর্যমুখীর পুনর্মিলিত দাম্পত্য জীবনে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিয়াছে—প্রতাপের আত্মাহুতি তেমনি এই পুনর্মিলনেও আসল ট্রাজেডির সৃষ্টি করিল। একই শয্যায় শয়িত দুইজনের মধ্যে জ্বলিতে থাকিল চিরদিন ধরিয়া প্রতাপের চিতা।

পর্বত-গৃহ ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অধোগামিনী হইয়া যখন শৈবলিনী সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলে, তখন পথে কোথাও তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা যায় না। এই ভাবিয়াই বোধ হয় বঙ্কিম নায়িকার নাম শৈবলিনী রাখিয়াছিলেন।

শৈবলিনী পল্লীর অশিক্ষিতা বুদ্ধিহীনা, দরিদ্রগৃহস্থকন্যা, প্রতাপের ক্রীড়াসঙ্গিনী, তাহার মূঢ় বিশ্বাস প্রতাপের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। এই ধারণা নির্বোধ বালিকার স্বাভাবিক ভালবাসাকে দৃঢ়তর করিয়াছিল, বয়সের সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ হইলে সে বুঝিল বিবাহ হইবে না—কিন্তু মনত আর ফিরে না। কি করিয়া এই প্রেমের ক্রমোন্মেষ হইল বঙ্কিম তাহা দেখান নাই। দুজনে (প্রতাপ ও শৈবলিনী) জলে ডুবিয়া মরিতে গেল। প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী পারিল না। শৈবলিনী-চরিত্রে দৃঢ়তার যে অভাব তাহারই পূর্বাভাষ দেওয়া হইয়াছে ইহাতে।

শৈবলিনীর বয়স এখন কত বঙ্কিম তাহা বলেন নাই, বলিয়াছেন সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূরিতে লাগিল। ইহাতে ১৪।১৫।১৬ বৎসর এমনি ধরা যাইতে পারে। বিবাহের সময়ে শৈবলিনীর মনের অবস্থা কি ছিল, কি ভাবে সে অবাঞ্ছিত বিবাহ বরণ করিল, বঙ্কিম সেকথাও বলেন নাই। শৈবলিনী স্বামিগৃহে আসিয়া আট বৎসর কি ভাবে জীবনযাপন করিল, বঙ্কিম তাহাও বলেন নাই, একেবারে আট বৎসর পরের কথা লইয়া মূলগ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। আধুনিক উপন্যাসে এ সকল কথা বাদ দেওয়া চলে না। ইহাতেই গ্রন্থের অনেকাংশ অধিকৃত হয়।

এই আট বৎসর শৈবলিনীর নিঃসঙ্গ জীবনে অন্য সঙ্গী সঙ্গিনী নাই। স্বামী কখনও বিদেশে, কখনও গৃহে। গৃহে থাকিলে গ্রন্থ লইয়া তন্ময়, স্বামীর প্রেমচর্চার অবসর নাই, গৃহের কাজও সামান্য, সেজন্য বেশী সময় লাগে না। এইরূপ জীবন স্বপ্নস্মৃতি ও কল্পনালীলার পক্ষে অনুকূল। শৈবলিনীর তৃষিত যৌবন প্রতাপের স্বপ্নেই কাটিল। যতই চন্দ্রশেখরের ঔদাসীন্য, ততই শৈবলিনীর পূর্বরাগের বৃদ্ধি।

চন্দ্রশেখর পত্নীকে সর্বপ্রকারে উপেক্ষা করিয়াছেন। এমন কি প্রাচীন আর্য্যপ্রথায় সারস্বতসাধনায় সঙ্গিনী করিয়া তুলিবার চেষ্টাও তিনি করেন নাই। অশিক্ষিতা রমণী জ্ঞানানুশীলনমগ্ন দেবতুল্য স্বামীর মর্যাদা কি বুঝিবে? শৈবলিনীর কোন সন্তান হইল না। মঞ্জরিত যৌবন মাতৃত্বে ফলবান হইলে তাহার চিত্ত অবনত হইয়া পড়িত—নূতন মাধুর্যের আস্বাদ পাইত—জীবন ব্যর্থ হইত না। সন্তান একটা মস্ত বন্ধন।

প্রতাপকে ভুলাইবার কোন ব্যবস্থাই হইল না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতাপের প্রতি

অনুরাগই ক্রমে বাড়াইয়া তুলিল। এ সকল কথা বঙ্কিম স্পষ্টভাবে বলেন নাই—ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র।

ক্রমে নির্বন্ধন নিঃসঙ্গ স্বাধীনতার মধ্যে তাহার চিত্ত অসমসাহসী হইয়া উঠিল। সাহস এত বাড়িল যে, যে-গোবাসাহেব দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক ত্রস্ত হইয়া উঠে, তাহার সহিতই সে পলাইল। লোকে ভাবিল সাহেব তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনীর পলায়নের উদ্দেশ্য, প্রতাপের সন্ধান করিয়া প্রতাপের চরণে আত্মসমর্পণ। সুন্দরী তাহাকে ফিরাইতে গেল, সুবিধা পাইয়াও সে ফিরিল না, বলিল—ভিক্ষা করিয়া খাইবে তবু ফিরিবে না, বলিয়া গেল—"স্বামীকে কখনও ভালবাসিতে পারিব না।" সাহেবের প্রতি অনুরাগ ছিল না, আত্মরক্ষার জন্য ছুরিকা সঙ্গে লইয়াছিল। সাহেবকে ছুরিকার ভয় দেখাইয়া ও আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়া সে দৈহিক শুচিতা রক্ষা করিয়াছিল। হিন্দু আচার যাহাতে নষ্ট না হয় সেদিকেও বঙ্কিম সতর্ক হইতে ভুলেন নাই। কারণ, শৈবলিনীকে আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

প্রতাপ তাহাকে উদ্ধার করিলেন। সে প্রতাপকে পাইল, কিন্তু পাইয়াও পাইল না। প্রতাপ আত্মসংযমী পুরুষ—শৈবলিনীর প্রেমনিবেদনে ভুলিল না। শৈবলিনীর অনুতাপ আরম্ভ হইল, "মনে ভাবিয়াছিলাম, গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব, মনে করিয়াছিলাম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরিয়া যাইব, কুঠির বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষজাল পাতিয়া প্রতাপপক্ষীকে ধরিব, সুবিধা বুঝিলে সেখান হইতে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইব—গিয়া প্রতাপের পদতলে লুটাইয়া পড়িব। আমি পিঞ্জরের পাখী, সংসারের গতি কিছুই জানিতাম না।" কিন্তু সে প্রতাপের আশা ত্যাগ করিল না। প্রতাপ তাহার জন্য বন্দী হইল, তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য নৌকা লইয়া সে ছুটিল, প্রতাপ মুক্তিলাভ করিল। তারপর গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ। প্রতাপ শপথ করাইয়া লইলেন—"বল আমায় ভুলিবে।" শপথ না করিলে প্রতাপ ডুবিয়া মরিবে। তাহার কথাও যাহা, কাজও তাহাই। শৈবলিনী শপথ করিল, "তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণবাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন তোমার শপথ। আজি হইতেই তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সব সুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

এইখানেই গ্রন্থে প্রতাপ শৈবলিনীর কাহিনী সমাপ্ত করিলেই চমৎকার হইত। কিন্তু বঙ্কিম ভাবিলেন পাপিষ্ঠার যথেষ্টরূপ দণ্ড হয় নাই। আমরা মনে করি—দণ্ডের বাকী কি রহিল? শৈবলিনীর অপরাধ বিশ্লেষণ করিলে ইহার বেশী দণ্ড সুসঙ্গত নয়।

তাহার পর বঙ্কিম যাহা আরম্ভ করিলেন তাহা উপন্যাস নহে, পুরাণ। তাহাকে সতীপুরাণ বা পতিপুরাণ বলা যাইতে পারে। বঙ্কিম বলিতে চাহিয়াছিলেন—প্রণয় বিশেষতঃ বাল্যকৈশোরের প্রণয় অতি দুর্দম, কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না, দারুণ প্রায়শ্চিত্তের পরও শৈবলিনী প্রতাপকে বলিতেছে—"স্বামী যদি আমায় পুনর্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হইবে?...স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি

অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

বঙ্কিম বলিতে চাহিয়াছেন,—চিত্তসংযম পুরুষের পক্ষে যত সহজ, নারীর পক্ষে তত সহজ নয়, নারী পুরুষের চেয়ে সর্বাংশেই দুর্বল। পুরুষের আত্মনিয়োগ করিবার জন্য অনেক ব্রত আছে—নারীর প্রেমই সর্বস্ব। পুরুষের পক্ষে চিত্ত দমনে যে সকল সুযোগ আছে, নারীর সে সকল সুযোগও নাই। সতীমার্গ হইতে বিচ্যুত হইলে, নারীর দুর্গতির অবধি থাকে না—কেবল সংসার, সমাজ, শাস্ত্র শাসন নয়, প্রকৃতিও তাহাকে ক্ষমা করে না। তবু যে নারী সতীমার্গচ্যুত হয়, তাহার কারণ, নারীর প্রণয়াবেগ দুর্দম। অবলা নারী তাহাকে দমন করিতে পারে না। একে নারীর প্রণয়াবেগ পুরুষের চেয়ে প্রবলতর, তাহাতে নারীর দমন করিবার শক্তি ও সুযোগ অল্প। নীতিপথ হইতে বিচ্যুতির দণ্ডও পুরুষের চেয়ে নারীকে অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। শৈবলিনী চরিত্রে বঙ্কিম তাহা দেখাইয়াছেন।

শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি অনুরাগ কেবল রূপানুরাগ নহে—ইহাতে বাল্যসখ্যের একটা স্বাভাবিক অনুরাগ বিজড়িত আছে। পরে গুণানুরাগও ইহাকে প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছিল। শৈবলিনী অমার্জিতবুদ্ধি শিক্ষা-দীক্ষাহীনা, তাহার কাছে শাস্ত্রচর্চায় মগ্ন চন্দ্রশেখরের চেয়ে পৌরুষ ও শৌর্যবীর্যে বলীয়ান ধনে মানে ঋদ্ধ প্রতাপ অধিকতর গুণবান্।

বঙ্কিম ইঙ্গিত করিয়াছেন, যৌবনতৃষ্ণা যদিও না-ও মিটে, তবু নারীর জীবন ব্যর্থ হয় না। গৃহধর্মের মধ্য দিয়া সে নিজের নারীত্বকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। যদি স্বামী উদাসীনও থাকেন কিংবা স্বামী যদি পথভ্রষ্ট হন, যদি অনন্যরক্ত হন, তাহা হইলেও ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করিতে হইবে, কোন ক্রমেই সতীমার্গচ্যুতি সঙ্গত নয়, কেবল পাপ বলিয়া নয়, দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া। অসহায়া দুর্বলা নারীর পক্ষে আপনার কুটীর-কোণটির মূল্য অনেক।

তৎকালীন সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্কিম ইঙ্গিত করিয়াছেন, সুখময় আদর্শ দাম্পত্য-জীবনে নারীর দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ শুচিতার প্রয়োজন। মানসিক শুচিতা না থাকিলেও সমাজসংসারে স্থান হয়। মানসিক অশুচিতা সমাজ শাসনের বহির্ভূত। দৈহিক শুচিতার অভাব হইলে সাংসারিক জীবন যাত্রা কিছুতেই শান্তিতে চলে না। মানসিক অশুচিতার প্রায়শ্চিত্ত চলে; দৈহিক অশুচিতারও প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু হিন্দু সংসারে ফিরাইতে হইলে দৈহিক অশুচিতার প্রায়শ্চিত্তেও কোন ফল নাই।

বঙ্কিম শৈবলিনীর দৈহিক শুচিতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, মানসিক অশুচিতার জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্তের পর শৈবলিনী হিন্দু সংসারে পুনঃপ্রবেশের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। কেবল যৌন শুচিতা নয়, আহারবিহারের শুচিতার মূল্যও এজন্য বঙ্কিম স্বীকার করিয়াছেন, তাহাকে তিনি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

বঙ্কিম আর একটি ইঙ্গিত করিয়াছেন—নারীর প্রণয়াবেগ দুর্দম বটে, সে বাঞ্ছিত জনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু অনুকম্পার দ্বারা এই প্রণয়াবেগকেও বশীভূত করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রতাপের অনুকম্প কঠোর হইতে পারে না, কিন্তু চন্দ্রশেখর যদি প্রেমভরে

শৈবলিনীকে বুকে তুলিয়া লইতেন, তাহার যৌবন-তৃষ্ণার তৃপ্তি সাধন করিতেন, সংসার সুখে ভুলাইয়া রাখিতেন, তাহা হইলে ক্রমে প্রতাপকেও ভুলাইতে পারিতেন।

শৈবলিনীর শুধু ভরা যৌবন ছিল না, রূপও ছিল অতুলনীয়। তাহার গৃহে দর্পণও ছিল, রূপের জন্য মনে দর্পও ছিল। শুধু যৌবন নয়, অমন রূপও ব্যর্থ হইতে চলিল, একথা শৈবলিনী নিশ্চয়ই অনুভব করিত। আবার যখন তাঁহার রূপে শুভ্রকায় সাহেবও ভুলিল, তখন সে আত্মরূপের মর্যাদা আরও বেশী করিয়া বুঝিল। সে তখন রূপের সার্থকতার জন্য যেন দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইল।

বঙ্কিম শৈবলিনীর নাম যেখানেই করিয়াছেন, সেখানেই 'পাপিষ্ঠা' বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন। শৈবলিনীর পতনের জন্য একাই কি সে নিজে দায়ী? চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, তাহার জননীর দারিদ্র্য, তাহার রূপ, সামাজিক সংস্কার ও শাসন, শৈবলিনীর সংসারের নিঃসঙ্গতা ও সন্তানহীনতা, নারীত্বের স্বাভাবিক দুর্বলতা ও মূঢ়তা, এমন কি ফষ্টার—সকলেই অল্পবিস্তর দায়ী। বঙ্কিম বলেন—দায়ী যে-ই হউক, সতীমার্গ-চ্যুতির দণ্ড অনিবার্য, অসহায় দুর্বলা নারীর গৃহসংসার ত্যাগের অধিকার নাই।

বর্তমান যুগের সাহিত্যে এই শ্রেণীর অবলা নারী যে সহানুভূতি পাইয়া থাকে, বঙ্কিমের যুগে সে সহানুভূতি সে পাইত না। বঙ্কিম দেশকালপাত্রের মুখ চাহিয়া সহানুভূতি দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু শৈবলিনীকে অবহেলা করিতেও পারেন নাই। রূপের পূজারী বঙ্কিমের পক্ষে তাহা সম্ভব হইতে পারে না, বঙ্কিম শৈবলিনীকে উপেক্ষা করেন নাই তাহার রূপের জন্য, গুণের জন্য নয়। শৈবলিনীর এমন কোন গুণ ছিল না যে দুই-দুইটা বীরপুরুষ তাহার গুণবন্ধনে বন্দী থাকিতে পারে। এই শৈবলিনীকে বঙ্কিম যত বারই পাপিষ্ঠা বলুন ইহার রূপের মূল্য তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। শৈবলিনীকে তিনি এমনই মহামূল্য করিয়া তুলিয়াছেন, যে তাহার জন্য চন্দ্রশেখর তাহার জীবন-সর্বস্ব পুঁথিগুলি অগ্নিসাৎ করিল—সংসারজীবন ত্যাগ করিল, আবার শৈবলিনীকে লইয়াই পুনর্বার সংসারী হইল। আর বঙ্কিমের আদর্শ পুরুষ—যাহার জন্য অনন্ত স্বর্গ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই ত্যাগী সংযমী প্রতাপ তাহার মহামূল্য জীবন উৎসর্গ করিল—এই রূপসী শৈবলিনীর জন্য।

বঙ্কিমের বহিঃপুরুষ সতী-তপস্যা ও অনুশোচনার জয়গান করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরুষ নারীরূপেরই বিজয়বার্তা শুনাইয়াছে।

প্রতাপ গোড়া হইতেই জানিত শৈবলিনীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না। প্রতাপ চরিত্রে যে দৃঢ়তা পরে দেখা গেল, সে-দৃঢ়তা তাহার যৌবনেও ছিল। জলে ডুবিয়া সকল জ্বালা জুড়াইতে গিয়া অনায়াসে সে ডুবিতে পারিল। কিন্তু প্রতাপ গোড়া হইতে শৈবলিনীর প্রণয়াবেগকে কেন অবরুদ্ধ করে নাই? তাহার উৎসাহ না পাইলে শৈবলিনীর প্রেমাঙ্কুর পুষ্পিত হইয়া উঠিতে পারিত না। মোট কথা প্রতাপ শৈবলিনীকে শৈবলিনীর মতই ভালবাসিয়াছিল। প্রতাপের আত্মসংযম করিবার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম, শৈবলিনীর বিবাহের পর সে আর কোন উৎসাহ দেয় নাই।

প্রতাপ একজন জমিদার হইয়া উঠিয়াছিল। সেকালের প্রথামত প্রতাপ দস্যুতাও করিত। অন্যান্য স্বাধীন জমিদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য বা দুর্দান্ত শত্রুর দমনের জন্যই প্রতাপ দস্যুদের সাহায্য গ্রহণ করিত, অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন করিত না। এমন কি দুর্বল বা পীড়িত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া পরোপকার করিবার জন্যই দস্যুতা করিত। যাহা হউক প্রতাপ শৌর্যে, বীর্যে গরীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল। শৈবলিনীকে সে পায় নাই বলিয়া তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইল মনে করে নাই, তাঁহার পৌরুষকে নানাভাবে সার্থক করিতেছিল। শৈবলিনীর বিবাহ ছাড়া উপায় ছিল না। প্রতাপ অনায়াসে শৈবলিনীর স্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া অবিবাহিত থাকিতে পারিত, কিন্তু তাহা সে করে নাই। 'রূপসী' যে রূপসী ছিল না, এমন কথা কোথাও নাই। প্রতাপ যখন শুনিল—শৈবলিনীকে ফষ্টার সাহেব ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তখন তাহার উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিল। প্রতাপের যাহা কিছু ঐশ্বর্য তাহা চন্দ্রশেখরের প্রসাদে। এই চন্দ্রশেখরের পত্নীকে ফিরিঙ্গিরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, প্রতাপের মত বীর দস্যুদলপতি ভূস্বামীর এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। শৈবলিনীর প্রতি ভালোবাসাই কেবল তাহাকে উত্তেজিত করে নাই।

উদ্ধার পাইয়া শৈবলিনী প্রতাপকে জানাইল, সে প্রতাপের জন্যই ফষ্টারের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হইয়াছে। "তাহার (প্রতাপের) দোষেই তাহার এই দুর্দশা।" প্রতাপ উত্তর করিল—"আমার দোষ ঈশ্বর জানেন. আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের প্রবৃত্তির দোষ, তুমি পাপিষ্ঠা।" শৈবলিনী নিতান্ত মিথ্যা দোষারোপ করে নাই। প্রতাপ শৈবলিনীর চেয়ে আট বৎসরের বড। সে তাহার হৃদয়ে কেন প্রণয়াগ্নি উদ্দীপ্ত করিল?

যাহা হউক এই ভাবে প্রতাপ শৈবলিনীর প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিল। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি-ভগিনী, স্ত্রী রূপসীর আত্মীয়া। যে চন্দ্রশেখর একদিন তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, যে চন্দ্রশেখরের অনুগ্রহে তাহার সমস্ত ধনদৌলত, শৈবলিনী তাহার পত্নী। শৈবলিনী প্রতাপের গুরুস্থানীয় দেবতুল্য স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ফিরিঙ্গির দ্বারা অপহৃতা হইয়া তাহার সঙ্গে বসবাস করিয়াছে, সেই শৈবলিনীর প্রণয়নিবেদন শৌর্যে বীর্যে পদগৌরবে গরীয়ান্ কৃতদার প্রতাপ যে প্রত্যাখ্যান করিবে, ইহাতে বিচিত্র কি?

বঙ্কিম প্রতাপকে চিত্তসংযমী বীরপুরুষের আদর্শ করিয়া অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত ঠিক ততটা পারিয়া উঠেন নাই। তাহা তিনি নিজেই অনুভব করিয়াছিলেন। তারপর শৈবলিনী গেল বন্দী প্রতাপকে উদ্ধার করিতে। সে নিজের বুদ্ধিবলে প্রতাপকে উদ্ধার করিল। যে-কঠোরতার সহিত প্রতাপ শৈবলিনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, সে-কঠোরতা এখন তাহার থাকিল না। স্বতই শৈবলিনীর প্রতি তাহার আচরণ কোমল হইয়া আসিল। তারপর অগাধ জলে সন্তরণের দৃশ্য। বঙ্কিম দুইজনকে

এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিলেন যখন কোন বাধাবন্ধন টিকিবার কথা নয়। প্রতাপের সংযম গভীর জলে গলিয়া যাইবার কথা। প্রতাপের চিত্ত গলিল, কিন্তু সংযম গলিল না। প্রতাপ শৈবলিনীকে দিয়া শপথ করাইয়া লইল। এই খানেই গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারিত। বঙ্কিম ইহাতেও যথেষ্ট মনে করেন নাই। শিল্পী বঙ্কিমের কাজ এইখানেই শেষ। তারপর ঋষি বঙ্কিমের কাজ বাকি ছিল, আদর্শ সৃষ্টি এখনো হয় নাই। আবার আমরা প্রতাপের সাক্ষাৎ পাইতেছি। মৃত্যুশয্যায় প্রতাপ বলিল—"শৈবলিনী বলিয়াছিল এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই, যাহারা আমার পরম প্রীতিপাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদের সুখের কণ্টক স্বরূপ এজীবন আমার রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদের নিষেধ সত্বেও এ সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে শৈবলিনীর চিত্ত কখনও না কখনও বিচলিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমি চলিলাম।"

এই তো গেল শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের মঙ্গলের দিকের কথা। প্রতাপ কি শৈবলিনীর চিন্তা ভুলিয়াছিলেন? বঙ্কিম দেখাইয়াছেন প্রতাপ একদিনের জন্যও শৈবলিনীকে ভুলেন নাই, কেবল কঠোর আত্মসংযমের দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মৃত্যুকালে প্রতাপ বলিল—"শিরে শিরে শোণিতে শোণিতে অস্থিতে অস্থিতে আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিতেছে। ···· এজন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম।"

এইভাবে প্রতাপের জীবনাবসান করাইয়াও বঙ্কিমের আদর্শ সৃষ্টির তৃষ্ণা উপশম হয় নাই, পাছে পাঠক আদর্শের প্রকৃত মর্যাদা না বুঝে সেজন্য স্বামীজির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারি, যদি চিত্ত সংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন, যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"

বঙ্কিম নিজেও নিজ সৃষ্ট আদর্শের জয়গান করিয়া বলিয়াছেন—"তবে যাও প্রতাপ অনন্তধামে যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, পুণ্য অনন্ত, সেইখানে যাও। ········" ইত্যাদি।

এই গ্রন্থে মীরকাসেমের চরিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে রাজ্যনাশ, এমন কি প্রাণনাশের আশঙ্কা, তবু তিনি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার প্রাণাধিকা বেগম তাঁহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া সন্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছে, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাই তাঁহার চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা বলেন, রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য

করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীরজাফরও নহি।"

মীরকাসেম দলনীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন তবে তাঁহার সম্বন্ধে নওয়াজ্জা তাঁহার হঠকারিতা সন্দেহ নাই। কিন্তু তকি খাঁ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, তাঁহাকে তিনি অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। নানা কারণে তাঁহার মনঃস্থির তা ছিল না।

একনিষ্ঠ স্বামিভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ পতিব্রতা দলনীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শৈবলিনীর পাশাপাশি দলনীর চিত্রাঙ্কনের একটি তাৎপর্যও আছে। দলনী নবাবের বহু দাসীর মধ্যে একটি দাসী। স্বামীর অনন্যনিষ্ঠ প্রেম লাভ না করিয়াও দলনী ক্ষুব্ধ নয়। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে স্বামীর অমঙ্গল হইবে, এই আশঙ্কাতেই স্বামীর নিকট ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির অনুরোধ করিয়াছিল। স্বামীর মঙ্গলের জন্য সে রাত্রিকালে ভ্রাতা গুরগণের সঙ্গে দেখা করিল। ভ্রাতার মুখে স্বামীর অমঙ্গলের চক্রান্তের কথা শুনিয়া সে তাহার সহিত সম্বন্ধ ছেদ করিল। 'গুরজাহানীর' প্রস্তাব তাহার ভাল লাগিল না। তেজস্বিনী দলনী গুরগণকে তীব্রভাষায় গালি দিয়া চলিয়া আসিল। কিন্তু দলনীর বুদ্ধি প্রখর ছিল না। গুরগণ যে তাহার সর্বনাশ করিতে পারে তাহা সে ভাবেও নাই। তাহার পর দলনীর অসামান্য সতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তকি খাঁর প্রস্তাবে, বঙ্গেশ্বরীর মহিমা তখন তাহার ক্ষুদ্রদেহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তকি খাঁ নবাবের দণ্ডের পরওয়ানা দেখাইয়া বলিল—"নবাবের আদেশ—তোমাকে বিষপানে মরিতে হইবে কিন্তু আমি তোমাকে বাঁচাইতে পারি।" তেজস্বিনী দলনী স্বামীর প্রেম হারাইয়া বাঁচিতে চাহিল না। নিজে বিষ আনাইয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল। দলনী চরিত্র অস্বাভাবিক না হইয়াও আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। এই চরিত্রের আবেষ্টনীটি অতি বিচিত্র, চরিত্র সৃষ্টির জন্য যতটা না হউক, এই চরিত্রের সংস্থিতি, পরিবেষ্টনী ও সমস্যা সৃষ্টিতে বঙ্কিমের যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া যে বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া দলনীর জীবনটাকে অবসান পর্যন্ত লইয়া আনা হইয়াছে, তাহা এ দেশের উপন্যাসসাহিত্যের একটা অপূর্ব সৃষ্টি। কোনদিন রুচি রীতি বা আদর্শের পরিবর্তনে ইহার চমৎকারিতা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বঙ্কিম সে যুগের ইংরেজ চরিত্রের একটা আভাস দিয়াছেন,—

"এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাংলায় বাস করিতেন তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্যে অক্ষম ছিলেন—লোভ-সংযমে অক্ষম ও পরাভবস্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনও স্বীকার করিতেন না যে একার্য করিতে পারিলাম না, নিরস্ত হওয়াই ভালো। তাঁহারা আদৌ স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্যে অধর্ম আছে, অতএব অকর্তব্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম বৃটেনীয় রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় কখনও দেখা যায় নাই।"

তখনকার ইংরেজদের অনেকে এদেশের রমণীদের বশীভূত করিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রবাসের সংসার পাতিতেন, ফষ্টার শৈবলিনীকে লইয়া সেইরূপ একটা অস্থায়ী সংসার পাতিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিম ইংরেজের পরাক্রম, সাহস, তেজস্বিতা ও পরাভব সহনে অস্বীকারের

কথা এই গ্রন্থে বহুবার বলিয়াছেন। ফষ্টার বলিতেছে—"ইংরেজ হইয়া যে দেশী শত্রুকে ভয় করিবে, তাহার মৃত্যু ভালো।"

জনসন বলিলেন—"ভারতবর্ষের কপাট ইংরেজী লাথিতে টিকিবে না। কপাট ভাঙ্গিয়া গেল। এই রূপে বৃটীশ পদাঘাতে সমগ্র ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক।"

নবাব হাসিয়া বলিলেন—"তুমি বালিকা। ইংরেজ কি তাহা জান না।"

অমিয়ট বলিলেন—"যেদিন একজন ইংরাজ দেশী লোকের ভয়ে পলাইবে, সেদিন ভারতবর্ষে ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে।"

একজন মুসলমান অমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল—"কেন মরিবেন, আমাদিগের সঙ্গে আসুন।" অমিয়ট বলিলেন—"মরিব, আমরা আজ এখানে মরিলে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমানের রাজ্য ধ্বংস পাইবে। আমাদের রক্তে তৃতীয় জর্জের রাজ-পতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।"

বঙ্কিম দেখাইয়াছেন—তিনজন ইংরেজ বহু মুসলমান সৈনিকের সঙ্গে যুঝিয়া বহু সৈন্য মারিয়া প্রাণ দিল, তবু আত্মসমর্পণ করিল না।

পাশাপাশি দেশীয় লোকদের চরিত্রও ইহাতে ফুটিয়াছে। বঙ্কিম বলিয়াছেন—অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে ধনলোভে ইংরেজ ভজিয়াছে, একমাত্র এই ভরসাতেই ফষ্টার শৈবলিনীকে বশীভূত করিতে চাহিয়াছিল। ফষ্টার যে সকল লোকজন লইয়া চন্দ্রশেখরের গৃহ হইতে শৈবলিনীকে ধরিয়া লইয়া গেল, তাহারা সকলেই বাঙ্গালী। যাহারা সঙ্গে প্রহরী হইয়া গেল তাহারাও বাঙ্গালী। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে সাহেবকে চড়াও হইতে দেখিয়া প্রতিবাসী বাঙ্গালীরা সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বঙ্কিম বাঙ্গালী জাতির এই ভীরুতা ও হীনতার কথা বলিতে লজ্জাই পাইয়াছেন। তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি তাই অবমানিত হইয়া থাকিতে চায় নাই, প্রতাপের শৌর্য ও সাহসের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে।

দেশের স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছে। রাজা মুসলমান, দেশ তো হিন্দুর, হিন্দুরা একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকিবে বঙ্কিম ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই, তাই প্রতাপের অধীনে একদল হিন্দুসৈন্য পাঠাইয়াছেন ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে। ইহাতে তাহার দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের আখ্যানবস্তু সম্পূর্ণ স্বভাবগত পথে অগ্রসর হয় নাই। কোনটি স্বভাবানুগ কোনটি নয়, ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ হয়, কাজেই জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। নিম্নের বিষয়গুলি লইয়া মতভেদ হয়। প্রশ্ন উঠে—

(১) আট বৎসরের বালিকার সহিত যোল বৎসরের বালকের কোন প্রণয় সম্পর্ক কি হইতে পারে? (২) ১৪।১৫ বৎসরের কিশোরী ও ২২।২৩ বৎসরের যুবক একসঙ্গে জলে সাঁতার দিত ইহা স্বাভাবিক কিনা? (৩) প্রতাপের মরিবার জন্য জলে ডুবা কি স্বাভাবিক? (৪) যে সাহেব দেখিলে পুরুষেরাও ঘরে খিল দিত, তাহার সহিত ভাব করিয়া পল্লীর অশিক্ষিতা বধূর পলায়ন সম্ভব কিনা? (৫) কুলবধূ সুন্দরীর পক্ষে নাপিতানী

সাজিয়া শৈবলিনীর উদ্ধারসাধনের চেষ্টা ও সাহস স্বাভাবিক কিনা? (৬) নবাবের বেগমের পক্ষে রাত্রে পদব্রজে দুর্গের বাহির হওয়া স্বভাবসঙ্গত কিনা? (৭) প্রতাপ ও রামচরণ এই দুইজন মাত্র সাহেবের নৌকা হইতে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিল, ইহা কিরূপে সম্ভব? (৮) শৈবলিনী যেভাবে নবাব দরবারে নৌকা ও অস্ত্রশস্ত্র চাহিয়া প্রতাপকে উদ্ধার করিল, তাহাই বা কি? (৯) অগাধ জলে নায়ক নায়িকার সাঁতার একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি? (১০) শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত উপন্যাসের অঙ্গ হইতে পারে কিনা? (১১) প্রতাপের প্রাণবিসর্জনই কি স্বাভাবিক? (১২) মৃত্যুশয্যায় প্রতাপের নাটকীয় বক্তৃতার দ্বারা উপন্যাসের উপসংহার সঙ্গত হইয়াছে কিনা?

মতভেদ হইলেও, ইহাদের অনেকগুলিই যে অস্বাভাবিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ আইডিয়ালিষ্টিক রোমান্স-এ এইরূপ কাঁটায় কাঁটায় স্বভাবসঙ্গতি সন্ধান করিতে নাই। মনে রাখিতে হইবে চন্দ্রশেখর রোমান্স, নভেল নয়।

এই গ্রন্থে বহুস্থলে অন্যান্য রোমান্স গ্রন্থের মত মুক্তকণ্ঠে নারীরূপের বিজয় গান করা হইয়াছে। "বালকমাত্রেই কোন না কোন সময়ে অনুভব করিয়াছে—এ বালিকাটির মুখমণ্ডল অতি মধুর। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া লইয়াছে, তাহার পরে পথের ধারে অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার দেখিয়াছে।"

"শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল।" "নির্দোষ গঠন, ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গ রাশি তুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার দুলিল—স্বর্ণরচিত সুগন্ধ বিকীর্ণকারী উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল—তাহার অঙ্গসঞ্চালনমাত্র গৃহ মধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল।"

"যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না। আমরা জল নই। যিনি কখনও রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসী তাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার শিঞ্জিতের তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরি গ্রথিত জলজ পুষ্পের মালা দোলাইয়া সেই তালে তালে নাচে। সন্তরণ-কুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিয়া, জলতরঙ্গ তুলিয়া তালে তালে নাচে।"

"কেবল বক্ষ পর্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্র বসনে কবরীসমেত মস্তকের অর্ধভাগমাত্র আবৃত করিয়া প্রফুল্ল রাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘ মধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল।"

'চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুখণ্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রূযুগল সমগামিনী রেখা দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে, যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, সুকুমাররসপূর্ণ তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন করিয়া মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে।"

"কখন কখন ঢেউগুলা স্পর্ধা করিয়া সুন্দরীদের কাঁধে চড়িয়া বসিতেছে; আর যিনি

তীরে উঠিয়াছেন, তাঁহার চরণোপান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—মাথা কুটিতেছে—বুঝি বলিতেছে—'দেহিপদপল্লবমুদারম্' নিতান্ত পক্ষে পায়ের একটু অলক্তরাগ ধুইয়া লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে।"

"প্রতাপ প্রদীপালোকে দেখিলেন যে শ্বেতশয্যার উপর কে নির্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেতবারি বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত-পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে।"

"শৈবলিনী বুঝিল যে তাহার সুন্দর মুখখানিতে অনেক উপকার হইয়াছে। নবাব তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া তাহার সকল কথা বিশ্বাস করিতেছেন।"

"খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে বাবুর্চিখানায় লইয়া গেল, হৃষ্টচিত্তে কেননা শৈবলিনী পরম সুন্দরী।"

"সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, বিশেষতঃ যদি অধিকারী যুবতী স্ত্রী হয় তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র।"

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কাহিনীটি যেন জলের উপর ভাসিতেছে। এই পুস্তকের আবেষ্টনীটি জলময়ী। জলধারার ও জলকল্লোলের যতপ্রকার রূপবৈচিত্র্য সম্ভব, বঙ্কিম এই পুস্তকে কোনটি বাদ দেন নাই। চঞ্চল জলতাবল্যের মধ্যে যে অপূর্ব লীলা আছে তাহা বঙ্কিম কবির চোখে দেখিয়া এই গ্রন্থে ফুটাইয়াছেন।

বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসে স্বপ্নের অবতারণা আছে। ইহাতেও আছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের স্বপ্নটি একটি রূপক মাত্র, ইহা আলঙ্কারিকতার নিদর্শন। চতুর্থ খণ্ডের স্বপ্ন-মানসিক প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ, নরকভয় ইত্যাদির প্রকারান্তরে অভিব্যক্তি।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে লক্ষ্য করিবার বস্তু—বঙ্কিম প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে, চিত্র হইতে চিত্রান্তরে কিরূপ কলাকুশলতার সহিত প্রয়াণ করিয়াছেন। এই পুস্তকে দুইটি কাহিনীকে অনুস্যূত করিতে হইয়াছে, যদিও তাহা বহিরঙ্গের। ঘটনার অনুসীবনের কৃতিত্ব লক্ষ্য করিতে হইবে। অনুস্যূতির কৌশলে কেবল দুইটি কাহিনী একটি অখণ্ড কাহিনীতে পরিণত হয় নাই, ইতিহাসের সহিত কল্পনারও অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটিয়াছে।

এই উপন্যাসখানি উদ্দেশ্যমূলক কিনা? আমাদের মনে হয়, শৈবলিনীর শপথের পর যদি প্রতাপ শৈবলিনীর প্রসঙ্গ শেষ হইত, তাহা হইলে ইহা উদ্দেশ্যমূলক হইত না। দলনী-প্রসঙ্গ আদৌ উদ্দেশ্যমূলক নহে, উহা অবিমিশ্র আর্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর হইতেই হিল্লোলিত গদ্য ভাষাভঙ্গীর অনুসরণ করেন। বঙ্কিমের গদ্য ভাষা এইখানে কবিতার মতোই তরঙ্গায়িত ও মধুরায়িত হইয়াছে। এই গ্রন্থেই নানা-ভঙ্গির বাক্য রচনার প্রবর্তনের সূত্রপাত দেখা যায়। এইগুলির কোনটি ক্রিয়াভূয়িষ্ঠ, কোনটি বিশেষণভূয়িষ্ঠ, কোনটিতে উপমার বাহুল্য, কোনটি একাবলী অলঙ্কারের অনুরূপ, কোনটিতে প্রশ্নাত্মক বাক্যের আতিশয্য। কোনটিতে ঐশ্বর্য, কোনটিতে মাধুর্য, কোনটিতে চাতুর্য। অজ্ঞাতসারে, অনায়াসে স্বচ্ছন্দে এই সকল ভঙ্গীগুলি বঙ্গ সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে।

"মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। ভীরু কবির কবিতাকুসুমের ন্যায়, মুখ যেন ফেটে ফোটে, তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠগত প্রণয় সম্বোধনের ন্যায়ে, মুখ ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।"

"যিনি কখনও রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসী তাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার-শিঞ্জিতের তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরি গ্রথিত জলজপুষ্পের মালা দুলাইয়া সেই তালে তালে নাচে, সন্তরণকুতুহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমীটীকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে, উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে।"

"যাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল যে, শৈবলিনী আবার আসিবে। তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বসিল। বসিয়া বসিয়া নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল। ঢুলিয়া ঢুলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল, শৈবলিনী আসিল না।"

"হায় ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পুড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না।"

"আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন?"

"সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশি তুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎ তুল্য, দুর্বৎসরে দুর্গোৎসব তুল্য, আমার সুখস্বপ্ন তুল্য, কেন দেখিলাম কেন মজিলাম, কেন মরিলাম কেন বুঝিলাম না?"

"সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে?"

"মনুষ্যের ইন্দ্রিয় পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে?"

"যখন নৈশ নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে, যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবরলোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন স্বচ্ছনীল সরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি বালসূর্য্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে বিভিন্ন হইয়া থাকে, নীলজলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালার উপরে দীর্ঘরশ্মি সকল নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কলকণ্ঠ বাজাইয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।"

"ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারি। যদি চিত্ত সংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী।"

কমলাকান্তের দপ্তর

সকল বড় সাহিত্যিকেরই মনের শিল্পশালায় এমন কতকগুলি উপাদান জমিয়া উঠে যে গুলিকে কোন সম্পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির মধ্যে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না। সাহিত্যস্রষ্টা শেষ জীবনে সেগুলিকে একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন না, তাহাদের প্রতি তাঁহার মমতা অল্প নয়। বিশেষতঃ বহুদিন হইতে তাঁহার মন সেগুলির সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে।—তাহারও একটা আকর্ষণ আছে। সেগুলি লইয়াও সাহিত্যিকরা শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া যান। সৃষ্টির প্রয়োজনে সে সৃষ্টি নয়, উপাদানের প্রয়োজনেই সে সৃষ্টি। কাজেই সে সৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না-ও হইতে পারে। কল্পনা তাহাকে একটা অখণ্ড ভাবে রূপ দিতে পারে না বলিয়া সে সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা ও সুসঙ্গতি না-ও থাকিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র দুই জনেই যাহা করিয়াছেন, বঙ্কিমও তাহাই করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের এই সৃষ্টিই কমলাকান্তের দপ্তর। তাঁহার এই সৃষ্টিও উপেক্ষণীয় নয়।

যে সকল ভাবচিন্তাগুলিকে যুক্তিমূলক পরম্পর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়—সেগুলি লইয়া হয় প্রবন্ধ। বঙ্কিম সেই শ্রেণীর ভাবচিন্তাগুলি লইয়া বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। যেগুলি যুক্তির বল্গা মানে না—অনেকটা রুচিপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে—অকস্মাৎ যে সকল ভাবোচ্ছ্বাস মনে উদিত হইয়া স্মৃতি রাখিয়া বিলীয়মান হয়—যে অনুভূতি অনেকটা faith বা Intuition হইতে প্রাপ্ত— সে সমস্ত লইয়া প্রবন্ধও চলে না। সেগুলির জন্য পৃথক একটা রচনাভঙ্গীর যে প্রয়োজন, বঙ্কিম তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি কমলাকান্ত সাজিয়া দপ্তর লিখিয়াছেন।

ন্যাকামি, কপটতা, অসংযত আতিশয্য ও মূঢ়তায় ভরা মানবজগতের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান লইয়া বঙ্কিম প্রবন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যুক্তির চেয়ে ব্যঙ্গের ধার বেশী। এই ব্যঙ্গবর্ষণের জন্য তাঁহাকে তদুপযোগী ভঙ্গীর অনুসরণ করিতে হইয়াছে। কমলাকান্তের দপ্তরের প্রধান উপজীব্য এই ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ। অবশ্য সেই সঙ্গে কবি বঙ্কিমের হৃদয়োচ্ছ্বাসেরও বাহন হইয়াছে এই দপ্তর।

কমলাকান্ত সাজিবার প্রয়োজন ছিল আরো অন্য কারণে। বঙ্কিম যে সমাজসংসারের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যেই যে ব্যক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সে তাহারই অঙ্গীভূত। সেই সমাজ সংসারের সুখ দুঃখ ধারণাসংস্কারের দ্বারা তাহার চিত্ত অভিরঞ্জিত। তাহার দ্বারা এইরূপ সমালোচনা স্বাভাবিক নয়। সে অধিকারীও নয়। সেই অধিকার অধিগত করিবার জন্য তিনি নিজেকে তাহার বাহিরে দাঁড় করাইয়াছেন একজন নিরপেক্ষ অনাসক্ত দ্রষ্টার রূপে। নিজের সংস্কারমুক্ত মানসিক অবস্থাকে অহিফেনের আবেশ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। বঙ্কিম এই pose লইতে গিয়া কমলাকান্ত চরিত্রটিকে একটি অপূর্ব সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। এরূপ চরিত্র তাঁহার কোন উপন্যাসে স্থান পায় নাই।

শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের অনেকাংশ লইয়া শ্রীকান্ত-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন—শ্রীকান্ত নিজের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া হ্রস্ব পরিধির ভুবনকে যেরূপে দেখিয়াছেন বিশেষ কোন মন্তব্য না করিয়া সেইরূপেই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমও নিজের চরিত্রের, অভিজ্ঞতার ও অনুভূতির বহু অংশ গ্রহণ করিয়া কমলাকান্ত চরিত্রটির সৃষ্টি করিয়াছেন। তফাৎ এই শ্রীকান্ত প্রধানতঃ কবি, আর কমলাকান্ত প্রধানতঃ সমালোচক।

প্রধানতঃ সমালোচক হইলেও কমলাকান্ত কবিও বটেন। দুইএকটি নিবন্ধ গদ্যে রচিত হইলেও কবিতা—গীতিকবিতা। কোন নিবন্ধের মাঝে মাঝে এবং কোন কোন নিবন্ধের উপসংহারভাগেও কবিত্বেরই উচ্ছ্বাস। রচনাগুলির মধ্যে তিন প্রকারের পরম্পরাই (Sequence) দেখা যায়—আমার দুর্গোৎসব, কে গায় ওই. ইত্যাদি নিবন্ধের পরম্পরা আবেগাত্মক (Emotional)। 'একটি গীত' নিবন্ধে কমলাকান্ত ব্যাখ্যাতা সাজিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার পরম্পরা ঠিক ব্যাখ্যার নয়, ইহার পরম্পরাও আবেগাত্মক। স্ত্রীলোকের রূপ, চন্দ্রালোকে ইত্যাদি রচনার পরম্পরা যুক্তিমূলক (Logical). বড়বাজার, ঢেঁকি ইত্যাদি নিবন্ধের পরম্পরা আলঙ্কারিক (Rhetorical)। রূপকমালার ক্রম অনুসারে এইগুলি রচিত হইয়াছে।

পুরা পেসিমিষ্ট বা পুরা অপ্‌টিমিষ্ট লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়, সাধারণ লোক কখনও পেসিমিষ্ট্‌ কখনও অপ্‌টিমিষ্ট। কমলাকান্তও তাহাই। কমলাকান্ত জগতের হালচাল দেখিয়া স্বদেশের হীনতা ও দুর্দশা উপলব্ধি করিয়া ও নিজের জীবনের লক্ষ্যহীনতা ও অসহায়তা স্মরণ করিয়া, বিশেষতঃ বার্দ্ধক্যের প্রভাব দেহে মনে অনুভব করিয়া পেসিমিষ্ট। [illegible] জগৎ ও জীবনী সম্বন্ধে তিনি আশা-ত্যাগও করেন নাই—তাঁহার ধারণা, মানবপ্রেম, ভগবৎপ্রীতি, দেশপ্রীতি, বিশ্বমৈত্রী এখনো মানবজগৎকে বাঁচাইতে পারে। [illegible], কমলাকান্তকে সিনিক (Cynic) বলা চলে।

কমলাকান্ত আফিমখোর নির্বোধ ব্যক্তি সাজিয়া থাকিলেও, বিদ্বান ও পণ্ডিত। [illegible] মনে হইতে পারে বিদ্যা ও বুদ্ধির অহঙ্কারে তিনি সমস্ত মানবজগৎকে কৃপার চোখে দেখেন এবং দাম্ভিক বলিয়া তিনি এ সংসারে একা, সমাজের মানুষ বা সংসারী হইতে পারেন নাই। দাম্ভিক লোকেরা বিশ্বকে কৃপার চোখে দেখে বটে, কিন্তু নিজেকে খুব বড় মনে করে। কমলাকান্ত সকলকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন বটে, কিন্তু নিজেকে অবজ্ঞা করেন ঢের বেশি—নিজেকে তিনি ভাবেন অধমাধম।

কমলাকান্ত কর্ম্মভীরু। বঙ্কিম কমলাকান্তকে নিষ্ক্রিয় ভাববিলাসী রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। যে কর্ম্মী, তাহার বিশ্বকে দেখিবার অবসর কই? যাহাকে দর্শকরূপেই চিত্রিত করা হইয়াছে—তাহাকে কর্ম্মী করিলে চলে না। কমলাকান্ত কর্ম্মী নয়, তবে কেবল দ্রষ্টাও নয়, সে স্রষ্টা। দপ্তর রচনাই তাহার সৃষ্টি।

কমলাকান্ত কূটস্থ চরিত্র। তিনি জনতার ঊর্দ্ধে অবস্থিত উচ্চ শৈলকূটে বসিয়া অহিফেনের প্রসাদে দিব্য দৃষ্টিলাভ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন—মানব

জগতের অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি প্রবেশ করিতেছে। সর্বপ্রকারের কপটতা, অসামঞ্জস্য, মোহমূঢ়তা ও ভুলভ্রান্তির মিছিল দেখিয়া তিনি যেন আমোদ উপভোগ করিতেছেন।

বঙ্কিমকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বলা হয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম বা প্রবন্ধকার বঙ্কিম তাঁহার শিষ্য নহেন, কমলাকান্ত বঙ্কিমই তাঁহার আসল শিষ্য।

ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিম যাহা বলিয়াছেন—কমলাকান্ত সম্বন্ধে অনেকটা তাহাই বলিতে পারা যায়। "ঈশ্বরগুপ্ত বলিবেন—তোমাদের এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথা কোটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠহাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি—ইত্যাদি।"

এই রঙ্গ দেখিবার মনোবৃত্তি কমলাকান্ত ঈশ্বর গুপ্তের কাছে পাইয়াছেন।

কমলাকান্ত প্রেমিক। সাধারণ লোকে যাহাকে প্রেমিক বলে, কমলাকান্ত তাহা ছিলেন না। গুপ্ত কবির মত নারীরূপ তাঁহার কাছেও মেকি ও ঝুটা বস্তু। নারীরূপ লইয়া রঙ্গ করা চলে, মজিয়া পরমার্থ হারানো চলে না। কমলাকান্ত যদি নারীসঙ্গের ভিখারী বা নারীসঙ্গের শিকারী হইতেন তাহা হইলে প্রসন্ন গোয়ালিনীকে লইয়া এত রঙ্গরসিকতা করিতে পারিতেন না।—তাহার সঙ্গে কাব্যরসের পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র গব্যরসের সম্পর্ক হইতনা। কমলাকান্ত বিশ্বপ্রেমিক। তাহার অন্তরে গভীর প্রেমের উৎস। এই উৎসের প্রেমধারা আপনার পুত্রকলত্র আত্মীয় স্বজনকে না পাইয়া বিশ্বমানবের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। তিনি জানিতেন—মানবপ্রেমেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা।

কমলাকান্ত আসল সন্ন্যাসী—এসংসারে তাঁহার কোন বন্ধন নাই। তিনি পাঁকের মধ্যে পাঁকাল মাছের মত নির্লিপ্ত,—জনারণ্যে থাকিয়াও বনারণ্যেই বাস করিতেন। কমলাকান্ত দিব্যদৃষ্টিমান্ জীবন্মুক্ত পুরুষ। প্রসন্ন যেন সুজাতার মতই তাঁহার চরণে গব্যার্ঘ্য নিবেদন করে। কমলাকান্ত দিব্য জ্ঞানলাভ করিয়াছেন চারিদিকে অজ্ঞান ও অবিদ্যার লীলা ও তাহার পরিণতি দেখিয়া। অবিদ্যাকে চিনিয়া অজ্ঞানকে আবিষ্কার করিয়া বিপ্রতীপ পথে তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কমলাকান্ত সংসারী হ'ন নাই, কাজেই ঠেকিয়া ও ঠকিয়া জ্ঞান লাভ করেন নাই। তিনি নির্লিপ্ত রহিয়া দেখিয়াই দেখিয়াই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। কমলাকান্ত বৈদান্তিক—'তাঁহার কাছে মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।' কমলাকান্তের বৈদান্তিকতা শুষ্কনীরস জ্ঞানবিলাস মাত্র নয়, ইহা সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেমে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কমলাকান্ত দেখিয়া দেখিয়া বিপ্রতীপ পথে নেতিনেতি পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ জ্ঞান লাভের আগেও সংস্কারমুক্ত মন চাই, সত্যদৃষ্টি চাই। এই সংস্কারমুক্তি ও সত্যদৃষ্টি লাভ আবার বিনা সাধনায় হয় না। কমলাকান্তের নিশ্চয়ই সাধনা ছিল, সে সাধনার কথা বঙ্কিম বলেন নাই, ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। লোকে সাধনার পথে

যে সত্যের সন্ধান পায়, যুক্তিমার্গে যে সত্যের অস্তিত্ব অনুভব করে—কমলাকান্ত তাহা যেন ইনটুইশনের দ্বারা লাভ করিয়াছেন। এ জগৎ যে মায়ার খেলা তাহা জানিতেন বলিয়াই তিনি সংসারী হ'ন নাই,—তিনি জানিতেন 'মনুষ্যসকল ফলবিশেষ, মায়াবৃন্তে সংসারবৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে।' অহিফেনসেবাকেই বঙ্কিম ইনটুইশনের সিম্বল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। যে অহিফেন লোকের চক্ষু মুদিত করে—সেই অহিফেন তাঁহার চর্ম্মচক্ষু মুদিত করিয়া দিব্যচক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। সত্যদ্রষ্টা কমলাকান্ত দেখিতেছেন—মানুষে মানুষে যে-ভেদ তাহা সম্পূর্ণ কৃত্রিম, তাহা ঈশ্বরবিহিত নয়, প্রবল দুর্ব্বলকে পেষণ করিতেছে—বঞ্চিত করিতেছে, দুর্বল তাহার নিজের অবশ্য প্রাপ্যটুকুর অধিকার চাহিলেই হয় অপরাধী—অধিকার করিতে গেলেই হয় লাঞ্ছিত। তিনি দেখিতেছেন,—বাহ্য সম্পদের মায়ামরীচিকার পিছে ছুটিয়া মানুষ অশেষ দুঃখ পাইতেছে। মানুষ কিসে প্রকৃত সুখ তাহা জানে না। কাঞ্চন ফেলিয়া সে কাচখণ্ড আহরণ করিতেছে। মানুষ যাহাকে খুব বড় কাজ মনে করে তাহা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধ শিশুদের খেলামাত্র।

তিনি দেখিয়াছেন—মানুষের স্নেহ, প্রেম, করুণা, জনহিত সাধন, যশমান, শাসনপালন-বিচার, রাজাপ্রজা-সম্পর্ক, গুরুশিষ্য সম্পর্ক, দেবারাধনা, তথাকথিত সারস্বত সাধনা—সমস্তর মধ্যে রহিয়াছে একটা বিনিময়ের, একটা বার্টার ও একস্চেঞ্জের শর্ত্ত, সবই স্বার্থের খেলা, কোথাও নিষ্কামতা নাই, কোথাও অকৈতব নাই। জগতের খুব বড় বড় অবদান, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শৌর্য্য, প্রেমিকতা, তথাকথিত মনুষ্যত্ব, এমনকি মহাপুরুষত্বকেও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে অন্তরে বিশেষ কিছু সার নাই। কেবল ঢক্কাবাদনের দ্বারা শুধু লেখনীকৌশলের দ্বারা শূন্যগর্ভতাকে ফাঁপাইয়া-ফুলাইয়া বড় করা হইয়াছে। মানুষ বহুদিন হইতে অবিরত জয়ধ্বনি তুলিয়া তথাকথিত প্রেম, শৌর্য্য, দেশভক্তি, সাধুত্বকে অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

কমলাকান্ত বুঝিতে পারিয়াছেন,—মানুষের মায়ামুগ্ধতা যেমন মূঢ়তা—তাঁহার নিজের অর্বল্কিত স্বাধীনতাও তেমনি মূঢ়তা; ভোগের মধ্যে মজ্জমানতাও যেমন ভ্রান্তি, বিশ্বের সর্ববিধ উপভোগ্য হইতে আপনাকে বঞ্চিত করাও তেমনি ভ্রান্তি। দুইএর সামঞ্জস্যেই মনুষ্যত্ব। কমলাকান্ত জীবনের অপরাহ্ণে উপনীত, আর তাঁহার ফিরিয়া নূতন করিয়া জীবনগঠনের উপায় নাই। কিন্তু অন্যে যেন ভুল না করে, সময় থাকিতে যেন সাবধান হয়। ইহাই কমলাকান্তের দপ্তরের উপদেশ। কমলাকান্তের জীবন ব্যর্থ হইয়াছে কিন্তু এ শিক্ষা যদি অন্যে লয় তাহা হইলেও তিনি জীবনকে সার্থক মনে করিবেন।

কমলাকান্ত নিষ্কর্ম্মা, ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণই তাঁহার পেশা! এই অনিত্য দেহ ধারণের জন্য উদরান্ন অর্জ্জনের প্রয়োজন আছে তাহা তিনি মনে করেন না। অনিত্য বস্তুর রক্ষার জন্য ভিক্ষা পাইয়াও তিনি কৃতজ্ঞ নহেন, ভিক্ষান্ন গ্রহণেও তাঁহার লজ্জা নাই।

বঙ্কিম তাঁহাকে শুধু দেখিয়া দেখিয়া দৃষ্টিহীনদের সব কথা জানাইবার ভার দিয়াছেন—তাই তাঁহার যোগক্ষেমের বিষয়েও তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু দেখেন তাহাই দপ্তরে লিখিয়া রাখেন ভবিষ্যতের দৃষ্টিহীনদের জন্য। সঞ্চয় মুক্তে যায় নাই

সে দিব্যদৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইত। কমলাকান্ত স্বার্থের কুরুক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত সঞ্জয়।

কমলাকান্ত হাস্তরসের অভিনেতা। নিজে না হাসিয়া তিনি হাসাইয়াছেন। দেশশুদ্ধ লোক একদিকে, আব কমলাকান্ত আর একদিকে। ইহাতে আমাদের হাসি পায। অথচ তিনি আমাদেব মতই মানুষ, একটা ঋষি তপস্বী, দিগ্‌বিজয়ী, বাদশা বা ধর্মগুরু নহেন। কমলাকান্ত নিজে হাসেন না বটে, কিন্তু ব্যঙ্গ করেন, অঙ্গভঙ্গীও করেন। ব্যঙ্গ যাহাকেই করা হোক, আমাদের হাস্যোদ্রেক করে। এ হাসি অবশ্য উচ্চহাস্য নয় ইহা মনে মনে হাসি। অনেক সময় ব্যঙ্গের বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে মিল হয়। তখন কমলাকান্ত আমাদের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন। এই ব্যঙ্গের ব্যাপারেও একটা বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্যও আছে। কমলাকান্ত ব্যঙ্গ করেন ব্যঙ্গের পাত্রের আচরণ অসঙ্গত বলিয়া, আর আমরা ব্যঙ্গটা উপভোগ করি ব্যঙ্গের পাত্র আমাদের অপ্রিয় বা স্বার্থবিরোধী বলিয়া। যেমন—ইংরাজ-প্রসঙ্গ বা রাজপুরুষ প্রসঙ্গ।

ববীন্দ্রনাথ বঙ্কিমেব বচনাব হাস্যরসসৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন "নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন কবেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য বসেব সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি কবিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র হউক, কখনও সম্মানেব অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীরভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যবসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়াছেন তাহা কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যেই বদ্ধ নহে। উজ্জ্বল শুভ্রহাস্য সকল বিষয়কেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বাবা প্রমাণ করিয়া দেন যে এই হাস্যজ্যোতিব সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতাব গৌরবহ্রাস হয় না। কেবল তাহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তাব বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশেব প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টভাবে দীপ্যমান হইযা উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়-শিখব হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বঙ্কিমের কমলাকান্তেব দপ্তরকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত। কমলাকান্তের দপ্তরের হাস্যরসে অশ্লীলতা বা ভাঁড়ামি নাই। উনবিংশ শতাব্দীর গ্রাম্য সাহিত্যের হাস্যরস এমনকি কমলাকান্তেব গুরুদেব গুপ্তকবির হাস্যরসের তুলনায় ইহা 'শুভ্র ও সংযত'। হাস্যরস কমলাকান্তেব দপ্তবেব বিষয়ের গভীরতার হ্রাসত করেই নাই, বরং তাহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা বৃদ্ধিই কবিয়াছে। এমনকি হাস্যরসে অভিষিক্ত হইয়াছে বলিয়াই দপ্তর উচ্চসাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হইয়াছে।

দপ্তরে সিরিওকমিক ভঙ্গী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামওয়েলারী এমনকি ফলষ্টাফী ভঙ্গী পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ঢঙই আছে—কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

দপ্তরে হাস্যরসের প্রধান আশ্রয় ব্যঙ্গাত্মক রঙ্গরসিকতা। এই ব্যঙ্গ দুই অর্থেই, ব্যঞ্জনা অর্থেও বটে, বিদ্রূপ অর্থেও বটে। ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে, জাতি বিশেষের উদ্দেশে বা সম্প্রদায়বিশেষের উদ্দেশে এ ব্যঙ্গ নয়। ইহা মানুষের ভ্রান্ত আচারপদ্ধতি, মোহমুগ্ধ জীবনযাত্রা, আত্মাদরমূলক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ও বিকৃত দূষিত ধারণার উদ্দেশে।

এই সকলের মূলে যে অসঙ্গতি ও মূঢ়তা আছে কমলাকান্ত তাহা লইয়া ব্যঙ্গচ্ছলে রঙ্গ-রসিকতা করিয়াছেন। এই সকলের পরিমণ্ডলের অঙ্গীভূত যাহারা, তাহারা সে সব দেখিতে পায়না। এই সকলের বাহিরে গিয়া জ্ঞানী মানুষ সত্যদৃষ্টি লাভ করেন। এই অসঙ্গতি ও মূঢ়তা লক্ষ্য করিয়া যে জ্ঞানী রসিক বা সাহিত্যিক নয়, সে ঘৃণা বিরক্তির জ্বালা উদ্গিরণ করে। কিন্তু যে রসিক, শিল্পী ও সাহিত্যিক তাহার হাসি পায়, তাই সে রঙ্গভরে ব্যঙ্গ করে। বঙ্কিম সমাজসংসারের সংস্কারের মধ্যে থাকিয়াই অপরিমিত প্রজ্ঞাবলে সব অসঙ্গতি দেখিয়াছিলেন। সেগুলিকে ব্যঙ্গশর হানিয়া বিদ্ধ করিবার জন্যই তিনি যেন কমলাকান্ত সাজিয়া দূরে গিয়া লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া শরাসন ধারণ করিয়াছেন।

কমলাকান্তের ব্যঙ্গের বস্তুগুলির কয়েকটির এখানে নাম উল্লেখ করি— ইংরাজের শাসন-পদ্ধতি, ইংরাজের আদালতের বিচারাভিনয়, ইউরোপীয়দের ভারতীয় গবেষণা, নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য, তথাকথিত প্রেম, ধনীর নিষ্ঠুর প্রমোদবিলাস, বাংলার অক্ষম পরানুকারী সাময়িক সাহিত্য, পণ্ডিতদের প্রাণহীন অসার বাদানুবাদ, সৌখীন দেশোদ্ধারের বক্তৃতা-বিলাস, আভিজাত্যের অভিমান, প্রবলের স্বার্থান্ধতা ও দুর্ব্বলপীড়ন, সম্পত্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান সভ্যতা।

কমলাকান্তের সম্বন্ধে শেষ কথা—কমলাকান্তের স্বদেশপ্রীতি অপরিমিত। এ বিষয়ে কমলাকান্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন, বঙ্কিমের সঙ্গে একাত্মক। কমলাকান্তের দেশপ্রীতি হিন্দুবঙ্গের প্রতি গভীর ভালবাসা। কমলাকান্তের বেদনা এইখানে। তাঁহার মতে হিন্দু দেড়শ-বছর পরাধীন নয়, সাতশো বছর পরাধীন। মুসলমান হিন্দুস্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার পুনরুদ্ধার দুঃসাধ্য ছিল না। ইংরাজ তাহা দুঃসাধ্য, কেন—অসাধ্যই করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দুর যে গৌরব অতীত হইয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। তিনি বঙ্গের রাষ্ট্রিয় পরাধীনতার কথাটাই বড় করিয়া ভাবেন নাই। রাষ্ট্রিয় পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির দুর্দ্দিন আসিয়াছে। রাষ্ট্রিয় স্বাধীনতা একদিন ফিরিতে পারে, হিন্দুসংস্কৃতির গৌরব আর ফিরিবে না। মুসলমানের হাত হইতে হিন্দুরা যদি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে পারিত তাহা হইলে তাহা ফিরিতে পারিত। কিন্তু আসিল ইংরাজ। ইংরাজ শুধু রাষ্ট্রিয় স্বাধীনতা হরণ করে নাই, হিন্দু সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। যদি কোনদিন রাষ্ট্রির স্বাধীনতা ফিরিয়া পাওয়াও যায়—তখন আর দেশে প্রকৃত হিন্দু থাকিবে না। ইংরাজ হিন্দুর বাহিরের রাজ্য ও ভিতরের রাজ্য দুইই দখল করিয়াছে। রাষ্ট্রিয় স্বাধীনতা হিন্দুসংস্কৃতিকে আর ফিরাইতে

পারিবে না। মুসলমান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল মাত্র ইংরাজ তাহাকে নিজ সংস্কৃতির দ্বারা রূপান্তরিত করিয়াছে।

দপ্তরের প্রত্যেক নিবন্ধটি অনবদ্য ভাবে রচিত নয়। কোন কোনটিতে শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্যের অভাব আছে—স্থলে স্থলে ভাবোচ্ছ্বাসের ফেনিলতা আছে। কোথাও কোথাও ক্লিষ্টরূপকের আতিশয্য ও সাঙ্গ রূপকের কষ্টকল্পিত পরম্পরার মধ্যে দুর্বলতা আছে। তৎসত্ত্বেও বঙ্গসাহিত্যে দপ্তর একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী সাঙ্গ রূপকাশ্রিত রচনার তুলনায় আদ্যোপান্ত গূঢ়াঙ্গ-রূপকাশ্রিত রচনাগুলিই চমৎকার হইয়াছে, যেমন—'বড়বাজারে'র তুলনায় 'বিড়াল'।

দপ্তরের নানা শ্রেণীর রচনাশৈলীর মধ্যে দুই প্রকারের রচনাশৈলী বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। একপ্রকার শৈলী গীতিকবিতার সঙ্গীত তোমাবিত আর একপ্রকার শৈলী ব্যঙ্গ পরিহাসের চাতুর্য্যে কণ্ঠোরায়িত। প্রথম শ্রেণীর শৈলীর দৃষ্টান্ত—

'গঙ্গা কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাহার পা ধুয়াইতে সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধনবহন করিয়া আনিতে সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে সে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছহৃদয়ে মালা পরিতে সে পুষ্পাভরণা কোথায়? বিশ্বাসঘাতিনি! তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কলকল তরতর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতলগর্ভ মধ্যে যবনভয়ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন। বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়াছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই শাণিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল। নারীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল। কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল। গৃহময়ূর কণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল। পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল। পূজাগৃহে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না। পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল। সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সাহসবলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল। শিশু বিনা রোগে মাতার কোলে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর গাঢ়তর গাঢ়তর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল। আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজহর্ম্ম্য, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল। কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে আঁধার আঁধার আঁধার মেঘে ঢাকিতেছে, ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতলজলে না ডুবিলেন তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

কমলাকান্ত ব্যঙ্গপরিহাসের চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন প্রধানতঃ রূপক অলঙ্কারের সাহায্যে। বিড়াল, ঢেঁকি ইত্যাদি নিবন্ধ গূঢাঙ্গ রূপকের নিদর্শন।

পরম্পরিত রূপকের দৃষ্টান্ত—

কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্নভোজন করিতেছে—কোথাও আইনকারক ঢেঁকি মিনিট-রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া ভাঙ্গিয়া বাহির করিতেছেন আইন। বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিয়াছেন দারিদ্র্য, কারাবাস, ধনীর ধনান্ত, ভালমানুষের দেহান্ত। * * * বাবুঢেঁকি বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছে পিলে যকৃৎ। তাঁহার গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন। অনাহার (ঢেঁকি)।

তাঁহাদের রূপের ঝড় যেদিকে বয় সেদিকে সকলের বৈর্য্যচালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্মকোঠা ভাঙ্গিয়া পড়ে। যখন পুরুষের মনচড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে তখন তাহাদের কর্ম্মজাহাজ, ধর্ম্মপান্সী, বুদ্ধিডিঙ্গী সব ভাসিয়া যায়। (স্ত্রীলোকের রূপ)

লক্ষ্য করিতে হইবে,—সংস্কৃতের রূপকরচনাপদ্ধতি চলতি বাংলায় প্রয়োগ করার ফলে সে অসঙ্গতির সৃষ্টি হইয়াছে—তাহাতেই কৌতুকরসের সঞ্চার হইতেছে।

বড়বাজার, মনুষ্যফল ইত্যাদি নিবন্ধ রূপক মালায় রচিত।

সাঙ্গরূপক অলঙ্কারে সমৃদ্ধ রচনাশৈলীর দৃষ্টান্ত—বাহ্যসম্পদের পূজা কর। এ পূজায় তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরাজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত। এডামস্মিথ পুরাণ ও মিলতন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়। এ উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্র সকল পূজার ঢাকঢোল, বাঙ্গালা সংবাদপত্রসকল কাঁসিদার। শিক্ষা এবং উৎসাহ হইবে নৈবেদ্য এবং হৃদয় হইবে ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোক ও পরলোকে অনন্ত নরক। (আমার মন)।

অতিশয়োক্তি মূলক রূপক—তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী, তরুণের আশাপ্রদীপ, যুবকযুবতীর যামিনীযাপনের প্রধান সম্ভোগপদার্থ এবং স্থবিরের স্মৃতিদর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী—স্থির দীপধারা, গৃহীর নৈশ সূর্য্য, পুণ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃপতাকা। (চন্দ্রালোকে)